দরবার-এ-জহুর

জহুর হোসেন চৌধুরী

দরবার-ই-জহুর

www.pathagar.com

দরবার-ই-জহুর

জহুর হোসেন চৌধুরী

লালন প্রকাশনী ॥ ২৬২ বংশাল রোড, ঢাকা-১

www.pathagar.com

© লালন প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৩৯২
মে ১৯৮৫

প্রকাশক ঃ আহমদুল কবির
লালন প্রকাশনী
২৬২ বংশাল রোড, ঢাকা-১

মুদ্রক ঃ সংবাদ প্রেস
২৬৩ বংশাল রোড, ঢাকা-১

প্রচ্ছদ ঃ কাজী হাসান হাবীব

মূল্য ঃ ষাট টাকা

DARBAR-I-ZAHUR

(A Collection of Writings by Zahur Hussain Chowdhury)

Published by : Ahmadul Kabir
Lalan Prakashani
262 Bangshal Road, Dhaka-1
Bangladesh

Price : Taka 60·00
US $ 4·00

www.pathagar.com

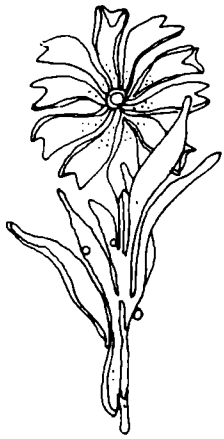

প্রকাশকের কথা

দু'বছর আগে 'দরবার-ই-জহর' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার কথা ভেবেছি। গত বছর 'সংবাদ'-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রসংগক্রমে বলেছিলাম তাঁর মৃত্যু বার্ষিকীর আগেই এটা প্রকাশ করার চেষ্টা করব।

'৭৫ এর জুন মাসে সব কাগজের সঙ্গে জহর সাহেবের কাগজ 'Counterpoint' বন্ধ হয়ে যায়। সেপ্টেম্বরে আবার সংবাদ বেরুল। জহরের রবিবারের আসরকে টেনে নিয়ে আসা হল সংবাদে। এর পেছনে যে ধৈর্য্য আর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তার সম্পূর্ণ কাজটি করেছেন বন্ধুবর ওয়াদুদুল হক। সংবাদে ওয়াদুদের এটাই সবচেয়ে বড় অবদান। 'দরবার-ই-জহর' নামটা আমার মাথায় এসেছিল, জহর সাহেব গ্রহণ করেছিলেন। সচিত্র শিরোনামটি তার মেজাজ ও স্বভাবের সাথেই যেন ওতপ্রোতভাবে মিলে গেছে। তাঁর নিজের কথা হল এ প্রসংগে 'আমি আড্ডা মারায় বিশ্বাস করি।'

জহর হোসেন চৌধুরীর লেখার ভঙ্গির সাথে শিরোনামের এমন সার্থকতা কদাচিৎ চোখে পড়ে। তার লেখার ভঙ্গি আড্ডার ভাষার উপযোগী। তাঁর লেখা সম্পর্কে সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম 'আমার দুই বন্ধু' নামে 'সংবাদ'-এর পাতাতেই ১৯৮১ সালের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে লিখিত এক স্মৃতিচারণে যে কথা বলেছেন তা এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

'পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে যে স্বৈরতন্ত্র ক্রমশঃ নির্গমশীল ছিল তাতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি শাণিতবাক্ জহর অনেক ভেবে চিন্তেই নিজের জন্য ভাঁড়ের ভূমিকা বেছে নিয়েছিল। তবে সেটা ছিল গোপাল ভাঁড়ের নয়, শেক্সপীয়রের রাজদরবারের Fool এর, যে প্রবল পরাক্রমশালী

www.pathagar.com

চরিত্রের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে কৌতুকপ্রদ মন্তব্যের মাধ্যমে সুস্পষ্ট সত্য ভাষণ করত। .....প্রতিপক্ষীয় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্ধশিক্ষিত বীর সেনানীদের সে সনাক্ত করেছিল বলেই এ অস্ত্রের অমোঘ অব্যর্থতা সম্বন্ধে সে পূর্ণ আস্থাশীল ছিল।'

জহুর সাহেব আড্ডায় বিশ্বাস করতেন। তাই প্রথম দিকে প্রতিটি লেখা তাঁর কাছ থেকে আদায় করা হত তাগাদা দিয়ে। পরের দিকে লেখার ঝরণা বইতে আরম্ভ হয়। কলাম বা উপসম্পাদকীয় লেখা সম্পর্কে তাঁর একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাহল, তাঁর ভাষায়, তাদের নিজেদের অস্তিত্ব ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট কিন্তু 'দে আর এবসলিউটলি ফেসলেস।' অথচ অবয়বহীন এই কাঠামো তাঁর লেখায় মূর্ত হয়ে ধরা দিয়েছে।

'দরবার-ই-জহুর' প্রকাশনার কাজটা সহজ ছিল না। একটি দৈনিক পত্রিকার সব চাহিদা মিটিয়ে অখণ্ড মনোযোগ দেওয়ার অবসর কম। প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তাঁর সব লেখা একবারে প্রকাশ করা হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সেটা কোন দিক দিয়েই সম্ভব নয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে লেখকের অভিমতের দিকে অন্ততঃ লেখা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নজর রাখা প্রথাসিদ্ধ, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর অবর্তমানে এ কাজটি হবার জো নেই। লেখা নির্বাচনের দায়িত্ব জনাব আবু জাফর শামসুদ্দিন, জনাব ওয়াহিদুল হক ও শ্রী সন্তোষ গুপ্ত পালন করেছেন। প্রথমে তিনশ'র মত লেখা বাছাই করা হয়। পরে আরো কমিয়ে ফেলা হল, কিন্তু গ্রন্থের কলেবর স্ফীতির আশংকায় চূড়ান্ত পর্যায়ে লেখার সংখ্যা আরও কমিয়ে আনতে হয়েছে। সংবাদ-পত্রের পাতা থেকে লেখাগুলো সংগ্রহ ও শ্রেণী-বিন্যাস করার ভার পড়ে আবুল হাসনাত ও সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের উপর। শাহেদ কিছুদিন

www.pathagar.com

লালন প্রকাশনীর সাথে জড়িত ছিলেন। কিন্তু দেখা গেল বিষয়বস্তুর প্রায়ই অধিক্রম ঘটেছে এবং পুনরাবৃত্তি হয়েছে লেখায়। সংবাদপত্রকে বলা হয় ব্যস্ত সাহিত্য। লেখায় বক্তব্য বিষয়ের অধিক্রম ও পুনরাবৃত্তি তার প্রতিফলন। সুতরাং কালানুক্রমিক হিসাবে লেখাগুলো সাজানো হয়েছে।

'দরবার ই-জহর' গ্রন্থাকারে প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্ব বজলুর রহমানের ওপর অর্পিত হয়। এই দুরূহ কাজটি তিনি সম্পন্ন করেছেন স্বীয় পেশায় অতিমাত্রায় ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও। মুদ্রণের দায়িত্ব পালন করেছেন কিরীট বিক্রম সিংহ রায়। আমাদের কাজের ধারা ও দৃষ্টি-ভঙ্গির জন্যই এ নিয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার আতিশয্যের পর্যায়ে পড়ে বলেই তা প্রকাশে বিরত থাকা আমি শ্রেয় মনে করি।

দীর্ঘ প্রতীক্ষারত পাঠকসমাজের নিকট 'দরবার-ই-জহর' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে উপস্থিত করা হল। বই পাঠকসমাজ সমাদরে গ্রহণ করলে সেটাই হবে সার্থকতা। জহরের অবশিষ্ট লেখাও গ্রন্থাকারে প্রকাশের আশা রাখি। প্রকাশিত সংকলন গ্রহণের ক্ষেত্রে পাঠকের আগ্রহ সেখানে পাথেয় হিসেবে নিশ্চয় প্রেরণা যোগাবে।

প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সহযোগিতা ও শ্রম সত্ত্বেও বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে সকল ভালমন্দ ও ত্রুটি সব কিছুর জন্য আমিই দায়ী। এ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন তবু পাঠকের দরবারে এটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

২৭ বৈশাখ ১৩৯২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

১৯২২ সালের ২৭শে জুন সুবেহ সাদেকের অনেক আগে অন্ধকার থাকতেই হোসেন মামুর দরাজ গলার আজানের আওয়াজে আশে-পাশের বাড়ীর অনেকের ঘুম ভেঙে গেল। অসময়ে এই আওয়াজের অর্থ সকলেই বুঝলেন---খানবাহাদুর সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মৎ মোহসেনা খাতুনের একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। নবজাত বাচ্চাটি দেখতে আহামরি নয় বললে বেশ একটু কমই বলা হয়। শকুল্-সুরতের কথা ছেড়ে দিলেও, প্রথম যাঁরাই বাচ্চাটিকে দেখলেন তাঁদের মনেই প্রার্থনাবাণী স্বতোচ্চারিত হল, 'আহা, খোদা যেন একে হায়াৎ দেন'। দোয়াটি মামুলি ছিল না। বাচ্চাটির শরীর এমন প্যাঁকাটির মত ছিল যে, এই দীর্ঘ জীবন কামনার খাস প্রয়োজন ছিল। শ্রীমানের শরীর যত দুর্বল হোক না কেন অবিশ্রান্ত চীৎকারে সে প্রমাণ করছিল যে, গলার আওয়াজে ও জিহ্বার ধারে সে শারীরিক দৌর্বল্যটা সুদে-আসলে পুষিয়ে নিয়েছে। সে যুগের মানুষ খোদাকে ভয় করতেন, গোনাহকে সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। এ কারণেই বোধহয় রহমানুর রাহিম আল্লাহ্ তায়ালা বাচ্চাটির শুভাকাঙক্ষীদের আরজ শুনেছিলেন। অন্ততঃ অর্ধডজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার বেশ কয়েকবার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আজরাইলের সমন সমাগত।

ডাক্তারী শাস্ত্রটি যে এখনও নেহাতই অপরিপক্ এ তথ্যটি প্রমাণ করে মুরুব্বীদের দোয়ার বরকতে এবং আল্লাহ্র রহমতে আমার বয়স আজ তিপ্পান্ন বছর তিন মাস। আব্বা-আম্মা, নানা-নানী এঁদের মধ্যে কে আমার নাম জহুর হোসেন রেখেছিলেন জানি না। আমাকে নিয়ে রসিকতা করার কোন ইচ্ছা তাদের ছিল একথা আমি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু বাংলা অর্থ করলে জহুর হোসেন শব্দ দু'টির অর্থ দাঁড়ায়,--সৌন্দর্যকে যে জাহির করে। সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আছে এমন বদনাম আমার জন্ম-দুশমনও দিতে পারে না। কিন্তু আমার নামে যে বেরসিকতা ফুটে উঠেছে

www.pathagar.com

আমার চরিত্রে তার ছাপ গভীরভাবে পড়েছে, একথা আমাকে জানবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। কেউ যদি মনে করেন আমার আত্মজীবনী তাঁদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি, ভুল করবেন। আমি মনে করি আত্মজীবনী লেখা আত্মস্তরিতার পরিচায়ক। কথাটি আমার নয়। ঢাকার একজন প্রখ্যাত ইন্‌টেলেকচুয়ালকে আমি পছন্দ করি না। ঘাড়টা তাঁর সহজে নড়ে না। আমার ধারণা অহংকারের ভারই এর প্রধান কারণ। এঁকে বছর বারো আগে আমি বলেছিলাম, "জানেন, আমি এদেশের সবচেয়ে বড় ইন্‌টেলেকচুয়াল।" ভদ্রলোকের ঠোঁটে একটুখানি বিদ্রূপের রেখা দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। আমি বললাম, "চটবেন না। আমি জানি যে আমার মাথায় পদার্থ বলে বিশেষ কিছু নেই। তবে দুনিয়ার বিচারে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বলে স্বীকৃত দু'একজন লোককে জানবার সুযোগ প্রথম যৌবনে হয়েছিল এবং সেটাই এখন আমার মত একটা এরণ্ড গাছকেও বট-বৃক্ষের মর্যাদা দাবীর দুঃসাহস দিয়েছে।" ভদ্রলোকের মুখে বিদ্রূপের রেখার আভাস আবার দেখা সত্ত্বেও আমি বলে চললাম, "যেমন এম. এন. রায়। এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ—এই তিন মহাদেশ জুড় তাঁর বিপ্লবী কাজ-কামের নমুনা ছড়িয়ে থাকা, এখানকার বামপন্থীদের গুরুর গুরু লেনিন সাহেব, স্টালিন, ট্রটস্কী, বুখারিন, কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, র‍্যাডেক, কুইসেনিনসহ তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ন'জনের একজন পলিটবুরোর ফাউণ্ডার মেম্বার হওয়া ও তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক বৈদগ্ধের কথা বাদ দিলেও আইনস্টাইনের সঙ্গে থিওরী অব রিলেটিভিটি সম্বন্ধে পত্র মারফত সুদীর্ঘ আলোচনা আমি স্বচক্ষে দেখেছি, যদিও তার বিন্দু-বিসর্গ বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না।" এরপর ভদ্রলোকের চাউনি স্বাভাবিক হয়ে গেল। এই এম. এন. রায়কেই বছর পঁয়ত্রিশেক আগে আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনি একটা আত্মজীবনী লেখেন না কেন? আপনার অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ জীবন ও অসাধারণ ইনটেলেক্‌টের দলিল ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটা সম্পদ হয়ে থাকবে।" তাঁর স্বভাব-সুলভ ভঙ্গীতে কমরেড রায় বললেন, "তুমি বড় বেশী বাজে বক হে ছোকরা।" আত্মজীবনীতে আত্মস্তরিতা প্রকাশ পায়। লেখক সচেতনভাবে না চাইলেও নিজেকে প্রখর আলোকে পরিস্ফুট করার প্রচেষ্টা

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত সফল হয়। তাছাড়া একবচন উত্তম পুরুষে বলা বা লেখা অর্থাৎ 'আমি' শব্দটা ব্যবহার করার আগে সাতবার চিন্তা করা উচিত 'আমি' লোকটা কে, আমার বক্তব্যের সামাজিক মূল্য কি? অবশ্য এম. এন. রায়ও শেষ পর্যন্ত তাঁর আত্মজীবনী লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন, শেষ করে যেতে পারেননি। তবে যেটুকু লিখে গেছেন তাই সমসাময়িককালের রাজনৈতিক ইতিহাসের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

এম. এন. রায়ের উপরোক্ত কথাগুলো তখনও অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বেই ভাল লেগেছিল আর এখনও মগজে গেঁথে রেখেছি। সুতরাং আত্মজীবনী লেখার অহমিকা আমি প্রকাশ করছি না। এম. এন. রায়ের উপদেশ ছাড়াও অহংকার এড়িয়ে চলার অন্য কারণও রয়েছে। গত দু'তিন যুগে এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অহম্ ভাবের বান অশ্লীলভাবে ডাকতে দেখেছি ও তার পরিণতি যে কি হয় তা অবলোকন করেছি। নিজেকে যতই দুনিয়ার নাগরিক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করি না কেন, আদিনিবাস যে আমার নোয়াখালী জেলার রামনগর গ্রামে এ তথ্যটি আমি ভুলিনি এবং নোয়াখালীর সন্তানদের দোষত্রুটি সম্বন্ধে অন্য জেলার লোক যতই মুখরোচক গল্প প্রচার করুন না কেন, আহাম্মকির বদনাম তাদের কেউ দিতে পারবেন না। সুতরাং অহংকারের আহাম্মকি আমাদের নেই বলেই আমার নিজের ধারণা।

এ পর্যন্ত লিখে বেশ একটু তৃপ্তি পাচ্ছি। এমন সময় রীমার আবির্ভাব এবং যথারীতি পেটেন্ট করা প্রশ্ন "ফোপা কি করেন?" রীমা-সীমা দুই যমজ বোন এবং 'শ্রীমতী'র ভ্রাতুষ্পুত্রী। শৈশব থেকেই এরা সংসারের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন সদস্যা। বাড়ীতে কেউ আমাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। এরাও একেবারেই নয়। তিন-চার বছর বয়সে এরা ডাকত পুফা এবং বার বছর বয়সে সম্বোধনের উন্নতি হয় 'ফোপা'য়। বৈকল্য যখন এ সমাজে সর্বগ্রাসী তখন আমি এ বাচ্চা মেয়েদের উচ্চারণ সংশোধনের কোন সৎসাহস পাইনি। রীমা এরপর বলে উঠলো, "ও বাব্বাঃ দরবার-ই-জহর। দরবার তো রাজা-বাদশাহ্দের হয়। সেই দরবারে উজির-নাজির-ওমরাহ্ উপস্থিত থাকে। আপনার এ কামরায় তো দিনরাত গুলের আড্ডা চলে। বাদশাহ নামদার দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকেন আর সকাল থেকে

www.pathagar.com

অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা চারপাশের চেয়ারে বসে রাজা-উজির মারেন।" বুঝলাম রীমা তার ফুফুর গ্রামোফোন রেকর্ডই বাজাচ্ছে। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "দেখ, তোমাদের আর দোষ কি। এ বাড়ীতে তোমাদের সকলের মাথায় যে মগজ থাকার কথা ছিল, আল্লাহতায়ালা তার সব আমার মাথায় দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের ফুপার প্রতিভা যে কত বিরাট তা বোঝার ক্ষমতা তোমাদের নাই।" মর্যাদায় আঘাত লাগায় রীমার মুখ কিঞ্চিৎ গম্ভীর হল এবং সে চুপ করল। কিন্তু ইতিমধ্যে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমার চিন্তার খেই হারিয়ে গেছে।

চিন্তার সূত্রগুলো আবার গুছোবার চেষ্টা করছি, এমন সময় শুনলাম রীমা বলছে, 'ফাইটা যাবেন'। আমি কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারায় বললাম, "কি আবোল-তাবোল বকছ। কে ফাইটা যাবে।' ত্বরিত জবাব পেলাম, "আবার কে? আপনি। নিজের মাথা সম্বন্ধে এত অহঙ্কার ভাল নয়। বুঝলেন ফোপা? নমরুদ বাদশা, ফেরাউনের কাহিনী আপনি জানেন না? আম্মা বলেন, 'খোদা অহঙ্কারীকে সবচাইতে বেশী না-পছন্দ করেন।' তা ঈশপের গল্পেই তো আছে—এক কোলা ব্যাঙ অহঙ্কারে ফুলে হাতি হওয়ার চেষ্টায় ফটাস করিয়া ফাইটা গিয়াছিল।"

আমার শ্রীমতী মাদাম মন্তেসরীর ছাত্রী। আমিও শিশুদের বিনা শাসনে গড়ে তোলার থিওরী সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর পড়াশুনা করে বাড়ীতে সে শিক্ষা প্রাকটিস করছি। মনে মনে পরলোকগতা মাদাম মন্তেসরীর মুণ্ডপাত করে বললাম, 'যথেষ্ট হয়েছে। এবার যাও ত। একটু লিখতে দাও। কবির সাহেবের তাগাদার টেলিফোন বাজলেই ভয় করে।" "ফাইটা যাবেন, ফাইটা যাবেন" সুর করে চেঁচাতে চেঁচাতে রীমা প্রস্থান করল। তার কথাগুলো কিন্তু মনের কোণে খচ্ খচ করতে লাগল। ব্যক্তিগত অহমিকাই যে শেষ পর্যন্ত আমাদের সকল দুর্গতির মূল কারণগুলোর অন্যতম সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ অহমিকার প্রকাশ কখনও স্বাভাবিকভাবে হয় হামবড়ামির আকারে, কখনও অতি বিনয়ের ছদ্মাবরণে।

বন্ধু-বান্ধবের তরফ থেকে লেখার তাগিদ আসছে অনেকদিন ধরে। কিন্তু এদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে নিঃসঙ্কোচে লেখার যেসব অসুবিধে আছে, তার জন্যে লেখার কোন উৎসাহই পাই

www.pathagar.com

না। এককালে অন্ততঃ নিজে নিজেকে আদর্শবাদী মনে করতাম। বেশ কিছুদিন যাবৎ সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে এবং কিছুটা সিনিক হয়ে গেছি। অথচ একদিন বিশ্বাস করতাম নৈরাশ্যবাদী হওয়া, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো যে কোনো সমাজসচেতন ব্যক্তির পক্ষে সবচেয়ে বড় পাপ। এখনও মানুষের উপর বিশ্বাস সম্পূর্ণ হারাইনি। যাদের কাণ্ড-কারখানায় মনটা অকালে বুড়িয়ে গেছে তারা সমাজের কোন্ শ্রেণী হতে উদ্ভূত, জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের সংখ্যা কত, এ তথ্যগুলো সম্বন্ধে আমি সচেতন।

"বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ-যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজচ্ছত্র ভেঙে পড়ে রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে;
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে
রক্তমাখা অস্ত্রহাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।"

রবীন্দ্রনাথের এই লাইনগুলো আমাকে বহু সঙ্কটে শক্তি যুগিয়েছে। কিন্তু সত্যি আর যেন পারি না। মাস কয়েক আগে ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনে গিয়েছিলাম কাডিওগ্রাম করাতে। দেখি জনাব আবদুল মালেক উকিল একটি কামরায় বসে রয়েছেন ও এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা ছুটোছুটি করে তাঁর রক্ত পরীক্ষার বন্দোবস্ত করছেন। কামরার বাইরে প্রায় একশ' ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা সিরিয়াল আসার অপেক্ষায় বসে রয়েছেন। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসের একটি বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল। লণ্ডনে পার্লামেন্টে বিরতির সময় চা পানের জন্য হাউস অব কমন্সের ক্যান্টিনে কিউতে দাঁড়িয়েছি। পনের বিশজনের কিউ। আমার সামনে জনাব আমিরুল ইসলাম--যিনি

www.pathagar.com

স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে কিছুদিন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সামনে জন স্টোনহাউস এমপি (বিশ্ববিখ্যাত) ও স্টোন-হাউসের সামনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান।

ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন প্রশাসক জনাব আহসান আহমদ আশক আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু এবং "দৈনিক পাকিস্তান" স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর কেবল পাকিস্তান শব্দটা কেটে "দৈনিক বাংলা" হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর ম্যানেজিং এডিটার ছিলেন। তিনি কি ম্যানেজ করতেন আল্লাহ্ জানেন। কিন্তু কয়েকদিন আগে "দৈনিক বাংলা"র স্টাফের একজন সিনিয়র সদস্য তাঁর ব্যবস্থাপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল শুনে প্রীত হয়েছিলাম, কারণ, এদেশে কেউ কারও প্রশংসা সহজে করে না। আজ নির্ভেজাল চাটুকারিতা, কাল মুণ্ডপাত করে। অবশ্য দুটোরই পশ্চাতে তাগিদ একই। কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিযোগ। সেটা প্রমো-শনই হোক আর করকরে বস্তুটি হোক যার জোরে পৃথিবীকে কদলী প্রদর্শন করা চলে।

"দৈনিক পাকিস্তানে"র একটি শব্দমাত্র কেটে "দৈনিক বাংলা"য় রূপান্তরিত হওয়ার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ আসলে আমরা যেখানকার মাল সেখানেই রয়ে গেছি। পাকিস্তানের পরও পরিস্থিতি এরকমই হতে দেখেছি। দু'দু'বার স্বাধীন হলাম, কিন্তু চরিত্রে আমা-দের কোনও স্বাধীনতার ছোঁয়াচ লাগেনি। একেবারে লাগেনি বলি কি করে। শাস্ত্রকারেরা বিধান দিয়েছেন যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য--এই ছয়টি রিপুই হল মানবচরিত্রের ছয়টি প্রধান দুশমন এবং পাকিস্তান লাভের পর এই ছয়টি রিপুই এদেশে দ্রুত ডেভেলপ করতে শুরু করে, যদিও পাকিস্তান আন্দোলনের সময় বারবার ঘোষণা করা হয়েছিল, পাকিস্তানের পাক জমিনে এসবের ঠাঁই হবে না। স্বয়ং কায়েদে আজম জিন্নাহ সাহেব ঘোষণা করেছিলেন, "পাকিস্তানে ধনীকে আরও ধনী ও দরিদ্রকে আরও দরিদ্র হতে দেয়া হবে না।" সকলে দেখেছে এই প্রতিশ্রুতি তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে কিভাবে পালিত হয়েছে। বাংলাদেশের জন্মের পূর্বে বিশ টাকা মণ দরে চাল খাওয়াবার যে খোয়াব জনসাধারণকে দেখান হয়েছিল, বাস্তবে চারশ' বিশ টাকা মণ দরে সে চাল খাওয়ান হয়। পাকিস্তানে ষড়-রিপুর দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি হয় আর বাংলাদেশে এই ছয়টি রিপুই একেবারে পাগলাঘোড়ার রূপ নেয়।

www.pathagar.com

কেন এমন হয়। এই মিলিয়ন ডলার প্রশ্নের জবাব কি দেব ভাবছি, এমন সময়ে মনে পড়ল স্পীকার সাহেবকে পেছনে রেখে তো মস্ত বড় বেয়াদবি করেছি। ভাগ্যে পার্লামেন্টের মেম্বার নই। নতুবা বিপদে পড়তাম। অবশ্য পার্লামেন্টে মেম্বার হওয়ার পেশাগত বিপদ, ইংরেজীতে যাকে বলে Occupational hazard আরও বহুবিধ এবং বিনাভাষ্যে বলা চলে রীতিমত প্রাণান্তকর। খোদা যেন কোনদিন পার্লামেন্টের সদস্য ও মন্ত্রী হওয়ার অভিলাষ না দেন এ প্রার্থনাই দিবারাত্র এখন কেবল আমি নই অনেকেই করছেন। মালেক উকিল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাইসাব বালা আছেন ত? আইচ্ছা বাইসাব কতা নাই বার্তা নাই আঁন্নে কেন্নে আৎকা হোম মিনিস্টারিত্তুন স্পীকার অই গেলেনগই?" এর কিছুদিন পূর্বে জনাব আবদুল মালেক উকিল বিনা নোটিশে হোম মিনিস্টারের পদ ছেড়ে স্পীকার হয়ে যান। মালেক উকিল সাহেব জবাব দিয়েছিলেন, "খোদা যা করেন বালার লাইই করেন। স্পীকার অই বড় আরামে আছি বাই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কামের ঝন্ঝাটে হায়াত কমি যাইতে আছিল। মাইনষেও বদদোয়া দেয় না, বরং অল্প-বিস্তর ইজ্জতই করে।"

মালেক উকিল সাহেব জানতেন না তাঁর সেদিনকার কথার কথাগুলো কিরূপ নিদারুণভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হবে। উকিল সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "আমনের বয়স কত?" বললাম, "ফরায় তিপ্পান্ন বছর।"—"ও আল্লাহ। এই বয়সেই চেহারা সুরত এইক্কা হইছে কা?" জবাব দিলাম, "বাইসাব বয়সেরত কোন দোষ নাই। বিলাতে ত ইয়া জোয়ান বয়স। দ্যান না চার্লি চ্যাপলিন আশি বছর বয়সে আরেক গা বিয়া কইচ্চে যে ক'বছর অইগেল। মাশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে অনত চরিবরি খায়। আর গ্রীসের অমুকের বাই ওনাসিস ত ফরায় বায়াত্তুর বছর বয়সে আঙ্গো আমেরিকার মরহুম কেনেডি সাবের বিধবা জ্যাকিরে এইত ক বছর আগে বিয়া কইরলেন (ওনাসিস হালে মারা গেছেন)। আর জ্যাকিরে চোখ্যে না দেইখলে কি হইব ফটোতে দেইখছেন তো।--------"(ছাপার অক্ষরে চলে না)।

একটু বিব্রত বোধ করে উকিল সাহেব বললেন, "তোবা তোবা! আন্নের মুখের কোন আড় নাই। অবশ্য আন্নের জিহ্ বার কতা কে না জানে। আই জিজ্ঞাইলাম এত অল্ ফ বয়সে চেহারা এই রকম খারাব অই গেছে কিল্লাই, আর আন্নে শুরু কইল্লেন কোনআনের

www.pathagar.com

চালি চ্যাপলিন, ওনাসিস আর জ্যাকি কেনেডির বয়ান।"

আমি বললাম, "বাইসাব, ফাঁচকান কতা গুছাই কইতাম ও লেইখতাম ফাইরলাম না হারা জীবনে। আঁর জিহ্বার কতা কইতেছেন। বিয়ার আগে আঁর বেগমসাব এক গণৎকারের কাছে গেছিলেন। বেডা 'অমুকের' হুত গন্‌কা হেতাইনের হাত দেখি এককরে বিদ্যাসাগরী বাংলায় কইছিল, 'স্বামী বর্বরতা দোষে দুষ্ট হইবেন।' রবীন্দ্রনাথের পরশ পাথর কবিতার ক্ষ্যাপার মত আঁই গত বিশ বছর ধরি হেই গণৎকারে খুঁজি বেড়াইয়ের। অনঅ হইত্যেক দিন তার কথা মনে অয়। 'অমুকে'র হুতের দেয়া ফাইলে বেড়ারে জিজ্ঞাইতাম 'ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ। এদেশের ভবিষ্যৎটা কি?' তবে চালি চ্যাপলিনের বয়ান আন্নেরে কইলাম, হেইটার লগে আঁর এই অকাল বার্ধক্যের সম্পর্ক আছে।"

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্যামনে"। আমি বলে চললাম, "চব্বিশ বছর পাকিস্তানে আর তিন বছর বাংলাদেশে থাকি চেহারাটা না এই রকম অইছে, খোদার মেহেরবানীতে অনঅ ত কবরে যাই ন। আন্নেরও বয়স আর কত অইব। কিন্তু আয়নার দিকে মাসে দু'মাসেও একবার দেখেন ত? আঙ্গো মত এতদিন পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে থাইকলে জ্যাকি বিবি সাহেবের চেহারায়ও এই জেল্লাই থাইকত ন।"

এমন সময় আশক ভাই এসে বললেন, "স্পীকার সাহেব, জহুর ভাই আসেন। আপনাদের সব ব্যবস্থা রেডি।" আবার ম্যাকমিলান সাহেবের কথাটা মনে হল।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

www.pathagar.com

২

মানুষের জীবনকে শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে দেখলে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার একটি যোগফলই বলতে হবে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী আমি ইতিমধ্যেই কয়েকটি জীবন পার হয়ে এসেছি। ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ছায়ায় আমার বাল্য ও কৈশোর কেটেছে। ত্রিশের দশকে বিশ্বব্যাপী তীব্র অর্থনৈতিক মন্দার ঢেউ পিতামাতাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে। আমারই এক খালাত ভাইকে দেখেছি ডিস্টিংশানে ১৯২৮ সনে বি. এসসি পাশ করার পর চার বছর বেকার থেকে ১৯৩২ সনে ৩০ টাকা মাইনের নোয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডে কেরানীর চাকরি নিতে। চাটগাঁ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে অনার্স পড়াবার বন্দোবস্ত সে যুগে ছিল না, আর কলকাতায় পড়বার সামর্থ্যও ছিল না। আমাদের শৈশব ও বাল্যাবস্থায় হিন্দু-মুসলমান পার্থক্য ছিল, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের মনে অভিযোগ ছিল, একটা হীনমন্যতাও ছিল। কিন্তু এসবের মধ্যে বিদ্বেষ ও হিংসার পরিচয় বিশেষ পাইনি। মুসলমানদের মধ্যে একটা তীব্র প্রচেষ্টা ছিল প্রগতিতে হিন্দু সমাজকে ধরে ফেলা।

আমি নানার বাড়ীতে মানুষ। নানা খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ বি.এ. চাটগাঁর ডিভিশনাল স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন। তখনকার দিনে তিনি চাটগাঁ শহরে একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বৈঠকখানায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সমাবেশ প্রায় সমানভাবেই হত। আমার নানার কয়েকটি ভাড়াটিয়া বাড়ীর মধ্যে একটিতে একজন হিন্দু মুন্সেফও থাকতেন। দু'পরিবারের মধ্যে যাতায়াতে ঘনিষ্ঠতাও ছিল। আমার দু'বছর বয়সে টাইফয়েডে আম্মা মারা যান। আম্মার থেকেই যে টাইফয়েড আমারও হয় তাতে আমার জীবনের আশা চাটগাঁ'র সিভিল সার্জনও ছেড়ে দিয়েছিলেন। মহিম বাবু নামে একজন হিন্দু হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের চিকিৎসায় আমি

www.pathagar.com

ভাল হই এবং নানা তাঁকে একটা সোনার মেডেল উপহার দেন বলে নানী-খালাদের কাছে শুনেছি। ডাঃ মহিম বাবু আমৃত্যু আমাদের পরিবারের একজন সুহৃদ ছিলেন। শৈশবে নানী-খালা নামাজ পড়ে আমাকে কোলে নিয়ে দরুদ পড়ে মাথায় ফুঁ দিতেন আর বলতেন, 'ইংরেজকে কোনদিন ক্ষমা করবি না। আমাদের এতবড় দেশের চল্লিশ কোটি মানুষকে তারা পরাধীন করে রেখেছে। বাণিজ্য করতে এসে ছলে ও বলে, মীরজাফর-জগৎশেঠ-উমিচাঁদের সাহায্যে পলাশীর মাঠে সিরাজউদ্দৌলাকে হারায় ও পরে মোহাম্মদী বেগকে দিয়ে খুন করায়। কিন্তু মীরমদন ও মোহনলাল দু'জনেই তলোয়ার হাতে বাঙ্গালীর স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেন—পলাশীর ময়দান হিন্দু ও মুসলমানের রক্তে পবিত্র হয়।" অর্থাৎ খেলাফত আন্দোলনের রেশ তখনও চলছিল।

তঁ রা আরও বলতেন, হিন্দ-মুসলমান হল মানুষের দু'টি চোখের মত। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, ডাঃ আনসারী, হেকিম আজমল খাঁর ছবি দেখিয়ে বলতেন, "এদের আদর্শ বলে মানবি।" আরও বলতেন, "ইংরেজের গোলামি কখনও করবিনা, ইংরেজ মুসলমানদের সব-চাইতে বড় দুশমন। বড় হয়ে ব্যারিস্টার হবি, পারতপক্ষে কারুর গোলামি করবি না। আজাদী মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস গরীবকে কোনদিন হেকারত করবিনা। গরীবও খোদার বান্দা, তাঁর প্রিয় বান্দা। মানুষকে দরদের চোখে দেখবি। টাকা পয়সার নেশা হওয়া শক্ত গোনাহ্। বড় মানষি করা খোদা সহ্য করে না। অহং-কারীর নামাজ খোদা কবুল করেন না।" এই ধরনের নানা উপদেশ দিতেন, দরুদ পড়তেন আর মাথায় ফুঁ দিতেন। সে ফুঁয়ের পরশটা যেন এখনও মাথায় লেগে রয়েছে।

নানা মারা যান আমার বয়স যখন মাত্র চার বছর। সুতরাং তাঁর কথা একেবারে অ.ব্ছা মনে আছে। বিশাল চেহারার লোক, আবক্ষ সাদা দাড়ি। তবে এটুকু আমার মনে আছে, আমার যত লোভই তাঁর খাস কামরার টেবিলের কাগজ, পেন্সিল, নিব, কালির বড়ি, ব্লটিং পেপারের উপর থাক না কেন, এক টুকরো সরকারী কাগজ বা একটি সরকারী পিন তাঁর পরলোকগতা কনিষ্ঠা একমাত্র সন্তান যাকে তিনি ঘোড়া সেজে পিঠে চড়তে দিতেন তাকেও ধরতে

www.pathagar.com

দিতেন না, কারণ এসবই ছিল পাবলিক আমানতী জিনিস। মূল্য-বোধটা কিভাবে বদলে গেছে। আমার বাবা সরকারী কর্মচারী ছিলেন। মৃত্যুকালে একমাত্র প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও বীমার টাকা ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। তাঁদেরই নাতি ও ছেলে হয়ে আমি যেসব কাণ্ড করেছি, বেঁচে থাকলে তাঁরা কি করতেন ভেবে পাই না।

হিন্দু-মুসলমান যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছি, বাল্যে তার গভীরতা আরও অনুভব করেছি। ইংরেজের কারসাজি তখনই সেটা বুঝতে শুরু করলেও যদি এর ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমি না থাকত, ইংরেজ তার সুযোগ নিত কি করে। আমাদের পরিবার রাজনীতি-সচেতন ছিল। নজরুলের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে পরোক্ষভাবে বামপন্থী আদর্শেরও ছাপ কিছুটা আমার উপর পড়েছিল। কৈশোরে ও যৌবনে যখন বামপন্থী আদর্শের প্রভাবে হিন্দু-মুসলিম জনতার সম্মিলিত আন্দোলন ও মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনই কংগ্রেসী ডানপন্থী নেতৃত্বের এককেন্দ্রিক স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হল। চোখের সামনে দেখলাম পার্থক্য ও অনাত্মীয়তাবোধ রূপ নিতে তীব্র সাম্প্রদায়িক বিরোধে।

শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বাংলাদেশ রণাঙ্গনের আঙিনায় পরিণত হল। দেখা দিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। মাগো! ভাত দাও, ফ্যান দাও, বলতে বলতে নিদারুণ মৃত্যুবরণ করল চল্লিশ লক্ষ আদম সন্তান। কলকাতার রাস্তা থেকে অনাহারে মৃত্যুর লাশ সময় মত সরান কলকাতা কর্পোরেশনের ন্যায় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও অসম্ভব হল। নিষ্প্রদীপের রাতে ওয়েলেসলী স্ট্রীটে লাশে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে। ডবল আণ্ডা জেলী টোস্ট ভরপেট খেয়ে দু' আঙ্গুলে একটা খাতা ধরে রেখে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফটকে একটি কংকালসার মানুষকে ডাঙ্গায় ওঠা মাছের মত খাবি খেতে খেতে মরতে দেখেছি।

অবিভক্ত বাংলায় তখন মরহুম জনাব খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন। যুদ্ধজনিত নানা অসুবিধার মধ্যেও সে মন্ত্রিসভাকে কাজ করতে হচ্ছিল। জাপানীরা তখন কক্স-বাজারের কাছে এসে পড়েছিল এবং আসামের কোহিমায় তুমুল হাতা-হাতি লড়াই চলছিল দিনের পর দিন। আমাদের জেনারেল ওয়াসি-

www.pathagar.com

উদ্দীন ও জেনারেল ওসমানী বোধহয় ক্যাপ্টেন হিসাবে ঐ ফ্রন্টে ছিলেন। জাপানীদের গোটা পূর্ব ভারত অন্ততঃ পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা দখল করার রীতিমত সম্ভাবনা থাকায় ব্রিটিশ সামরিক কম্যাণ্ডের নির্দেশে 'ডিনায়াল পলিসি' অর্থাৎ 'পোড়ামাটি নীতি' অনুসরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমেই সরকার নৌ-চলাচল বন্ধ করে দিয়ে পূর্ব বাংলার সমস্ত নৌকা বাজেয়াফত করেন ও নৌকা-গুলোকে বিভিন্ন জায়গায় জড়ো করে রাখেন। ট্রেনগুলিও তখন প্রায় শতকরা আশি ভাগ সেনা চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। সর্বো-পরি বাংলাদেশ ছিল চালে ঘাটতি একটি দেশ এবং বার্মা থেকে চাল আমদানী করে সে ঘাটতি পূরণ করা হ'ত। ব্রহ্মদেশ জাপানের দখলে চলে; গলে সে আমদানীটাও বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই প্রকট হয়ে উঠে।

এ পরিস্থিতিতেও আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে, নাজিমুদ্দিন সরকার প্রথমে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। "একটি লোককেও অনাহারে মরতে দেব না, প্রয়োজন হলে প্রত্যেকটি বাড়ীর তক্তপোশের নীচে সার্চ করে মওজুদকৃত চাউল বার করব"—সে সময় খাদ্যমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দীর এ ঘোষণা পরবর্তী তুলনাহীন বিয়োগান্ত পরি-স্থিতির পটভূমিকায় নির্মম পরিহাস হিসাবে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। বস্তুতঃ মওজুদদার ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। একটি উল্লেখযোগ্য মামলা দায়ের করা হয়নি বা কাউকে তেমন গুরুদণ্ডও দেওয়া হয়নি।

চালের কালোবাজারি ও মওজুদদারির ব্যাপারে সে যুগে দুই ব্যব-সায়ী প্রতিষ্ঠান যুক্তভাবে সর্বাপেক্ষা কুখ্যাতি অর্জন করে—তাদের একটি ছিল মাড়োয়ারী আর একটি পশ্চিমা মুসলমান। এই মুসলমান প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগ ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কর্ণধারদের অন্যতম ছিলেন। আমি এ ব্যাপারে বন্ধু-বান্ধব ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে অভিযোগ করায় জবাব পাই, "মুসলমান দুটো পয়সা কামাচ্ছে, সেটা তোমার সহ্য হয় না।" আমার জবাব ছিল "যে লক্ষ লক্ষ চাষী মারা যাচ্ছে, তাদের অন্ততঃ শতকরা সত্তর জনই মুসলমান।" কারণ, দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলি মুসলিমপ্রধান ছিল।

এরপর এল ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট কলকাতার ভয়াবহ হিন্দু-

www.pathagar.com

মুসলমান দাঙ্গা। পাকিস্তান আন্দোলন তখন চরমে উঠেছে আর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের বিরোধিতাও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। তারা প্রস্তুত হচ্ছিল সকল শক্তি দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে। এ প্রস্তুতির দিকে কোন নজর না দিয়ে, মুসলিম জনসাধারণকে কোন-রূপ প্রস্তুত না করে ১৬ই আগস্ট 'ডাইরেক্ট একশান ডে' মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন। সাধারণ হরতাল এ দিবসের কর্ম-সূচী ছিল। হিন্দুরা স্বভাবতঃই এ হরতালের বিরোধিতা করে এবং সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এ সংঘর্ষের জন্য মুসলমানেরা প্রস্তুত না থাকায় প্রথম চোটেই তারা প্রচণ্ড মার খেল। পরে দু'পক্ষেই যে নির্মম হত্যাকাণ্ড চলে ইতিহাসে তা the great Calcutta killing নামে কুখ্যাত হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পৈশাচিকতার চরম নিদর্শন স্থাপন করে। দু'হাত দূর থেকে মানুষের মাথাকে থান ইটের আঘাতে ফাটিয়ে টুকরা টুকরা করে দেওয়ার যে আওয়াজ আমি শুনেছি তা আজও আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়।

এই দাঙ্গা ক্রমে সারা ভারতে বিশেষ করে নোয়াখালী, বিহার, ইউ,পি ও সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর মধ্যেই ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ঘোষণা করে। এইভাবে প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের প্রাণের, কয়েক লক্ষ মহিলার সতীত্বের বিনিময়ে ও প্রায় দুই কোটি লোক ভিটামাটি ছেড়ে দেশান্তরী হওয়ার পর প্রতিষ্ঠিত হয়---মুসলমানের জাতীয় আবাসভূমি হিসাবে যে দাবী উত্থাপিত হয়েছিল, তার।

কায়েদে আজম জিন্নাহ সাহেব একদিন সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং প্রস্তাবিত মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে ১৯০৬ সালে এর উদ্বোধনী সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। পরে কোন্ সব কারণে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান ও এর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন, এ নিবন্ধে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়। পাকিস্তান দাবীর উত্থাপন তিনি করেছিলেন এই আশা নিয়ে যে, হিন্দু ও মুসলমানের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হলে হিন্দু-মুসলমান তিক্ততার সম্পর্কের অবসান চিরকালের জন্য হবে। তিনি ক্যাবি-নেট মিশন প্ল্যানও গ্রহণ করেছিলেন, যেটাতে এক ধরনের কনফেডা-রেশনের অস্তিত্বই কল্পনা করা হয়েছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বও এই প্ল্যান গ্রহণ করেছিল। পণ্ডিত নেহরুর একটি অপরিণামদর্শী বিবৃ-

www.pathagar.com

তির জন্যই প্ল্যানটি ভণ্ডুল হয়ে যায় এবং ১৯৪৭ সালের চৌদ্দই ও পনেরই আগস্ট স্বাধীন পাকিস্তান ও স্বাধীন ভারত এ দু'টি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম খুনোখুনি থামল না। দিল্লীতে দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করেন। দাঙ্গা বন্ধ হোল বটে; কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের নাথুরাম বিনায়ক গডসে তাঁকে হিন্দু ধর্মের শত্রু বলে হত্যা করল। আজ সেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘই ভারতে ইন্দিরা-বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের মধ্যে কি জোশ দেখেছি তা এখনও চোখের সামনে ভাসছে। সরকারী কর্মচারী ও মুসলিম জনগণ উভয়েই সমৃদ্ধ সুখী পাকিস্তান গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল; যেখানে জনগণের দুঃখ-কষ্টের অন্ততঃ লাঘব হবে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার ঘোষণা করলেন, "তাজমহল আমরা হারিয়েছি; কিন্তু এখানে আমরা তৈরী করব মানবতার তাজমহল"। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে এ সবই উপহাসে পরিণত হল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গণ-পরিষদের উদ্বোধনী ভাষণে কায়েদে আজম ঘোষণা করেছিলেন, "রাজনৈতিক অর্থে পাকিস্তানে মুসলমান আর মুসলমান, হিন্দ আর হিন্দু, খৃস্টান আর খৃস্টান এবং বৌদ্ধ আর বৌদ্ধ থাকবে না।" এর একমাত্র অর্থ হয় যে, মুসলমানের জাতীয় আবাসভূমি হিসাবে সৃষ্টি হলেও পাকিস্তান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই হবে। এবং এর মধ্যে কোন স্ব-বিরোধিতা যে নাই তুর্কীই তার প্রমাণ। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল পাকিস্তানকে একটি ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্রেরই রূপ দেওয়ার চেষ্টা। ১৯৫০ ও ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়। পার্শ্ববর্তী পশ্চিম বঙ্গেও একই সময়ে ভয়াল দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ভারতের অন্যান্য বহু স্থানেও প্রায় দাঙ্গা সংঘটিত হতে থাকে। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে দেশ-বিভাগের পরই কাশ্মীর প্রশ্নে যুদ্ধ শুরু হয় এবং জাতি-সংঘের হস্তক্ষেপে একটি অস্বস্তিকর যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। কিন্তু ১৯৬৫ সালে আবার রক্তাক্ত সংঘর্ষ শুরু হয় এবং রাশিয়ার হস্তক্ষেপে তাসখন্দ চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়।

একদিকে পাকিস্তান যেমন এই উপ-মহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের

www.pathagar.com

মধ্যে সংঘর্ষের অবসান করে নাই, অন্যদিকে দ্বি-জাতিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্কের পরিবর্তে তিক্ততারই সৃষ্টি হতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানেও পাঞ্জাবী, পাঠান, বেলুচী, সিন্ধী ও মোহাজেরদের মধ্যেও সংঘর্ষ দেখা দেয়। পরিষ্কার বুঝা যায়, পাকিস্তান তার অভ্যন্তরের মুসলমানদেরও একজাতি হিসাবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবিচার-শোষণের বিরুদ্ধে যে জনমত গড়ে উঠে তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জন্ম। যে চরম আত্মত্যাগ ও অকল্পনীয় নৃশংসতার পটভূমিকায় বাংলাদেশের জন্ম তার কোন পর্যালোচনার এখানে প্রয়োজন নেই। কারণ, এসব আমাদের ধরতে গেলে কালকের অভিজ্ঞতা। পাল বংশের পতনের পর এই প্রথম বাঙ্গালীর স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল।

শেখ মুজিব যেদিন পাকিস্তানের বন্দীশালা থেকে ঢাকায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে ফিরে এলেন সেদিন এদেশের জনজীবনে যে জোয়ার এসেছিল তা কি কাউকে মনে করিয়ে দিতে হবে? ছয়টি মাস না যেতেই সে জোয়ার শুকিয়ে যেতে শুরু করল। তারপর তিন বছর আট মাস না যেতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অধ্যায় শেষ।

কেন এমন হল? গত তিন বছরে বাঙ্গালী জাতি যে অর্থনৈতিক কষ্ট ও রাজনৈতিক আশাভঙ্গের মধ্য দিয়ে গিয়েছে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হবে। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের নিয়ন্তণের বাইরের যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু সরকার যদি ঔদাসীন্য এবং ব্যবসায়ীদের উৎকট লোভ দমনে অর্থাৎ কালোবাজারি ও মওজুদদারি দমনে ব্যর্থতার পরিচয় না দিতেন তবে পরিস্থিতি নিশ্চয়ই ঐরূপ ভয়াবহ রূপ নিতে পারত না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দেশের সাধারণ মানুষ যে দুর্গতির শেষ সীমায় পৌঁছায় তার কারণও প্রধানতঃ পঞ্চাশের মন্বন্তরের পশ্চাৎবর্তী কলাকৌশলের পুনরাবির্ভাব। তফাত কেবল যথেচ্ছ অস্ত্র ব্যবহারের ব্যাপারে। এর কারণ হল ইংরেজ তখনও এদেশের আইন-শৃংখলার তত্ত্বাবধায়ক।

আর একটি বিষয় এ ব্যাপারে লক্ষণীয়, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল মুসলমানের জন্য দরদের ধুয়াকে ভিত্তি করে। কার্যতঃ দেখা গিয়েছে

www.pathagar.com

মুসলমান মুসলমানকে বিনা দ্বিধায় পরম আনন্দে শোষণ ও শাসন করেছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানতঃ পশ্চিমা বিদ্বেষকে ও বাঙ্গালীর জন্য এক সুখী, সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থা সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতিকে ভিত্তি করে। কিন্তু পুনরায় কার্যতঃ কি দেখা গেল? বারবার এ ধরনের আশাভঙ্গের কারণ অনুসন্ধান করা কি উচিত নয়? দেখা যাচ্ছে আমাদের অনেকের চিন্তাধারা আজ আবার পুরোনো খাতে প্রবাহিত হচ্ছে।

যে রাস্তায় যেয়ে একবার চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলাম, সে রাস্তায় আবার যাওয়াটা সুবিবেচনার কাজ হবে কি? বারবার আমাদের এরূপ নিদারুণ আশাভঙ্গের কারণ প্রধানতঃ একটি, যে শ্রেণীগুলি বেঁচেই আছে জনতাকে শোষণের দ্বারা তাদের নেতৃত্বেই পাকিস্তান হাসিল করা হয়েছে আর পাকিস্তানের ফলে বাঙ্গালীদের মধ্যে যারা ঐসব শ্রেণীর কাছাকাছি যেয়ে পৌঁছায় তারা এবং তাদেরই লেজুড় হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ—এ উভয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণ দেয় জনতা আর সুবিধা লোটেন এই শ্রেণীগুলি। জনতার সঙ্গে এরা যে প্রতারণা করেছিল ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

গত বেশ কিছুদিন যাবৎ দেখা হলেই বন্ধুবান্ধব প্রশ্ন করেন, "কি হবে বলতে পারেন?" আমারও পেটেন্ট করা জবাব—"অতীতের দিকে তাকান"। নিঃস্বার্থ পর্যালোচনার দ্বারা অতীত থেকে যদি আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে না পারি তবে এ জাতির কোন ভবিষ্যৎ নাই।

এখন প্রায়ই আমার নানী-খালাদের কথা মনে পড়ে আর মনে মনে তাঁদের বিদেহী আত্মার উদ্দেশে বলি, "আমাকে মাফ করবেন, আপনাদের উপদেশের মর্যাদা রক্ষা করতে পারিনি।"

৫ অক্টোবর ১৯৭৫

www.pathagar.com

৩

গত আটাশ বছর ধরে আমরা বারবার এক পা এগিয়ে দু' পা পিছিয়ে গেছি কেন, এ প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন সত্যিকার আত্মানুসন্ধান এখন পর্যন্ত হয়নি। বাঙ্গালী মুসলমান যে পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারে সিংহের ভাগ নিয়েছিল এটি ঐতিহাসিক সত্য। অথচ পাকিস্তানের পরিকল্পনা যখন প্রথম জন্ম নেয় তাতে বাঙ্গালী মুসলমানকে কোন-রূপ হিসাবে ধরা হয়নি। চৌধুরী রহমতুল্লাহ, ইকবাল যাঁরা প্রথম এই উপমহাদেশে মুসলমানের একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন করেন, তাঁদের কারও চিন্তায় বাঙ্গালী মুসলমান ছিলেন না। পাঞ্জা-বের পি, আফগানিস্তানের এ, কাশ্মীরের কে, ইরানের আই, সিন্ধুর এস, বেলুচিস্তানের স্তান নিয়ে পাকিস্তান শব্দটি জন্ম নেয়।

আফগানিস্তানকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়ই নাই। পাকিস্তানের জন্মের পর সকলের শেষে আফগানিস্তান একে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আফগানিস্তানের সঙ্গে অহি-নকুলের সম্পর্কই বিরাজ করছে। ইরান অবশ্য পাকিস্তানের বন্ধু ও ইদানীং মুরুব্বীর ভূমিকাই পালন করে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের পরিকল্পনায় বাঙ্গালী মুসলমানের প্রথম দিকে স্থান না পাওয়া খুব বেশী অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। উপমহাদেশের অন্য প্রান্তে অবস্থিত বাংলাদেশের মুসলমানদের আহার, বেশভূষা, ভাষা ও চালচলন অন্য অঞ্চলের মুসলমানদের থেকে ভিন্ন ছিল। ঐ সব অঞ্চলের মুসলমানেরা বাঙ্গালী মুসলমানদের পাক্কা মুসলমান বলে মনে করত না। হিন্দুদের অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রতিপত্তির ফলে বাঙ্গালী মুসলমানেরা আধা হিন্দু হয়ে গেছে বলে তাদের ধারণা ছিল। বাল্যে কৈশোরে যৌবনে বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্তের মনেও এ সম্বন্ধে ক্ষোভ দেখেছি, উর্দু ভাষা ও পশ্চিমা আদব কায়দা রপ্ত করে নিজেদের মুসলমানিত্ব প্রমাণ করার একটা আগ্রহও দেখেছি।

২—

www.pathagar.com

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কার্যকরী হলে ১৯৩৭ সালে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের আবেদনে বাঙ্গালী মুসলমানের একাংশ রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ভারতের অন্য অংশের সঙ্গে সক্রিয়-ভাবে জড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক সংযোগ আগেও ছিল। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্মই হয় ঢাকায় এবং বিভিন্ন সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনে বাঙ্গালী মুসলিম নেতৃত্বের একাংশ অংশ গ্রহণ করেন।

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এর পূর্বেও বাংলা দেশে হয়েছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরোধ ছিল, কিন্তু তা সর্বাত্মক ছিল না। রাজনৈতিক কারণে দাঙ্গা তখনও শুরু হয়নি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে শেরে বাংলা জনাব ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক কর্মপন্থার ভিত্তিতে কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লীগকে পরাজিত করলেও মুসলিম লীগ বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে একটি প্রধান শক্তিরূপে আবির্ভূত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক সাহেব কৃষক প্রজা পার্টির অধিকাংশ সদস্য নিয়ে মুসলিম লীগে যোগদান করার পর বাঙ্গালী মুসলমানের মুখপাত্র হিসাবে পরিগণিত হন। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব জনাব ফজলুল হকই উত্থাপন করেন।

বাঙ্গালী মুসলমান লীগে যোগদান করলেও এর নেতৃত্বের কোন অংশ তারা পায়নি। উর্দুভাষী হওয়া ও বাংলাদেশে চীফ মিনিস্টার হওয়া সত্ত্বেও জনাব সোহরাওয়ার্দীকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর সংগঠনশক্তি ও জনাব আবুল হাশিমের ইসলামী সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কর্মীরা ১৯৪৬ সালের পাকিস্তান নির্বাচনে মোট ১২৩টি মুসলিম আসনের ১১৯টিতে মুসলিম লীগকে জয়ী করেন। পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মুসলিম লীগ প্রথমে মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেনি। তাই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালী মুসলমানেরই অবদান বেশী।

পাকিস্তান হওয়ার পর কয়েকমাস না যেতেই কতগুলো পোস্টার নজরে পড়ে---"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" সত্য বলতে কি পোস্টার-গুলো সেদিন আমার কাছে বেসুরো লেগেছিল। নিজেদের বাঙ্গালী সত্তাকে এবরূপ চাপা দিয়েই বাঙ্গালী মুসলমান পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নিজে উৎফুল্ল হলেও এই শ্লোগানকে তদানীন্তন বাস্তবের বিরোধী বলেই আমার মনে হয়েছিল এবং এ দাবী যে বেশী

www.pathagar.com

দূর অগ্রসর হবে, তেমন জোর বিশ্বাসও সেদিন ছিল না। ঢাকা শহরবাসীরা তো এর বিরুদ্ধে ছিল এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রধানতঃ ছাত্রসমাজ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যেই এর আবেদন সীমিত ছিল। কিন্তু ইতিহাস গোপনে গোপনে কাজ করে যায়।

জিন্নাহ সাহেবের বাংলা বিরোধিতা ছাত্রদের এ দাবীর প্রতি আনুগত্যকে আরও দৃঢ় করে। এরপর ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন। জনাব বদরুদ্দিন উমর তাঁর বিরাট দুই খণ্ডের বইয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, অর্থনৈতিক দাবীর সমন্বয়ে এর সার্থকতার পথে অভিযাত্রার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। পাকিস্তান হওয়ার পরই বাঙ্গালী মুসলমান সচেতন হয় তার বাঙ্গালী সত্তা সম্বন্ধে; এটাকে ইতিহাসের এক নির্মম পরিহাস বলা চলে। "মুসলমানের জাতীয় আবাসভূমির" জন্য জান কোরবান করে সংগ্রামের পর বাঙ্গালী মুসলমান দেখল নিজ বাসভূমিতেই তার প্রবাসী পরিগণিত হওয়ার উপক্রম। তার ভাষা, নিজস্ব জীবনধারা বিপন্ন করা হচ্ছে ইসলামের নামে। অথচ আন্তর্জাতিক ধর্ম ইসলামে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি পুরোপুরিই রয়েছে। 'হব্বুল ওয়াতন' মুসলিম ঐতিহ্যেরই নির্দেশ। রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামের অপব্যবহার এতদূর গড়ালো যে, বাঙ্গালী মুসলমানের মুসলমানিত্বের খাঁটিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন আবার উঠান হয় এবং এবার জোরেসোরেই উঠান হল। ফল হল বিপরীত। বাঙ্গালী মুসলমানের নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা দিন দিন আরও জঙ্গীরূপ পরিগ্রহ করল। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের সূর্যোদয় হল লাখ লাখ বাঙ্গালীর খুনে রঞ্জিত হয়ে।

এরপর স্বভাবতঃই আশা করা গিয়েছিল বাঙ্গালিত্ব ও মুসলমানিত্বের মধ্যেকার কল্পিত বিরোধের চির অবসান হল। বস্তুতঃ দুনিয়ার কোথাও আর এ বিরোধ নেই। সমগ্র আরব দুনিয়ায়, তুরস্কে, ইরানে কেউ কাকে জিজ্ঞাসা করে না সে তুর্কী, ইরানী না মুসলমান। কিন্তু স্বাধীন হওয়ার পরই দেখছি এ বিরোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

স্বাধীনতা লাভের পর একের পর এক আশাভঙ্গে দেশবাসীর মনে হতাশা দেখা দিয়েছে, তাকে অসুস্থ খাতে প্রবাহিত করাবার চেষ্টা

www.pathagar.com

যে কোন কোন মহল থেকে করা হচ্ছে, এ তথ্য কারও অজানা নেই। ইসলামের নামে বাঙ্গালী মুসলমানের প্রতি নফরত প্রদর্শন করতে আমরা দেখেছি এমন সব মহলকে যারা প্রতি পদে পদে ইসলামী মূল্যবোধ, কোরান ও হাদিসের পরিষ্কার নির্দেশের প্রতি হেলায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেছে প্রকাশ্যভাবে। কোন খোদাপরস্ত মুসলমানকে নিয়ে কখনও কারো বিপদ বাধে না। কিন্তু জীবনে একবারও পশ্চিমমুখী হয়ে এক রাকাত নামাজ না পড়ে যাঁরা ইসলামের ও রাষ্ট্রের অভিভাবক সেজে নিজেদের স্বার্থই উদ্ধার করতে চান তাঁরাই প্রধানতঃ সব ফাসাদের কারণ। গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতাও ইসলামের মর্মবাণীর বিরুদ্ধে এবং এগুলোই যে একটির পর একটি মহান মুসলিম রাজ্য ও সভ্যতার পতনের মূল কারণ, ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্যতম অবহিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন। তবে একদিকে যেমন ইসলামের নাম অনাচার হয়েছে, তেমনি বাঙ্গালীয়ানার নামে বাড়াবাড়িও আমরা দেখেছি। এক ধরনের অতি বাঙ্গালীর অস্তিত্ব অতীতেও ছিল, এখনও আছে যারা নিজেরা মুসলমান হয়েও মুসলিম ঐতিহ্য ও মুসলমানিত্বের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশকেই প্রগতি ও বাঙ্গালিত্বের পরাকাষ্ঠা মনে করে। এদের কার্যকলাপে প্রতিপক্ষ পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করার সুযোগ পেয়েছে। একদিকে আমরা দেখেছি রবীন্দ্র সঙ্গীতকে হিন্দুয়ানী বা ভারতীয় প্রভাব বলে বাদ দেওয়ার চেষ্টা, অন্যদিকে আমরা তেমনি গজল গানের ব্যাপারেও নাক সিঁটকানো দেখেছি। অথচ ভারতে গজলের কদর গত আটাশ বছরে বিন্দুমাত্র কমেনি।

আব্বাসউদ্দিন, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন এঁরা সবই আমাদের ঐতিহ্যের অঙ্গ। মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান সকলকে মিলিয়েই বাঙ্গালী জাতি। রবীন্দ্রসঙ্গীত, গজল, মুর্শিদী, ভাওয়াইয়া, বাউল, ভজন গান সবই আমাদের ঐতিহ্যে সহ-অবস্থান করবে। এর মধ্যে বিরোধ যাঁরা টেনে আনেন এবং বাংলা ভাষাকে যাঁরা এখনও অপাঙক্তেয় মনে করেন তাঁরা আর যাই হোন জাতির কল্যাণকামী নন। কলুর বলদের মত একই চক্‌করে আর কতদিন আমরা ঘুরব। আমরা একই সঙ্গে বাঙ্গালী এবং মুসমলমান---কোনটি আগে পরে নয়। এ প্রশ্নই অবান্তর।

www.pathagar.com

আড়াই কোটি লোকের দেশ মিসরে ত্রিশ লাখেরও বেশী কপ্ট অর্থাৎ খৃষ্টান রয়েছেন। সেখানেও একদিন খৃষ্টান-মুসলিম বিরোধ ছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালে মিসরের জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ দলের নেতা সাদ জগলুল পাশার দূরদর্শী নেতৃত্বে সে বিরোধের যে মীমাংসা হয় তারপর এ সম্বন্ধে আর কিছু শোনা যায়নি। জগলুলের দূরদর্শিতা যদি ভারতের হিন্দু নেতারা দেখাতে পারতেন তবে এ উপমহাদেশের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। অবিভক্ত ভারতে হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলাদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখানে বাঙ্গালী মুসলমান নেতৃত্বের উপরই প্রধানতঃ বর্তিয়েছে একটি সুসংহত বাঙ্গালী জাতি গড়ে তুলবার দায়িত্ব। কোন পক্ষেই সঙ্কীর্ণতা ও বাড়াবাড়ি যাতে দেখা না যায় এ ব্যাপারে লক্ষ্য তাঁদেরই প্রধানতঃ রাখতে হবে। হিন্দু নেতৃত্বকেও দেখতে হবে ভিতরে বাইরের কোনরূপ উস্কানির প্রভাবে যেন না পড়েন। বাঙ্গালিত্ব সম্বন্ধে মনের দ্বন্দ্ব দূর না হলে ভবিষ্যতে দুর্ভোগ আছে। আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার প্রস্তুতি সম্ভব হবে না যদি আমরা এ দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সজাগ থেকে একে দূর না করি।

২ নভেম্বর ১৯৭৫

www.pathagar.com

৪

কথার রাজা হিসাবে আমার খ্যাতি ছিল। ছোটবেলায় মুরুব্বী-দের কাছে বহু ধমক খেয়েছি বেশী বকার জন্য। যৌবনে বন্ধু-বান্ধব বিরক্ত হয়েছে আমার উপস্থিতিতে কথা বলার সুযোগ না পেয়ে। আবার আমি উপস্থিত না থাকলে আড্ডা জমজমাট হত না, এটাও সকলে স্বীকার করত। পরবর্তীকালে আমার কথাশক্তির খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ে। এ সম্বন্ধে একটা সার্টিফিকেট উপস্থিত করছি, "জহুর হোসেন চৌধুরী বুদ্ধিদীপ্ত সাংবাদিক এবং বন্ধুবৎসল, অমায়িক; কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ভদ্রলোক। নানা বিষয়ে প্রচুর মতান্তর সত্ত্বেও তাঁর সাথে আমার এ পর্যন্ত কোন মনান্তর ঘটে নাই। আসলে মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত করার প্রবণতাই তাঁর মধ্যে নাই। বৈঠকী আলাপে তাঁর মতো খোশ মেজাজি, সুরসিক ব্যক্তি বিরল।" কথাগুলো লিখেছেন 'দৈনিক আজাদ' ও 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর (বর্ত-মানে বাংলা) ভূতপূর্ব সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব তাঁর 'অতীত দিনের স্মৃতি' বইটিতে। বিনয় আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য না হওয়া সত্ত্বেও লাইনগুলো পড়ে আমি লজ্জা পেয়েছি। আমাকে 'বুদ্ধিদীপ্ত সাংবাদিক' বলাতে কেবল বাংলাদেশের সাংবাদিক জগৎ নয়, আমার স্ত্রীরও ঘোরতর আপত্তি হবে। কোন ব্যাপারে কোন-রূপ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছি বলে তিনি কখনও স্বীকার করেননি। শামসুদ্দীন ভাই আমাকে অমায়িক আখ্যা দিয়েই 'কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাষী ভদ্রলোক' বলে কিছুটা সামলে নিয়েছেন। বস্তুতঃ আমার এই স্পষ্টভাষিতা, যা কটুভাষিতারই নামান্তর হিসাবে গৃহীত হয়েছে, আমাকে কয়েকবার বিপদে ফেলেছে। "খোশমেজাজি সুরসিক ব্যক্তি" এসব কথা আজ আমার কাছে এখন অন্য লোকের সম্বন্ধে লেখা মনে হয়। স্নেহান্ধ হয়ে শামসুদ্দীন ভাই আমার সম্বন্ধে আরও কিছু অতি-শয়োক্তি করেছেন। কিন্তু "মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত করার

www.pathagar.com

প্রবণতাই তাঁর মধ্যে নাই" কথাটা আমি বিনয়ের সাথেই বলবো একেবারে মিথ্যা নয়। অবশ্য এর জন্য আমি যতটা দায়ী তারচেয়ে বেশী দায়ী আমার বন্ধু-বান্ধব এবং যুগটা। সে যুগে মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত না করার প্রবৃত্তিটা অনেকের মধ্যেই ছিল এবং এটা যেমন ব্যক্তিগত জীবনে দেখা যেত তেমনি সাধারণভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অনুপস্থিত ছিল না। অবশ্য এ শতাব্দীর চল্লিশ দশক থেকেই রাজনৈতিক বিরোধ হানাহানির দিকে অগ্রসর হয়। তবুও ১৯৪৬-এর ঘোরতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও কলকাতায় আজাদ অফিসে দেখেছি সম্পাদকীয়, বার্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগে হিন্দুরা কাজ করছেন সহজভাবেই। সেই ট্রাডিশানটা আজ পর্যন্ত ঢাকার প্রায় সবগুলো খবরের কাগজেই আছে, এটা কম কথা নয়। তবে অন্যদিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে দেখা যাচ্ছে মতান্তর আজ কেবল মনান্তরে পরিণত হচ্ছে না, একেবারে প্রাণান্তক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আর মানুষ মুখে কথা বলে না, অস্ত্রের ভাষায় কথা বলে। সুতরাং নিজেকে একটু সেকেলে মনে হচ্ছে এবং কথা বলাটা গত কয়েক বছর যাবতই ক্রমে কমে এসেছে। শামসুদ্দীন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয় না বহুদিন, হলে তিনি সেই খোশমেজাজি সুরসিক ব্যক্তিটিকে চিনতে পারতেন না।

ওমর খৈয়ামের ফার্সি অরিজিনালে রুবাইয়াত পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। এককালে ফিটজেরাল্ড, কান্তি ঘোষ, নজরুলের অনুবাদ প্রায়শঃই মুখস্থ ছিল। One thing is certain the rest are lies, One thing is certain that life flies. এই লাইন ক'টির অর্থ যৌবনে বুঝিনি। আজ মনে হচ্ছে সেদিনের কথা যখন কলকাতায় আজাদ অফিসে জমজমাট আড্ডা বসত, পাকিস্তান আন্দোলন তখন উত্তুঙ্গ হয়ে উঠছে। সিঁড়ি থেকেই শামসুদ্দীন ভাইয়ের উত্তেজিত গলার আওয়াজ পাওয়া যেত। মুজিবুর রহমান ভাইয়ের (পরে পয়গাম সম্পাদক) গলার আওয়াজও কম ছিল না। এঁরা দু'জনে এক কামরায় বসতেন আর তাঁদের কামরায় বিকালে-সন্ধ্যায় রোজ নানা মতের লোক আড্ডা জমাতেন। বড়ভাই হাবিবুল্লাহ বাহার, আবুল মনসুর আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির অনিল, কাঞ্জিলাল এবং আরও অনেকে সে আড্ডায় শরিক হতেন। চায়ের পেয়ালার ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠত তুমুল তর্কের ঝড়, আর সঙ্গে সঙ্গে চলত

www.pathagar.com

শামসুদ্দীন ভাই ও মুজিবুর রহমান ভাইয়ের টেবিল চাপড়ানো, কিন্তু প্রায় তিক্ত তর্কের পরও এঁদের কারও মুখ কখনও পরস্পরের প্রতি বেজার হতে দেখিনি। আবুল মনসুর ভাই পাকিস্তান আন্দোলনের বহুদিন বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু শামসুদ্দীন ভাই ও তিনি কলকাতায় তাঁতীবাগানের সামনাসামনি ফ্লাটে থাকতেন। 'দৈনিক আজাদ' সম্পাদক ও 'দৈনিক নবযুগ'-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের আবাল্য বন্ধুত্ব কখনও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। 'দৈনিক নবযুগ' বার করেছিলেন শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন এর সম্পাদক। কিন্তু তিনি সাধারণতঃ কবিতাতেই সম্পাদকীয় লিখতেন এবং মনসুর ভাই-ই সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন। 'দৈনিক নবযুগ' ছিল মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান দাবীর বিরোধী। মনসুর ভাই মুসলিম লীগে যোগদানের পর জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী 'দৈনিক ইত্তেহাদ' বার করলে তিনি তার সম্পাদক হন। ইত্তেহাদ অফিসেও নানা মতের লোকের প্রচুর আড্ডা জমতো। আজাদ অফিসে মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবকে ঘিরেও প্রায়ই বৈঠক বসত। সে বৈঠকেও বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না। আর রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে প্রবল বৈরিতা সত্ত্বেও দু'দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সামাজিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক পুরোপুরিই বজায় থাকতে দেখেছি। এবং আজ ভাবলে আশ্চর্য মনে হয়, ১৯৪৫-এর ঘোরতর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সময়েও এ সম্পর্ক মোটামুটি বজায় ছিল।

পাকিস্তান হওয়ার পরও এই ট্রাডিশান কিছুটা বজায় ছিল। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়ে যখন যুক্তফ্রন্ট ও মুসলিম লীগের মধ্যে বাঘে-মহিষে লড়াই চলছিল তখনও দেখেছি, ফজলুল হক সাহেবের কাছ থেকে টেলিফোনে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনুরোধ পেলে, নূরুল আমীন সাহেব তাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতেন। আর খবরের কাগজে আড্ডার ঐতিহ্য পুরোপুরি বজায় ছিল। 'পাকিস্তান অবজার্ভার' যখন ১৯৪৯ সালে বার হয়, তখন জনাব হামিদুল হক চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জাঁদরেল মন্ত্রী। অথচ আমাদের সম্পাদকীয় কামরায় প্রায় সন্ধ্যায় উপস্থিত হতেন জনাব কামরুদ্দিন আহমদ, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব ওলি আহাদ ও আরও অনেক বিরোধী দলের দিকপাল। মওলানা ভাসানীও প্রায়ই আসতেন। 'সংবাদ' বার হয় মুসলিম লীগেরই মুখপত্র হিসাবে।

www.pathagar.com

কিন্তু বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের নিয়ে আসর প্রায় রোজই বসত আমাদের কামরায়। এটা নিয়ে কথাও উঠেছে কয়েকবার ও নূরুল আমীন সাহেবের নজরেও আনা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে নূরুল আমীন সাহেব একবার টেলিফোনও করেননি আমাদের। তিনি সংবাদপত্রের আবহাওয়া জানতেন। বাইরে কৃষক শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে যখন ধুম মারামারি চলছে তখনও দেখেছি মানিক ভাই ও মোহন মিয়া একসঙ্গে ঘোরাফিরা করছেন, সিনেমা দেখছেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তিক্ততা যখন ক্রমশঃ উত্তুঙ্গ হয়ে উঠছে তখনও পশ্চিম পাকিস্তানী সাংবাদিকদের থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী সকলকে সমালোচনার ব্যাপারে ভাষাকে বল্গাহীন করে দিয়েও তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমার অক্ষুণ্ণ ছিল।

কিন্তু যুগটা আজ বদলে গেছে। খবরের কাগজও আজ প্রায় সওদাগরী অফিসে পরিণত হয়েছে। 'সংবাদ'-এর সম্পাদকীয় বিভাগের দরজায় আঁটা রয়েছে 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ।' সব অফিসেই একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকা উচিত। তবু কেমন যেন লাগে। বছর দুই পূর্বে অধুনালুপ্ত একটি দৈনিকের অফিসে প্রবেশ করতে গিয়ে একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। গেইটের বাইরে রাস্তাতেই একটা ষণ্ডামার্কা লোক আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল "কার সঙ্গে দেখা করবেন।" আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কে?" লোকটার চেহারাটা আমার নিদারুণ না-পছন্দ ছিল। জবাব পেলাম, "আমি দারোয়ান, ভিতরে ঢুকার আগে আপনার শরীল চার্স করব।" বুঝলাম ভদ্রলোক আমার জেলার। ঐ অপমানকর প্রস্তাবে রাজী হব কিনা ভাবতে ভাবতে আহমদুল কবির সাহেব ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "আরে কাকে আটকাচ্ছ? উনি তোমাদের সম্পাদক সাহেবের দাওয়াতেই এসেছেন।" 'সংবাদ'-এর অতীত ও বর্তমানের সংযোগে পরিস্থিতিটা রক্ষা পেল বটে, তবে ঘটনাটা পরিবর্তিত পরিস্থিতির নির্ভেজাল পরিচায়ক ছিল। উক্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষের দোষ দিতে পারিনি। অন্ততঃ অর্ধ ডজনবার ঐ অফিসটিতে বোমা মারা হয়েছিল। কলকাতায় আজাদ অফিসে ১৯৪৬ সালের ভয়াল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে কারফিউ'র পরও থেকে গিয়েছিলাম গরুর গোস্ত ও তন্দুরী খাওয়ার লোভে। সন্ধ্যার পরে

www.pathagar.com

যাঁরা কাজ করেন তাঁদের জন্য ঐ ভীষণ ঝাল কিন্তু পরম উপাদেয় "ডিনারের" বন্দোবস্ত কর্তৃপক্ষ করেছিলেন। লোভের ফল হাতে হাতেই পেয়েছিলাম। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই একটা ছোট পটকা 'আজাদ' অফিসে কারা যেন মেরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আজাদের প্রেসের লোকেরা "আল্লাহ আকবর" বলে লাঠিসোঁটা নিয়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হল, আর বার্তা বিভাগের সদানন্দ ব্যানার্জি টেলিফোন করতে লাগল তালতলা থানায়। ঐ দাঙ্গার মধ্যেও পুলিশের রসিকতাজ্ঞান যে অটুট ছিল তার প্রমাণ পেলাম দারোগার কথায়। সদানন্দ বলল, "দেখ, ব্যাটা বলে কিনা, বোমা মেরেছে তো টেলিফোন করছেন কি করে? আর, একটা বোমা সহ্য করতে পারেন না আপনারা এত-গুলো লোক।" যাক ঘন্টা দুয়েক পরে পুলিশ এসেছিল। পট্-কায় কারও কোন ক্ষতি হয়নি এবং 'আজাদ'-এর কলকাতা অফিসে ঐ প্রথম ও শেষ বোমা।

আমাদের কর্মরত সাংবাদিকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা সত্ত্বেও পেশা-গত ঐক্য অটুট আছে। কিন্তু আগে যেটা রাজনৈতিক মঞ্চ ছিল, আজ সেটা রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। দেশের সমস্ত সামাজিক জীবনটা আজ বিষিয়ে গেছে। এর মধ্যে এ 'দরবারী' আলোচনাটা যে কেবল নিরর্থক নয়, বেমানানও সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ এক প্রাক্তন শিক্ষক সেদিন সন্ধ্যায় আমার বাসায় যখন আসেন তখন আমি এই 'দরবার' লিখছি। তিনি মন্তব্য করলেন "কেন এই পণ্ডশ্রম করছ। তোমার এ লেখা কি পরিস্থিতির পরিবর্তনে কোন কাজে লাগবে মনে কর?" আমি কোনরূপ দেরী না করে জবাব দিলাম "না স্যার। বিন্দুমাত্র না। আমি লিখছি নেহাত কিছু প্রাপ্তি-যোগ ঘটে বলে যা বর্তমানের বাজারে প্রাণ ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক।" আমার লেখায় কোন কাজ না হলেও বিশ্বাস করি বর্তমানের এ সঙ্ক-টের মধ্যেও মঙ্গল নিহিত আছে এবং দেশের ও দেশের মানুষের রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনে পূর্ণ নিরাপত্তা ফিরে আসবেই।

২৫ নভেম্বর ১৯৭৫।

www.pathagar.com

৫

গত ১৩ই নভেম্বর স্থানীয় দু'টি পত্রিকায় একটি ছবি দেখে চেইনের আকারে সাজানো একের পর এক অনেক কথা মনে পড়ল, অনেক ভাবনা মনে উদয় হলো। ছবিটি একটা পত্রবিহীন উঁচু গাছের ডালে খাড়াভাবে আটকানো একটি ছ-সাত বছরের বালকের লাশের—১৯৭০-এর ১৩ই নভেম্বরের রাত্রির ভয়াল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের স্মৃতিবাহক। নোয়াখালী ও বরিশালের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সেই কালরাত্রে হাজার হাজার মানুষ করুণ মৃত্যুবরণ করে এবং লাখ লাখ লোক সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্বে পরিণত হয়। সারা জাতি সেদিন একদিকে সমবেদনায় দুর্গতদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল এবং তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের রিলিফ ব্যবস্থার অপ্রতুলতায় ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। কিন্তু একটা বিষয় সে সময়েই আমার নজরে পড়েছিল এবং আমার মনে আছে সে সম্বন্ধে আমি লিখেও ছিলাম। আমাদের শোকার্ত ভাবের মধ্যেও যেন একটা হৃদয়হীনতার ভাব আমি লক্ষ্য করেছিলাম। জাতির সে নিদারুণ দুর্দিনে ঢাকা বা অন্যকোন স্থানের উচ্চ মধ্যবিত্তের বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় এতটুকু ছেদ পড়তে আমি দেখিনি। রিলিফের প্রচেষ্টার মধ্যে অনেকটা লোক-দেখানো ব্যাপার, বাহ্‌বা কুড়াবার জন্য কুৎসিত রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ভাব ছিল বলে আমার মনে হয়েছে।

১৯৭০-এর সেই সাইক্লোনের পরেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, বাংলাদেশের জন্ম অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সাইক্লোনের ব্যাপারে শোকের ঢাক-ঢোলের মধ্যেও যে উদাসীনতা নজরে পড়েছিল, তা আমাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিয়ে তুলেছিল। ১৯৭১-এর সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের দু'কূলপ্লাবী আবেদনে মনে করেছিলাম আমাদের সকল ক্ষুদ্রতা অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য ধুয়ে মুছে গেছে এবং একটা সুস্থ ভিত্তির উপর জাতিকে গড়ে তোলার সুযোগ আমরা পাব। কিন্তু আজাদী

www.pathagar.com

লাভের পর একটি মাস না যেতেই দেখা গেল, স্বাধীনতা সংগ্রামের উন্মাদনাময়ী অভিজ্ঞতা, এত রক্তপাতও আমাদের মধ্যবিত্তের চরিত্রকে এতটুকু বদলাতে পারেনি। যে হৃদয়হীনতা ১৯৭০-এর সাইক্লোনের সময়ে নজরে পড়েছিল, সে হৃদয়হীনতাই স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনের যে নিয়ামক হয়ে দাঁড়ালো, সেটা থেকে নিস্তার পাওয়ার তেমন কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। স্বাধীনতার পর দু'বছর না যেতেই ঢাকারই রাস্তাঘাটে যখন গণ্ডায় গণ্ডায় অনাহারে মৃতের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল তখন দেখেছি আমরা কিরূপ নিশ্চিন্তে অচিন্তনীয় বিলাসের স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছি। বিদেশী টেলিভিশনে ধরা হয়েছে একপাশে লাশের ও অন্য-পাশে বিরাট কুৎসিত আলোকসজ্জিত মণ্ডপে বিবাহে ভূড়িভোজের ছবি। এই হৃদয়হীনতার মর্মান্তিক পরিচয় পাই স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথীরা একে অপরকে ব্যক্তিগত বা দলগত কোন্দলের ফলে নৃশংস-ভাবে হত্যা করার মধ্যে।

একটি লাশকে বার টুকরা করা হয়েছে এমন খবরও কাগজে পড়েছি। ঢাকার রাস্তায় বেওয়ারিশ অনাহারে মৃতের লাশের প্রতি-দিনকার সংখ্যা যখন শতের কাছে পৌঁছেছে তখন রিলিফের রুটি বিলির নামে সামাজিক মহিলাদের (সোসাইটি লেডিজ) যে প্রহসনের অভিনয় করতে দেখেছি, সেটাই সবচেয়ে বেশী কুৎসিত লেগেছে। এখনও দেখি কঙ্কালসার মানুষ যখন দু'মুঠো ভাতের জন্য আকুতি করে, তখনও ধানমণ্ডি, গুলশানের ফটক থেকে তাদের কুকুরের মত তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানের এই চূড়ান্ত সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেও একটা জিনিস ভাল লাগে, চারপাশে সকল বিত্ত-বানের চোখেমুখেই একটা ভীতির ভাব কিছুদিন যাবতই লক্ষ্য করছি। বিত্তের উপর ভরসা রাখতে তাঁরা যেন আর পারছেন না। একদিন তাঁদের সব হাতছাড়া হয়ে যাবে, সব প্রতিপত্তি লোপ পাবে এবং সে-দিন দূরে নয়—এ আশঙ্কা তাঁদের চোখেমুখে এখন পরিষ্কার বিদ্য-মান। এ ভয় থেকে আমিও সম্পূর্ণ মুক্ত নই, তবুও ভয়টিকে ভালোই লাগে।

আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনে এ হৃদয়হীনতা হালের ব্যাপার নয়। আর্থিক লোভ, রাজনৈতিক, সামাজিক প্রতিপত্তির উদগ্র আকাঙক্ষাই এ হৃদয়হীনতার জন্মদাতা। জনগণকে সজ্ঞানে

www.pathagar.com

ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি যাঁরা করেন, তাঁদের কথা বাদ দিলেও জনগণের কল্যাণের রাজনীতিতে সমর্পিত দেহ-মন বলে দাবী করেন যেসব বামপন্থীরা তাঁরাও এ হৃদয়হীনতা থেকে কতটা মুক্ত, সে সম্বন্ধে দেশের মানুষের মনে সন্দেহ রয়েছে। নতুবা প্রায় আটাশ বছরেও এদেশের একটি বামপন্থী দলও জনতার হৃদয়ে উল্লেখযোগ্য আসন করে নিতে পারেননি কেন? এদেশের সকল রাজনৈতিক দলেরই নেতৃত্ব পুরোপুরিভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই হাতে এবং এঁরা নিজেদের শ্রেণী চরিত্রের খোলস এখনও ছাড়তে পারেননি। দেশের গণ-মানুষের দুর্গতির সত্যকার অংশীদার হওয়াই যে সংগঠন গড়ে তোলার একমাত্র পন্থা, চটকদার আমদানী করা বুলি নয়, এ সত্যটি এখনও বামপন্থী আন্দোলনের কর্মীদের বৃহৎ অংশই উপলব্ধি করেননি, কিম্বা করলেও কার্যে পরিণত করেননি। এ কারণেই আমাদের সব রাজনৈতিক আন্দোলনকে গত ২৮ বছর যাবতই এক পা এগিয়ে দু'পা পিছিয়ে যেতে দেখেছি।

এক বন্ধু গত রাতে অভিযোগ করলেন, আমার লেখা আর তেমন জমছে না। তিনি পরিষ্কারই বল্লেন, "ফাঁকি দিচ্ছ।" তাঁকে বললাম শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ব্লাডপ্রেসারটা আবার গোলমাল করছে। তিনি জবাব দিলেন. "যা দিনকাল ব্লাডপ্রেসারের আর দোষ কি? সকলেরই ব্লাডপ্রেসারের চাপ এখন বেশী হওয়ার কথা।" আমাদের দেশে সঙ্কটতত্ত্ব চালু আছে আজ দু' যুগেরও বেশী কাল ধরে। খবরের কাগজেই সারাটা কর্মজীবন কাটিয়ে দিলাম। সুতরাং কথা নেই বার্তা নেই কিছু একটা ঘটে যাওয়ার প্রাথমিক চোটটা এতবার সহ্য করতে হয়েছে যে এটা গা-সওয়া ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। পেশাটা ছেড়ে দিয়েছি স্বাধীনতার পরেই। মেনে নিয়েছিলাম এ অকাল অবসরকে। অবিচলিত মনেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম যে, আমাদের কাল শেষ হয়ে গেছে। তবু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। এ 'দরবারী' লেখাটা শুরু করেছিলাম এই আশা নিয়ে যে, জমিয়ে-রসিয়ে অনেক কথা আলোচনা করা যাবে। এত কথা আমার মনে ভিড় করেছিল যে, খেই হারিয়ে যেত। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে আলোচনা করব সেটাই ঠিক করতে পারছিলাম না। এখনও কথাগুলো রয়ে গেছে এবং নিত্যনতুন কথাও মনে জাগছে। তবুও লেখা যে জমাট হচ্ছে না সে বিষয়ে আমিও সচেতন। দেশকে তরাবার জন্য

www.pathagar.com

আমার চেয়ে অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি বর্তমানের প্রকট সমস্যাগুলো নিয়ে অনেক জ্বালাময়ী, গবেষণামূলক লেখা লিখছেন। তাঁরা যে একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছেন সে বিষয়ে আমার মনেও কোন সন্দেহ নেই। তবে একই ব্যাপারে ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি? মজলিসী নিরুত্তাপ আলোচনার মাধ্যমে মানুষের মনকে যদি কিছুটা স্পর্শ করা যায়—এ উদ্দেশ্য নিয়েই এ 'দরবার' শুরু করা হয়েছিল। এখন দেখছি সঙ্কল্প করাটা যত সহজ ছিল, সেটাকে কাজে পরিণত করা তত সহজ হচ্ছে না। তবুও খাপছাড়াভাবে হলেও যতদিন পারি এ 'দরবার' চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা এখনও আছে। বাকী খোদার হাতে।

নৈরাশ্যবাদী হওয়াটাকে আমি একটা পাপ বলেই মনে করি। যখন দেখি কাল যাঁরা "বীর বাঙ্গালী" বলে লাফিয়েছিলেন, আজ তাঁরাই 'এদেশের কিছু হবে না' বলে হাঁটুভাঙ্গা দ হয়ে বসে পড়েছেন, তখন আমি বিরক্তবোধ না করে পারি না। "বীর বাঙ্গালী" বলে আন্দাজে ও মতলবে লাফিয়ে তাঁরা এড়ানো যেত এমন দুর্বিপাককে ডেকে এনেছিলেন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। সম্পূর্ণ বিনা সংগঠনে চূড়ান্ত রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করার জন্য তাঁরা অন্ততঃ আংশিক দায়ী ছিলেন। জনগণ সে সঙ্কটের মোকাবিলা সংহত চিত্তেই করেছে এবং আজাদী লাভ সম্ভব করেছে। স্বাধীনতার পর প্রধানতঃ মধ্য ও উচ্চবিত্ত সমাজের কৃত পাপের ফলে জনসাধারণের দুর্গতির সীমা না থাকায় জনমনে যে নিদারুণ হতাশার সৃষ্টি হয় তার ফলে দেশে আজ আর একটি চূড়ান্ত সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। এ সঙ্কটের জন্য আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের বৃহৎ অংশের হৃদয়হীনতা, নীতিহীনতাই দায়ী। গত ১৩ই তারিখে প্রকাশিত ছবিটি আমাকে উক্ত হৃদয়হীনতাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

২৮ নভেম্বর ১৯৭৫।

www.pathagar.com

৬

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট যখন পাকিস্তান জন্মলাভ করে তখন অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক ভাল যে ছিল, অর্থনৈতিক এক্সপার্ট না হয়েও এ তথ্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে আমারও বিশেষ কষ্ট হয়নি। দেশবিভাগের সময় পাকিস্তানের যে ১২২ কোটি স্টার্লিং ব্যালান্স ছিল সেটা শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের দ্বারাই অর্জিত ছিল। কারণ, এ অঙ্কটা বৃটিশ সরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঋণ হিসাবেই শোধ দিতে রাজী হয়েছিল এবং যুদ্ধের এলাকার মধ্যে ছিল পূর্ব বাংলাই। তারপর পাটই ছিল তখন পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একমাত্র সম্বল।

দেশবিভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে প্রাপ্যকে বিসর্জন দেয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে। কলকাতার সম্পদ বাঁটোয়ারার প্রশ্নটি পাকিস্তানের তরফ থেকে ধরতে গেলে উঠানোই হয়নি। কারণ, তাহলে লাহোরে হিন্দু ও শিখরা যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ফেলে রেখে গিয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ দিতে হত পশ্চিম পাকিস্তানকে। কলকাতার সম্পদ গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ পূর্ব বাংলার কাঁচামালের উপর ভিত্তি করেই। এসব ব্যাপার নিয়ে দেশবিভাগের সময়ে ও পরে পার্টিশান কাউন্সিলে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী হিসাবে জনাব হামিদুল হক চৌধুরী সেদিন পার্টিশান কাউন্সিলের ভিতরে ও পাকিস্তানের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বহু ঝগড়া-ফ্যাসাদ দেনদরবার করেছেন। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমান সেদিন পাকিস্তানের সংহতিতে বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে নারাজ ছিল। তবুও মধ্যবিত্তের মনে এ ব্যাপারে একটু খটকা লেগেছিল এবং জনাব হামিদুল হক চৌধুরী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 'প্রাদেশিকতাবাদী' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যান। এরপর কোরিয়ান যুদ্ধের সময় পাটের বাজারে যে আগুন

www.pathagar.com

লাগে তার ফলেই কয়েক বছর ধরে শত শত কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এটাই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রগতির ভিত্তি এবং এ ভিত্তি প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানেই স্থাপিত হয়।

একরূপ পরিকল্পিতভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিকে অবহেলিত, দুর্বল রেখে এ অঞ্চলকে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার হিসাবেই গড়ে তোলা হয়। আজ এসব কথা ইতিহাসের অন্তর্গত। এ পরিস্থিতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানী ও বাঙ্গালী নেতৃত্ব কম দায়ী ছিলেন না। দেশবিভাগের সময়েই পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তান গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। পরম উদারতাবশতঃ মরহুম নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান, আই, এইচ কোরেশী প্রমুখ মোট ন'জন ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের নেতাকে উক্ত গণপরিষদে নিজেদের কোটা থেকে নির্বাচনের পরেও তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের উপর অর্থনৈতিক অবিচার প্রতিরোধের ক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের ছিল। রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে যখন প্রশ্ন উঠল, তখনও এ মৌলিক সাংস্কৃতিক দাবীর স্বীকৃতি আদায়ের কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু অপ্রিয় হলেও কথাটা সত্যি যে, পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বের নিকট নিজেদের মনস্তাত্ত্বিক হীনমন্যতা এবং সর্বোপরি নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যক্তি, দলীয়, উপদলীয় স্বার্থে সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ একের পর এক আত্মসমর্পণ করে যান। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে যে স্ববিরোধিতা ছিল তা ক্রমে কমে এসে একটি গতিশীল, সম্মুখ দিকে দৃষ্টি প্রসারিত রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠার পরিবর্তে পাকিস্তানে সঙ্কট আরও ঘনীভূত হতে লাগল।

পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও পুঁজিপতি শ্রেণীকে এ ব্যাপারে একতরফা দোষ দেয়া অনুচিত হবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের কুক্ষিগত রাখার প্রবৃত্তি যতই নিন্দনীয় হোক না কেন, বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় এটা যে স্বাভাবিক ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যে স্টেটসম্যানশীপ অর্থাৎ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা থাকলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমভাবে উন্নয়নের প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের বিপর্যয় এড়াতে পারতেন, তা ইতিহাসে সচরাচর কমই দেখতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

আব্রাহাম লিঙ্কন দাস-প্রথার উচ্ছেদ করে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশের অর্থনীতির উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনেও একটি যুদ্ধের মারফতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন এবং সে ঐক্য আজ বজ্রদৃঢ়। কিন্তু একই জাতের হওয়া সত্ত্বেও ব্রটিশ সরকার আমেরিকার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারেননি। আর আমরা যে তখন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বকে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণকে আমাদের সব দুর্দশার জন্য দায়ী করতাম এটা দু'দিক থেকে অতি সরলীকরণ ছিল। প্রথমতঃ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা ভাষা ও নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে এক ছিল না। পাকিস্তানের প্রথম দিকে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মোহাজের ও পাঞ্জাবী বিত্তবানদের হাতেই ছিল। বেলুচ, পাঠান ও সিন্ধীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোন ব্যাপারেই কোন বক্তব্য আছে বলেই স্বীকৃত হয়নি। তাদের অবস্থা বাঙ্গালীদের চেয়েও খারাপ ছিল। পাঞ্জাবীরা ক্রমে পাকিস্তানের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে।

পাকিস্তানের প্রাথমিক অবস্থায় বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ আত্মসমর্পণ করলেও বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত এবং তাদেরই প্রেরণায় বাঙ্গালী জনতার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের যে সংগ্রাম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সূচিত হয় তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিন্দুমাত্র খাটো না করে এবং সত্যের কোনরূপ বরখেলাফ না করে বলা যায় যে, এ পরিসমাপ্তির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী শাসকচক্র এবং তাদের তাঁবেদাররাও কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। ভারতে যে মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন মহাকবি ইকবাল, চৌধুরী রহমতুল্লাহ প্রমুখ দেখেছিলেন তার মধ্যে বাঙ্গালী মুসলমানদের কোন স্থান ছিল না। হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বাঙ্গালী মুসলমানের সমর্থনের প্রয়োজনে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবে ভারতের পূর্ব অঞ্চলে আর একটি সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলা হয়। অবশ্য তার পূর্বেই বাঙ্গালী মুসলমানরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ভারতের অন্য অঞ্চলের মুসলমানদের সঙ্গে হাত মেলাতে এগিয়ে এসেছিল। বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রতি উত্তর ভারতের মুসলমানদের একটা নফরতের ভাব যে বরাবরই ছিল, একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপই হবে। আমরা আমাদের কৈশোরে-যৌবনে দেখেছি যে, উর্দুভাষী মুসলমানেরা বাঙ্গালী

৩—

www.pathagar.com

মুসলমানদের খাঁটি মুসলমানিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত শুরু হওয়ার পর এ মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে এ মনোভাব অবাঞ্ছনীয় হলেও অস্বাভাবিক ছিল না। আভিজাত্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মুসলমানেরা বাঙ্গালী মুসলমানদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল। আর পাঞ্জাবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ উপমহাদেশের মধ্যেই কর্মতৎপরতায় সামনের সারিতে আসন দাবী করতে পারে। বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ যখন পশ্চিম পাকিস্তানীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে লাগল তখন সে দাবীর ভিত্তি ছিল ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চমকপ্রদ অগ্রাভিযান। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী নেতৃত্ব প্রথম থেকেই মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিল যে, একদিন পরিস্থিতি এমন দাঁড়াতে পারে যখন পূর্ব পাকিস্তান আর পাকিস্তান থাকবে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময়ে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাফ বলেছিলেন যে, এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ বরাদ্দ করার অর্থ হবে টাকাটাকে ড্রেনে ফেলে দেওয়া (throwing down the drain) কারণ, পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে থাকবে না।

বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানী শাসকচক্রের অন্যায়-অবিচার সম্বন্ধে অতীতে বহু লেখালেখি হয়েছে। মানিক ভাই তাঁর 'রাজনৈতিক মঞ্চে' বছরের পর বছর তথ্যের পর তথ্য সন্নিবেশ করে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ও জনতাকে উদ্দীপ্ত করেছেন। বিনাদ্বিধায় বলা চলে 'মোসাফিরের' প্রখর কলমই দেশের আনাচে-কানাচে বাঙ্গালীর স্বাধিকার দাবীকে পৌঁছে দেবার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে, যেমন কাজ করেছে বিভাগ-পূর্ব যুগে 'আজাদ' পত্রিকা পাকিস্তানের দাবীকে দুর্বার করে তুলতে।

আমার মনে বহুদিন যাবতই একটা ধারণা বিরাজ করছে যে, বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্তের পক্ষে সার্থক ও স্থায়ী কিছু গড়ে তোলা সত্যিই কঠিন ব্যাপার। পাকিস্তানের সময়ে আমাদের সব দুর্দশার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীদের দায়ী করে আমরা তৃপ্ত হয়েছি। কিন্তু যেটুকু সীমিত সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল তারও সদ্ব্যবহার আমরা করেছি

www.pathagar.com

কি? পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক কম হলেও প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আমলে অর্থনৈতিক প্রগতির সুযোগ আমরা পূর্বের তুলনায় বেশীই পেয়েছিলাম। কিন্তু তার কতটুকু সদ্ব্যবহার আমরা করেছি? বছরের পর বছর বরাদ্দকৃত বৈদেশিক ও দেশী মুদ্রার একটি বড় অংশই অব্যবহৃত রয়ে গিয়েছিল। অথচ এই সময়ে এদেশের প্রশাসনিক কাঠামো পরিচালনাভার প্রায় পুরোপুরিভাবে বাঙালীদের উপরই ন্যস্ত ছিল। তাছাড়া যথেষ্ট গলাবাজি হলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের সত্যিকার প্রগতি কতটুকু হয়েছে? আসলে একটা নেতিবাচক মনোভাব এদেশের মধ্যবিত্তের মজ্জাগত হয়ে গেছে। নিজের দায়িত্ব নিষ্ঠনতমভাবে পালন না করে, অন্যের উপর দোষারোপ করেই আমরা একটা অস্বাভাবিক আনন্দ পাই। আইয়ুব আমলে কেবল এদেশের মানুষেরই রাজনৈতিক অধিকারগুলো হরণ করা হয়নি, তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণেরও একই অবস্থা ছিল। কিন্তু তারা পাঞ্জাব ও করাচীর অর্থনৈতিক উন্নতি পুরোদমেই চালিয়ে গেছে। ১৯৬০-৬২ সালের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের উপর বৈদেশিক মুদ্রার নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠে। তারপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অফিসাররা মধ্যপ্রাচ্যের কতগুলো মুসলিম দেশের সেনাবাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নেয়াতে ঐসব তেলসমৃদ্ধ দেশের অর্থনৈতিক সাহায্য পেতে শুরু করে। আমেরিকার আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের প্রায় পুরোটাই পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যয়িত হচ্ছিল। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে সে সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হলেও ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতালাভের পর আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জমানার মধুচন্দ্রিমার অবসান হয়ে নতুন করে তিক্ততার সঞ্চার হয়। তারপর কিসিঞ্জার-ডিপ্লোম্যাসির বদৌলতে চীন ও আমেরিকার মধ্যেও সম্পর্ক কিছুটা উষ্ণ হয়ে উঠে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পূর্বেই আইয়ুবের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রচেষ্টায় চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠে। চীন-ভারত বিরোধের ফলে পাকিস্তানের প্রতি চীনের মনোভাব বদলাবার সহায়ক হয়েছিল। এসব আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ার ফলেই পাকিস্তানী শাসকচক্র পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার দাবী মেনে নেয়ার পরিবর্তে যদি বাঙালীদের অস্ত্র বলে দাবিয়ে রাখতে না পারা যায় তবে তারা পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করে। তারা উপলব্ধি করেছিল বাঙ্গালীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবী মেনে নিলে তাদের অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও বেলুচ, পাঠান ও সিন্ধীদের স্বাধিকারের দাবী দুর্বার হয়ে উঠবে। বাঙ্গালী-দের স্বাধিকার দাবী উত্তাল হয়ে উঠা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্রের ঠাণ্ডামাথায় উপরোক্ত হিসাব-নিকাশই ১৯৭১-এর পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাত্রির পটভূমিকা রচনা করে।

এসব পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটলাম একটামাত্র কারণে। বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্তের চরিত্রের দুর্বলতা সম্বন্ধে আমার মনে যে ধারণা ছিল, দুর্ভাগ্যবশত তা স্বাধীনতালাভের পর দূর না হয়ে আরও দৃঢ় হয়। স্বাধীনতালাভের পর নিজেদের ভাগ্যকে মনোমত করে গড়ে তুলবার যে সুযোগ আমাদের এসেছিল, তা চোখের সামনে দেখলাম বয়ে যেতে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এদেশের মানুষের উপর অকথ্য বর্বরতা করেছে, কিন্তু একটি শিল্পেরও তেমন ক্ষতি করেছে বলে জানা নেই। বিদেশ থেকে সক্রিয় সহানুভূতি পেয়েছি আমরা প্রায় চার হাজার কোটি টাকার। কিন্তু যে নেতিবাচক মনোভাব পাকিস্তান আমলেও যেটুকু অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভব ছিল তাও হতে দেয়নি, স্বাধীনতার পর তার বিলুপ্তি না ঘটে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া যে ব্যক্তিস্বার্থের রাজনীতি দলীয় ও উপদলীয় কোন্দল আমা-দের প্রাক-স্বাধীনতা রাজনৈতিক জীবনকে ঘোলাটে করে রেখেছিল, স্বাধীনতার পর তা অমানুষিক হিংস্র রূপ পরিগ্রহ করে। ফল যা হবার তাই হয়েছে। যতদিন আমরা কেবল অন্যের ঘাড়ে সব দোষ না চাপিয়ে দেশের প্রতি নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে একটু সচেতন না হই ততদিন আমাদের একটার পর একটা বিপর্যয়ের আবর্তে ঘুরপাক খেতে হবে

৩০ নভেম্বর ১৯৭৫।

www.pathagar.com

৭ (ক)

প্রায় তিন মাস আগে একদিন আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু নজমুল আবেদীন খান ঘরে ঢুকেই প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন, "আচ্ছা বলুনত, এদেশে কি বাংলাদেশপন্থী কেউ নেই?" আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "কেন? কি হয়েছে?" ভদ্রলোক জবাব দিলেন, "আপনাদের কাগজগুলো পড়লে তো মনে হয় দেশটা চীনপন্থী, রুশপন্থী, মার্কিনপন্থীতে ভরে রয়েছে আর দেশের মানুষও দেখি বিশ্বাস করে ভারতের দালালরা সব সুযোগের অপেক্ষা করে রয়েছে আমাদের সর্বনাশ করার জন্য। বাংলাদেশপন্থী লোক এদেশে আছে বলেত মনে হয় না।" জনাব দিলাম, "কেন? এত কলামের পর কলাম লেখা হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সকলকে সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানিয়ে, তা কি আপনার নজরে পড়ে না?" আবেদীন ভাই একটু হেসে জবাব দিলেন, "দেখুন, মেঘে মেঘে বয়স ত আর কম হয়নি, আর লেখাপড়াটাও করেছি ইংরেজ আমলে। দেশবিভাগের পর সরকারী চাকরিই করেছি, রাজনীতির ছায়াও মাড়াইনি। তবে খবরের কাগজ পড়ি বাল্যকাল থেকেই। সুতরাং বাংলাদেশের জন্য আপনারা যা লেখেন ও নেতারা যা বলেন তারমধ্যে কতটুকু খাঁটি পদার্থ আছে সেটা বুঝবার মত ঘিলু মাথায় আছে। আমি কিন্তু আমার চারপাশে বাংলাদেশপন্থী দেখি না। যেভাবেই হোক এতদিন পরে একটা দেশ পেয়েছি, যাকে নিজের বলে ভাবতে, নিজের মনোমত গড়ে তুলতে কোন অসুবিধা নেই, যদি আমরা বাইরের দিকে বেশী না তাকিয়ে, বাইরের বিবাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে না পড়ে শুধু একটু অন্তর্মুখী হই আর নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বন্ধে বেশী সজাগ না হই।" এবার আমি হেসে জবাব দিলাম, "আপনার ঐ 'যদি'টা যে মস্তবড়, এমনকি একটা একেবারে অবাস্তব শর্ত!" "তাহলে আমাদের কপালে আরও অনেক দুর্ভোগ আছে"—বেদনা-মিশ্রিত কণ্ঠে

www.pathagar.com

আবেদীন ভাই বললেন। আবেদীন ভাই খোদাপরস্ত নির্ভেজাল সৎ-লোক। তাঁর কথাগুলো শোনার পর থেকেই মনে মন্থে নাড়াচাড়া কর-ছিলাম এবং ভেবেছিলাম এ সম্বন্ধে আলোচনা করব। তারপর চারদিকের নানা ডামাডোলে ভুলে গেছি।

সকাল দশটা বেজে গেলেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। শীতটা আমার সহ্য হয় না। নাস্তা করে আবার অর্ধেকটা লেপ মুড়ি দিয়ে চোখ বুজে চিন্তা করছিলাম এবারকার 'দরবারে' কি আলো-চনা করা যায়। পাশে কাগজগুলো পড়ে রয়েছে, আলসেমি করে সেগুলোও উল্টে-পাল্টে দেখিনি। ভোরে কাগজের জন্য অপেক্ষা করার আগ্রহটা কমে গিয়েছে অনেকদিন হয়। কিছুতেই মাথায় আসছিল না কি সম্বন্ধে লিখি। চিন্তাটা কিছুদূর অগ্রসর হলেই পড়ে 'চেক', ভরাডুবি হওয়ার ভয়ে আর এগুই না। এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল, ভেসে এল এক বন্ধুর গলার আওয়াজ, "বেড়ে বলেছেন হে আমাদের বুড়ো।" আগামাথা না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে আবার বেড়ে বলল।" "ঐ যে বলেছেন, অমুকপন্থী, তমুকপন্থী ছেড়ে দিয়ে আমাদের খাঁটি বাংলাদেশপন্থী হতে হবে।" এবারও ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, "অত হেঁয়ালি না করে একটু খুলেই বল না।" টেলিফোনের ওপারের ভদ্রলোক আমার পঁয়ত্রিশ বছরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। সে এবার একটু রসিয়ে বলল, "ওহে গাড়োল-প্রবর! নিজেকে ত সবজান্তা সাংবাদিক মনে কর। আজ-কের 'সংবাদ' এখনও পড়নি?" সংক্ষেপে জবাব দিলাম, "না"। "ওঃ ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমিত আজকাল আফিম ধরেছ।" "আফিম নয়, ভেলিয়াম"। জবাব এল, "ঐ একই কথা। আফিমের বিলেতী সংস্করণ। 'সংবাদ'টা কাছে থাকলে কষ্ট করে প্রথম পৃষ্ঠায় একটু নজর দিলেই আমার কথার অর্থ পরিষ্কার হয়ে যাবে"—এই বলেই আদি এবং অকৃত্রিম সৈয়দ মান্নান বখ্‌শ রিসিভারটা রেখে দিল।

'সংবাদ'টা হাতে নিয়েই বুঝলাম, সত্যিই এতক্ষণ কাগজটা না পড়ে গাড়োলী করেছি। প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষেই মওলানা ভাসানীর ছবি এবং তাঁর সঙ্গে 'সংবাদ' প্রতিনিধি আবু আল সাঈদের মওলানা সাহে-বের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারের বিবরণ। দেখলাম মান্নান বখ্‌শ আমাকে 'সংবাদ'-এর হেডিংই টেলিফোনে হুবহু শোনাচ্ছিল। নেতা-

www.pathagar.com

দের ভাষণ-বিবৃতি, সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের বিবরণ সম্বন্ধে সকল আকর্ষণ আমার চলে গেছে বেশ কয়েক বছর যাবৎ। এবং আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমি একাতো নইই বরং দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র পাঠকই আমার সঙ্গী। কারণটা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে কি? মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এ রিপোর্টটি আমি গভীর মনোযোগসহকারেই পড়লাম। পড়ে ভাল লাগল ও বহু কথা মনে পড়ল।

মওলানা ভাসানীকে আমি প্রথম দেখি ১৯৪৫-৪৬ সালে কলকাতায় মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের পার্ক সার্কাসে মৃগেন্দ্রলাল মিত্র রোডের বাসায়। আসামে তখন কুখ্যাত লাইন সিস্টেমের মাধ্যমে ঐখানে বসতি স্থাপনকারী পূর্ব বাংলার, বিশেষ করে ময়মনসিংহ-এর চাষীদের ঘরবাড়ী পুলিশ ও হাতী নিয়োগ করে ভেঙ্গে উৎখাত করে দেয়া হচ্ছিল। এসব চাষী ছিল মুসলমান। বাঙ্গালী ও মুসলমান বসতিকারীদের দ্বারা অদূরভবিষ্যতে সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কায় আসামের তদানীন্তন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী মিঃ গোপীনাথ বড়দলৈ উপরোক্ত হিংস্র নীতি গ্রহণ করেছিলেন। লাইনপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের নেতা হিসেবে মওলানা ভাসানী তখন খ্যাতির উচ্চতম শিখরে। প্রথম দর্শনেই মওলানা ভাসানীকে আমার অন্যান্য মসলিম লীগ নেতৃবর্গের চেয়ে ভিন্ন ধরনের বলে মনে হলো। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যথেষ্ট তীব্র কথাবার্তা বললেও একবারও তাঁকে হিন্দু শব্দটি উচ্চারণ করতে শুনলাম না। এরপরও তাঁকে কয়েকবার 'আজাদ' অফিসে দেখি। কিন্তু ভক্তদের ভিড়ে কাছে যেতে পারিনি এবং তার কথার তোড়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করার সুযোগও হয়নি। তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—আমার মনে হয় যে, তিনি কেবল যে মুখে চাষী-জনতার সুখ-দুঃখের কথা বলছেন তা নয়, তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ করার সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর সিরাজগঞ্জ প্রজা সম্মিলনীর কিংবদন্তীর ন্যায় কাহিনী, আসামের জঙ্গলে বাঘ-হাতীর সঙ্গে লড়াই করে মানুষের আবাদ গড়ে তোলা এবং হামিদাবাদে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, সরাইখানা প্রতিষ্ঠার বিবরণ লোকমুখে শুনেছি। দেশবিভাগের পর ঢাকার কারকুনবাড়ী লেনে জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খাঁ সাহেবের বাসায় মওলানা সাহেবের সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়। আসাম

www.pathagar.com

থেকে সদ্য-আগত। বড়দলের জেল থেকে বেরোবার পর তিনি দেশে এসেছেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের মারফতে স্বদেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য। কিন্তু মওলানাকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁরা মওলানা ও তাঁর সমর্থকদের রসিদ বই দিলেন না সদস্য সংগ্রহের জন্য। একটি প্রচারপত্রও দেখলাম যে, সর্দার প্যাটেলই মওলানা সাহেবকে পাঠিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানকে ধ্বংস করে ভারতের সঙ্গে জুড়ে দেয়ার জন্য। এ ব্যাপারে নাকি সর্দার প্যাটেল আসামের জেলে মওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করেছেন। শহীদ সাহেবের ভাগ্যেও এই একই লাঞ্ছনা জুটল। ভারতের অন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ যখন সংখ্যালঘু মুসলমানদের আগুনের মুখে ফেলে রেখে পাকিস্তানে এসে আখের গোছাতে ব্যস্ত, তখন সিংহমনা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় থেকে যান তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। সে সময়ে তাঁর পাকিস্তানে না আসাকে পাকিস্তানের প্রতি তাঁর আনুগত্যের অভাব বলেই মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ অপপ্রচারে মুখর হয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, পাকিস্তান গণপরিষদের তার সদস্যপদও বাতিল করা হয়। তিনি যখন পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক শান্তিরক্ষার মিশনে আগমন করেন তখন তাঁকে নাজিমুদ্দিন সরকার কর্তৃক এদেশ থেকে পরোয়ানা জারি করে বার করে দেয়া হয়। পাকিস্তান হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন থেকে শুরু করে জনতার অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধানে অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনে ক্ষমতাসীনদের ঔদাসীন্যে রাজনীতি-সচেতন মধ্যবিত্ত জনতা শিশুরাষ্ট্রের কৈফিয়ত না মেনে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল এবং তারা পাকিস্তান আন্দোলনের এ দুই পরীক্ষিত অগ্রনায়ক সম্বন্ধে ক্ষমতাসীনদের অপপ্রচারে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে নাই। এরপর এই দুই নেতা হাত মিলান ও আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি যখন মরহুম লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসেছিলেন তখন এক ভুখ-মিছিল বার করার অপরাধে মওলানা ভাসানী গ্রেফতার ও বিনাবিচারে কারারুদ্ধ হন এবং পাকিস্তানে শুরু হয় বিরোধীদলের, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার হয়ে যাঁরাই কথাবার্তা বলবেন তাঁদেরই কণ্ঠ রুদ্ধ করার পালা।

www.pathagar.com

এরপর থেকে বিভিন্ন ভূমিকায় মওলানা ভাসানীকে আমি কাছে থেকেই দেখে এসেছি এবং বলতে পারি তাঁর একজন স্নেহের পাত্র হিসেবে এক সময়ে পরিগণিত হওয়ার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। বিভাগোত্তর যুগে এ দেশের রাজনৈতিক বিবর্তনে মওলানা ভাসানীর অবদান আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই লক্ষ্য করে এসেছি। বিভাগ-পূর্ব যুগের আমাদের নেতাদের মধ্যে মওলানা ভাসানীই এখনও বেঁচে আছেন এবং পুরোপুরি কর্মক্ষম আছেন। বেশ কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে আমার তেমন যোগাযোগ নেই। শেষবার দেখা হয় ১৯৭০ সালের জুন মাসে; যখন তিনি চিকিৎসার্থে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেবারও অনেকদিন পর দেখা। চেহারা দেখেই মওলানা সাহেব আমাদের গ্রামের বাড়ীঘর সম্বন্ধে এমন সব কথা বলা শুরু করলেন, যা আমারও জানা ছিল না। আমি ওসব কথায় না যেয়ে তাঁকে দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করলাম। তিনি এমন একটা গ্রাম্য গল্পের মেছাল দিলেন যার নির্গলিতার্থ হল, "ইলেকশানের মারফতে ক্ষমতা দখলের খোয়াবে যারা মশগুল আছে তাদের সে খোয়াব পূর্ণ হবে না। সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে চুরমার হয়ে যাবে।"

বহুদিন পরে মওলানার আলোচ্য সাক্ষাৎকারের বিবরণটি আমার মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছে যে, এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা হচ্ছে। আগামী দিন তাই করবার চেষ্টা করব।

৭ ডিসেম্বর ১৯৭৫।

www.pathagar.com

৭ (খ)

মওলানা ভাসানী পাকিস্তান আমলে এদেশে সরকারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কম লাঞ্ছনা তাঁকে সহ্য করতে হয়নি। কেবল গণতন্ত্রের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়া নয়, তিনি সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত করার জন্য। অবশ্য পাকিস্তানের জন্মের সময়ই সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রস্তাব করেছিলেন মুসলিম লীগ ভেঙ্গে দিয়ে 'পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ' নামে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠন করার, যাতে অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার থাকবে। এ সম্বন্ধে তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতিও দিয়েছিলেন। জনাব আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'-এ লিখেছেন, "ইহা কায়েদে আজমের মত বলিয়া তৎকালে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের জানা ছিল, অনেকের মতও তাই ছিল বলিয়া শোনা যাইত। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী সাহেবই প্রথম সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়া এই মত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন।" কিন্তু এ প্রস্তাব মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেন না। পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্বোধনী ভাষণে কায়েদে আজম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে হিন্দু আর হিন্দু এবং মুসলমান আর মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হবে না, এ থেকেই বোঝা যায় পাকিস্তানের রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক পথে পরিচালিত করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, পাকিস্তানের জনক যে-কতদিন বেঁচেছিলেন পাকিস্তানের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ মুখে তাঁর নাম জপলেও কার্যতঃ তাঁর কোন কদর ছিল না এবং নিদারুণ আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে অত্যন্ত অবহেলার মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক কর্নেল ইলাহী বখ্‌শ্ একটি প্রামাণ্য বই লিখে গেছেন। ন্যাশনাল লীগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় একমাত্র এই কারণে যে,

www.pathagar.com

পাকিস্তানের সে সময়কার নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান অর্জনকারী মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে নিজেদের ক্ষমতাকে একচেটিয়া করে রাখতে চেয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী সাহেব 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা করার পর বিরোধীদলের অস্তিত্বের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে একটা অসাম্প্রদায়িকতার পরিবেশ সৃষ্টির আন্দোলনও চলতে থাকে। প্রধানতঃ মওলানা ভাসানীই পূর্ব বাংলার শহর-বন্দর-গ্রামে এই বিভেদের আবহাওয়া দূর করার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অবশেষে তাঁরই প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। বস্তুতঃ তাঁর অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে মাঝে মাঝে এমন পথে যেতে দেখেছি যে, বামপন্থীরাও সে পথে যেতে নারাজ ছিলেন।

মওলানা সাহেবের রাজনীতিতে দুটো পরস্পরবিরোধী ধারা সব-সময়েই বিরাজ করেছে। একই সঙ্গে তিনি বিরোধীদলীয় রাজনীতিতে চরমপন্থী কথাবার্তা বলছেন, আবার প্রাসাদ চক্রান্তেরও খোঁজখবর নিচ্ছেন—এ হেঁয়ালি আমি দেখেছি ১৯৫৬ সাল থেকে। অবশ্য রাজ-নীতিতে সবদিক জেনেশুনে ভাবনা-চিন্তা করেই কর্মপন্থা ঠিক করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় আবার দেখা গেছে যে, তাঁকে দেশের যখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন নেতৃত্ব দেবার জন্য, ঠিক তখনই তিনি রাজ-নীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে মিস জিন্নাহ'র নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় মওলানা সাহেব সফর করা ছেড়ে দিয়ে টাঙ্গাইলের বিন্নাফৈর যেয়ে বসে রয়েছেন। মানিক ভাই আমাকে বললেন, "দেখতো মৌলানা সাহেবের কাণ্ড! এই বেচারীকে ইলেকশানে নামাইয়া উনি বোধহয় রাগ কইরাই বিন্নাফৈরে যাইয়া বইসা রইছেন। তুমি আর শহীদুল্লা চল আমার সঙ্গে, ওনারে নিয়া আসি। একটা গাড়ীও যোগাড় কর।" আমি প্রথমে রাজী হচ্ছি-লাম না, কারণ শুনেছিলাম বিন্নাফৈর যেতে হলে অন্ততঃ তিন মাইল হেঁটে যেতে হয়। হাঁটার ব্যাপারে পা দুর্বল হওয়ায় আমার অসুবিধা ছিল। ইঞ্জিনীয়ার রফিকুল হক ভাইয়ের গাড়ীতে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমরা চারজন তালুফাটা রোদে বিন্নাফৈর পৌঁছে মওলানা সাহেবকে বহু অনুনয় করা সত্ত্বেও তিনি অসুস্থতার কারণে নির্বাচনী প্রচারে নামতে রাজী হলেন না। বললেন, "বরিশাল কবিরাজের জন্য পাঠিয়েছি, তিনি এসে নিদান দেয়ার পর শরীর ভাল লাগলে যাব।"

www.pathagar.com

মনটা খুব খারাপ করে চলে এলাম। ইলেকশনের ফলাফল বেরুবার পর দেখা গেল মিস জিন্নাহ পূর্ব বাংলায় শতকরা উনপঞ্চাশটি ভোট পেয়েছেন আর পশ্চিম পাকিস্তানে পেয়েছেন (যতদূর মনে পড়ে) শতকরা উনত্রিশটি। এতে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। যদি মওলানা ভাসানী একটু চেষ্টা করতেন তাহলে হয়ত অন্ততঃ পূর্ব বাংলার রায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিরুদ্ধে যেত। মওলানা ভাসানীর রাগ করার অবশ্য কিছুটা কারণ ছিল। মিস জিন্নাহ'র সঙ্গে চাটগাঁ যাওয়ার সময় সারাপথে একটি দলের কর্মিগণ কর্তৃক মওলানা ভাসানীর প্রতি একরূপ পরিকল্পিত অবহেলাই প্রদর্শন করা হয়েছিল। এছাড়াও মওলানা ভাসানী বহুদিন যাবতই বলে আসছিলেন যে, ভোট ক্যানভাসের রাজনীতি তাঁর আর ভাল লাগছে না, কারণ, তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বারবারই তিনি দেখে যাচ্ছেন যে, ইলেকশনে জিতে গদিতে বসে জনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করাই এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এরপর মওলানা ভাসানী বেশ কিছুদিন রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ সক্রিয় ছিলেন না। এটাকে অনেকে আইয়ুবের প্রতি তাঁর দুর্বলতা বলেই মনে করেছে।

একথা সত্যি যে, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে মওলানা ভাসানী সকল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। নিজে আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করার দায়িত্ব নিতে তিনি এগিয়ে আসেন না। এ ব্যাপারে অসুবিধাও তাঁর ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন সামগ্রিকভাবে আওয়ামী লীগ ও পূর্ব বাংলার স্বাধিকার দাবীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মওলানা সাহেবের রাজনীতি ছিল কৃষকদের অভাব-অভিযোগ, দাবী-দাওয়ার প্রতি জোর দেয়া। কিন্তু মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় এসব চাপা পড়ে যায়। মওলানা সাহেব একবার এমনও ভাবছিলেন বলে অনেকে বলে যে, আইয়ুবের মারফতেই হয়ত কৃষক-জনতার বেশী উপকার করা সম্ভব হবে। কিন্তু মওলানা সাহেব রাজনৈতিক ময়দানে নিজে খুব বেশী অবতীর্ণ না হলেও বামপন্থীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলছিলেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে চীন ও রাশিয়ার তীব্র সংঘাতের ফলে দুনিয়া-জোড়া যে বিভেদ সৃষ্টি হয় তার ফলে পূর্ব বাংলার বামপন্থী আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং মওলানা ভাসানী চীনপন্থীদেরই

www.pathagar.com

পক্ষাবলম্বন করেন। এরই প্রত্যক্ষ ফলে তিনি ক্রমে ভারতবিরোধী হয়ে পড়েন। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অন্যান্য নেতৃবর্গের মত মওলানা ভাসানীও ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানেও তিনি বেশী সক্রিয় ছিলেন না। আওয়ামী লীগই মুজিব নগর সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। অন্য কোন দলকে তারা সঙ্গে নেয়নি। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে মওলানা ভাসানী ভারত ও তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের বিরোধিতা করেন। ১৯৭৩-এর নির্বাচনে তাঁর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অংশগ্রহণ করলেও তিনি এতে বেশী উৎসাহ প্রদর্শন করেননি। মোটামুটি সন্তোষে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত থেকে মাঝে মাঝে বিবৃতি দিয়ে দেশের দুরবস্থা ও সার্বভৌমত্বের বিপদ সম্বন্ধে দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করেই মওলানা সাহেব তৃপ্ত থেকেছেন। চীনাপন্থীরা নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় এর প্রতিক্রিয়া তাঁর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির উপরও পড়ে। মওলানা সাহেব ক্রমে ন্যাপ থেকেও কার্যতঃ সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এরপর ত দেশ থেকে সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত হয়ে একটা দলই ময়দানে রইল। তারপর দেশের উপর চমকপ্রদ পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেল।

'সংবাদ' প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মওলানা যেসব কথা বলেছেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁর চিন্তাশক্তি এখনও পূর্বের ন্যায় প্রখর রয়েছে। এবং তাঁর কথার মধ্যে একটা ভিন্ন সুরও রয়েছে বলে আমার মনে হয়। "অমুকপন্থী তমুকপন্থী" বলতে যে তিনি দেশের বামপন্থী আন্দোলনে যে তিক্ত বিভেদ রয়েছে সেটাকে বুঝিয়েছেন তা আরও পরিষ্কার হয় যখন তিনি বলেন যে, রুশ ও চীনের মধ্যে বিরোধ না থাকলে সাম্রাজ্যবাদ আরও দুর্বল হয়ে পড়ত। মওলানার এ বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। যদি নিজের দেশের মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় তবে যে চীনপন্থী ও রুশপন্থীদের এক সঙ্গে কাজ করা সম্ভব তা ভিয়েতনামের ক্ষেত্রেই উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের এ হতভাগ্য দেশে বামপন্থী, মধ্যপন্থী, দক্ষিণপন্থী কোন মহলেই তিনজন লোককে একসঙ্গে তিন দিন কাজ করতে দেখা যাচ্ছে না, ব্যক্তিস্বার্থটা এমন সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করেছে। মওলানা ভাসানী আলোচ্য সাক্ষাৎকারে দেশের ভিতরের সমস্যা ও বাইরের আশঙ্কার মোকাবিলার জন্য সকল দেশ-

www.pathagar.com

প্রেমিকের ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন ; কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে। আমি প্রথমেই বলেছি, বিভাগ-পূর্ব নেতৃবর্গের মধ্যে মওলানা ভাসানীই আজ আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন। তিনি যদি এ ব্যাপারে নিজে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন তাহলে কিছু একটা দাঁড়াতে পারে। বর্তমানে তিনি প্রায় নির্দলীয় ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন। দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি পুরোপুরিই ওয়াকিফহাল। আলোচ্য সাক্ষাৎকারে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে মওলানা সাহেব হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির অন্যতম অগ্রপথিক মওলানা সাহেবের এ হুঁশিয়ারি যে সময়োচিত হয়েছে তা বলা বাহুল্য। ইসলামী জীবনদর্শনে মওলানা সাহেব অগাধ জ্ঞান রাখেন। সাম্প্রদায়িকতা যে ইসলামের মর্মবাণীর বিরুদ্ধে, এ সতর্কবাণী তাঁর মুখে যদি উচ্চারিত হয় তার যতটা গুরুত্ব হবে, অন্য কারও কথায় ততটা হবে না। যে ঐক্যজোটের উপর মওলানা সাহেব জোর দিয়েছেন, সাম্প্রদায়িকতা তার একটা প্রতিবন্ধক। মওলানা সাহেব আজ দেশকে নতুন করে এই ঐক্যের ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে পারেন, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে এগিয়ে আসবেন কি ?

৯ ডিসেম্বর ১৯৭৫।

www.pathagar.com

৮

গত দশ-বারদিন একটানা জ্বর চলছে। এজন্য এক সপ্তাহ লিখতে পারিনি। শরীর আমার কোন সময়েই ভাল ছিল না। তবে আগে একশ' দু'তিন ডিগ্রী জ্বর নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। না বললে কেউ বুঝতে পারত না। এখন আর পারি না। শরীর মনে শক্তি কমে এসেছে। অসুখ হলে মাথায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নানা চিন্তা ভিড় জমায়, মনে হয় সবই যেন সেদিনের কথা।

বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত যখন পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সে বিশ্বাস করত যে, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে হিন্দুই তাকে দাবিয়ে রেখেছে। পাকিস্তান অর্জিত হলেই তার আত্মবিকাশের সব দরজা খুলে যাবে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে যখন ঢাকায় পৌঁছাই তখন দেখি সকলে আনন্দে আত্মহারা। অবশ্য হিন্দু মধ্যবিত্ত তখন স্রোতের ন্যায় সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে। নবাবপুরে অধিকাংশ দোকান তখন হিন্দুদের ছিল। তাদের পরিত্যক্ত প্রায় সবগুলো দোকানই পশ্চিমা মুসলিম মোহাজেরদের এ্যালট করা হল। সারা নবাবপুরে চার-পাঁচটির বেশী বাঙ্গালী দোকান ছিল না। ক'দিন পরেই দেয়ালে আঁটা পোস্টার দেখলাম—"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" এর কিছুদিন পর ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে ঢাকায় সফরে এসে জিন্নাহ সাহেব ঘোষণা করলেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা।" একথাটা প্রথম তিনি বলেন রেসকোর্সের জনসভায়। আমার এখনও রেডিওতে শোনা তাঁর কণ্ঠস্বর কানে বাজছে "Urdu and no other language but Urdu will be the State language of Pakistan." জিন্নাহ সাহেবের বাংলা বলার প্রশ্নই ছিল না। উর্দুও তিনি ভাল জানতেন না। সব সময়ই ইংরেজীতেই তিনি বক্তৃতা করতেন। তখন একথার কোন প্রতিবাদ রেডিওতে বা লোকমুখেও শুনিনি।

www.pathagar.com

এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন একই কথার পুনরাবৃত্তি হল, তখন রেডিওতেই আওয়াজ শুনলাম No, No, No বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জিন্নাহ সাহেবের ঘোষণার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। সে সময় জিন্নাহ সাহেবের কোন কথার প্রতিবাদ করা এদেশে অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। শুধু প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হন না, ছাত্ররা ১১ই মার্চ এর প্রতিবাদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ডাকল ও শোভাযাত্রা করে সেক্রেটারিয়েটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

আমি তখন সরকারী কর্মচারী। সেক্রেটারিয়েটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম ছাত্র শোভাযাত্রার উপর পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করছে। আমার ভাগিনেয় মামুন মাহমুদের (১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়ার দিকে রাজশাহী রেঞ্জের পুলিশের ডি, আই, জি থাকাকালীন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়। তার মৃতদেহের কোন হদিসই পাওয়া যায়নি।) কপালে দেখলাম পট্টি। রক্তমাখা রুমালের পট্টি। এই সময়েই সেক্রেটারিয়েটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শহীদুল্লা কায়সারকেও বক্তৃতা করতে দেখলাম। অনেক ছাত্র আহত হল, পাইকারীভাবে ছাত্র ও ভাষা আন্দোলনের সমর্থক নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হলেন। মুসলিম লীগ সমর্থকেরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হোস্টেল আক্রমণ করে ছাত্রদের যাকে হাতের কাছে পায় পিটায় এবং তাদের জিনিসপত্র সব লুটপাট করে তছনছ করে দেয়। লাঠিচার্জ ও এর ফলে আন্দোলন না দমে চলতেই থাকে। লক্ষ্য করলাম লোকের চোখের রং বদলে যাচ্ছে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন সেটা ছিল প্রধানতঃ ছাত্রদের ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের, কিন্তু এগারই মার্চের পর আন্দোলন না থেমে প্রসার লাভ করায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব খাজা নাজিমুদ্দীন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের নিকট সুপারিশ করবেন। গ্রেফতারকৃত সকলকে মুক্তি দেয়া হল এবং পরিস্থিতি তখনকার মত শান্ত হল।

এরপর চার বছর ধরে নিত্যদিনের অভিজ্ঞতায় পূর্ব বাংলার মানুষ দেখল তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মবিকাশের পথ প্রসারিত হওয়ার পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে সংকুচিতই হচ্ছে। পূর্ব বাংলা সেক্রেটারিয়েটেই বহুদিন একজন বাঙালী যুগ্ম সচিবও

www.pathagar.com

ছিলেন না, কেন্দ্রীয় সরকারের তো দূরের কথা। একটি একুশ তাঁতের কুটির শিল্পের জন্যও তাকে দৌড়াতে হয় করাচী। পাটের প্রধান উৎপত্তি ভূমি হল পূর্ব বাংলা আর পাটকলগুলো সবই ছিল কলকাতার আশেপাশে। কয়েক বছর একটিও পাটকল স্থাপনের কোন চেষ্টাই হল না। আমদানী-রফতানী বাণিজ্য পশ্চিমাদের একচেটিয়া। শাসনতন্ত্রের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল পূর্ব বাংলাকে কোনরূপ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়নি। ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রদেশগুলোর যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার ছিল, এ রিপোর্টে পূর্ব বাংলার তাও রইল না। এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে এদেশের জনমত চূড়ান্তভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠায় রিপোর্টটি কার্যকরী করা বন্ধ হয়ে রইল। ১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত সরকার বিরোধী কোন জনসভা করাই অসম্ভব ছিল। মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে ঢাকা আর্মানীটোলা ময়দানে বিরাট জনসভায় রিপোর্টকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করে পূর্ব বাংলার জন্য সার্বিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয়। এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় কনভেনশনে একমাত্র অর্থ ও দেশরক্ষা ব্যতীত আর সব দায়িত্ব পূর্ব বাংলা সরকারকে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে তখন পাঞ্জাবীদের কোন্দল থেকে ওঠায় তিনি তখন পূর্ব বাংলার জনমতকে সঙ্গে রাখার প্রয়োজনে বি,পি,সি আন্দোলনকে দমন না করে রিপোর্টটিকে কার্যকরী করা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। কিছুদিন পূর্বেই বরিশালে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যারাই তাঁর সরকারের বিরুদ্ধতা করবে তাদেরই মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে (ছের কুচাল দেঙ্গে) এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীকে শত্রুদের লেলিয়ে দেওয়া কুকুর (running dog of our enemies) বলেছিলেন।

বাংলাকে অবিলম্বে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীও এই আন্দোলনের সময়ে অনুষ্ঠিত প্রতিটি জনসভায় উত্থাপিত হয়। পূর্ব বাংলার জন্য বাঙালী সর্বাধিনায়কের অধীনে পৃথক এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করার দাবীও করা হয়। কেবল আত্মরক্ষার তাগিদেই যে এ দাবী করা হয়, তা নয়। তখন পাকিস্তানের রাজস্বের শতকরা ৭৫ অংশ ব্যয়িত হত ডিফেন্স খাতে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের

৪--

www.pathagar.com

শতকরা দুই ভাগও বাঙালীদের ভাগ্যে জুটত না। কারণ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে বাঙালীদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল। এতে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক প্রগতি সামগ্রিকভাবেই ব্যাহত হচ্ছিল। এক কথায় পাকিস্তানী কাঠামোর মধ্যেই পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, সাংস্কৃতিক দাবী মূলনীতি কমিটি আন্দোলনের সময়েই সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থ বাঙালীকে তার আত্মবিকাশের অধিকার দিতে এক পা অগ্রসর হলেন না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ধামাচাপা পড়েই রইল। অসন্তোষ ধূমায়িত হতেই থাকল। এমন সময়েই ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে পাকি-স্তানের তখনকার প্রধানমন্ত্রী জনাব খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভায় ঘোষণা করলেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এক-মাত্র উর্দুই হবে।" বাস্। সঙ্গে সঙ্গে ধূমায়িত আগুন আবার জ্বলে উঠল। ছাত্ররা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট আহবান করল। আমি নবাবপুর রোডে দাঁড়িয়ে দেখলাম ধর্মঘটী ছাত্রদের বিরাট লম্বা শোভাযাত্রা। ২১শে ফেব্রুয়ারী ডাকা হল সারা প্রদেশে সাধারণ সামগ্রিক হরতাল। কয়েকদিন পরেই সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে সভা, শোভাযাত্রা সব নিষিদ্ধ করে দিলেন। খবর পেলাম সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রয়োজন হলে ট্যাঙ্ক বার করে সেনাবাহিনীর দ্বারা ২১শে'র হরতালকে বানচাল করা হবে। সংগ্রাম পরিষদের সদস্য জনৈক ছাত্রনেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এবার আপনারা কি করবেন?" জবাব পেয়েছিলাম, "১৪৪ ধারা ভাঙবোই।" কথাটা 'সংবাদ' অফিসে বসেই হয়েছিল। 'সংবাদ' মুসলিম লীগের কাগজ হলেও আমাদের এখানে তখন সরকারবিরোধী নেতা ও কর্মীদের আড্ডা ছিল। তখনও 'দৈনিক ইত্তেফাক' বার হয়নি। বি, পি, সি, আন্দোলনের সময়ে 'পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) অবজারভার'ই সংগ্রাম কমিটির অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সংবাদ'-এর সাহিত্য পৃষ্ঠা দুটি ছিল বাংলা সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রস্থল।

পরিস্থিতি ক্রমে থমথমে হয়ে এল। একুশে ফেব্রুয়ারী নবাব-পুর রোডে সকাল ন'টায় দেখলাম, ছাত্ররা দলে দলে বিভক্ত হয়ে দোকান বন্ধ করার জন্য মালিকদের অতি বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করছে, কিন্তু অধিকাংশ দোকানের মালিক পশ্চিমা হওয়ায় তারা সে

www.pathagar.com

অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছে। যে দু'চারটি বাঙ্গালীর দোকান ছিল সে-গুলো বন্ধই ছিল। যানবাহনও দেখলাম মোটামুটি চলছে। অফিসে গিয়ে শুনলাম ইসলামপুরে সব দোকানপাট ও যানবাহন চলাচল বন্ধ। শহরের অন্যান্য অংশেও হরতাল আংশিকভাবে পালিত হচ্ছে। এগার-টার সময় টেলিফোনে শুনলাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পরিস্থিতি গরম হয়ে উঠেছে। ছাত্ররা পুলিশ বেষ্টনী ভেঙ্গে বার হওয়ার চেষ্টা করছে, পুলিশ বারবার লাঠি চার্জ করছে ও কাঁদানে গ্যাস বোমা ছুঁড়ছে। একজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে রিকশাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওনা হলাম। নাজিমুদ্দিন রোডের রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের ওপারে রিকশাওয়ালা যেতে রাজী না হওয়াতে হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের সামনে হাজির হয়েই বুঝলাম পরিস্থিতি সত্যই উত্তপ্ত। কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়া তখনও একটু একটু রয়েছে। রাস্তার এক পার্শ্বে ছাত্ররা চরম উত্তেজিতভাবে "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই" ও নানা প্রকার সরকারবিরোধী শ্লোগান দিচ্ছে। পুলিশের লাঠির আঘাতে কয়েক-জন আহত ছাত্রকে ধরাধরি করে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেশ কয়েকজনের মাথায় পট্টি বাঁধাও দেখলাম। সিটি এস, পি মাসুদকে দেখলাম ভীষণ উত্তেজিত, ছাত্রদের পাঞ্জাবী ভাষায় অশ্রাব্য গালিগালাজ করছে। ছাত্রদের যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখলাম, তাতে মনে হল, পরিস্থিতি আরও গড়াবে। মেডিক্যাল কলেজের ফটক পর্যন্ত যেয়ে আবার নাজিমুদ্দিন রোডে ফিরে এসে রিকশায় করে অফিসে রওনা হলাম। সত্যি বলতে কি, আমার পরিষ্কার মনে হচ্ছিল যে-কোন সময় গুলী চলতে পারে। অফিসের দরজায় রিকশা থামার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মত একজন সাইকেলে এসে খবর দিল "পুলিশ গুলী করেছে। অনেক ছাত্র মারা গিয়েছে।"

মনটা প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও হৃদপিণ্ডটা এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। অস্বীকার করবনা, এ ঘটনার তাৎপর্য তখনও পুরো উপলব্ধি করিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পেলাম শহরের অবস্থা অন্য রকম হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে ইদ্রিস ভাই এসে খবর দিয়েছেন মেডি-ক্যাল কলেজে তিনটা লাশ তিনি দেখে এসেছেন। বরকতের মাথার খুলি উড়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার মধ্যেই পরিস্থিতির রং একেবারে বদলে গেল। এর আগে ঢাকার স্থানীয় অধিবাসীরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বিশেষ যোগ দেয়নি। তাদের অধিকাংশই উর্দুর সমর্থক ছিল।

www.pathagar.com

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি মোড়ে মোড়ে জটলা। স্থানীয় অধিবাসীদেরও মুখ কালো। সারারাত অফিসে থেকে ভোরে ওয়ারীতে বাসায় গেলাম। ঐ ভোরেও দেখলাম রাস্তায় জটলা। একটা রিকশাও চলছে না। দু'ঘন্টা না ঘুমাতেই সরদার জয়েন উদ্দিন এসে খবর দিলেন, নবাবপুরে জনতার ওপর পুলিশ গুলীবর্ষণ করেছে এবং একটি ছেলে নিহত হয়েছে। তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পরে আমি ও জনাব খায়রুল কবির বাসা থেকে বেরিয়েই পি, টি, আই'এর বালনের কাছে শুনলাম, জনতা "মর্নিং নিউজ" অফিসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ভদ্রলোক আমাদের সামনের বাসাতেই থাকতেন। আমরা তখন সেক্রেটারিয়েটের দিকে হেঁটে রওনা দিলাম, সরকারের মনোভাবটা কি বুঝতে পারি কিনা দেখতে। অবশ্য গুলী চলার পর আগের দিন সন্ধ্যায়ই প্রাদেশিক আইন পরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছিল। পরিষদে বিরোধীদলের সংখ্যা ছিল তখন মাত্র তিনজন। সেক্রেটারিয়েটে পৌঁছবার আগেই বুঝলাম, সরকারের এ আত্মসমর্পণে পরিস্থিতি শান্ত হল না। সেক্রেটারিয়েটে পৌঁছে দেখি কামরা সব খালি, কেবল কিছুসংখ্যক উচ্চপদস্থ অফিসার পায়ে হেঁটে অফিসে এসেছেন। ডাইরেকটার অব পাবলিসিটি মাহমুদ হোসেন ভাইয়ের কামরায় যেয়ে দু'কাপ চা চাইলাম। তাঁর মুখ আমার চেয়েও সরেস ছিল। খিস্তি করে তিনি জবাব দিলেন, "চা খাওয়াবার উপায় রেখেছে এই সরকার। আমার সারা অফিসে একটা পিয়নও আসেনি। বহু হরতাল দেখেছি বাবা, এমনটি দেখিনি। খাও দুটো ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট। সিগারেট খেয়ে চায়ের সাধ মেটাও। সারা রাস্তা হেঁটে এলাম একটা বিড়ির দোকানও খোলা দেখলাম না। এ সরকারের মরণ এসেছে। আজও সকালে গুলী চলেছে। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বাছারা বুঝতে পারছে না।" এমন সময় একজন দৌড়ে এসে খবর দিল, "ছাত্ররা লাশ নিয়ে সেক্রেটারিয়েটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, হাইকোর্টের কোনায় পুলিশ শোভাযাত্রার গতি রোধ করেছে।" সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারিয়েট থেকে বেরিয়ে আবদুল গনি রোডে পড়েই গুলীর আওয়াজ পেলাম। পরে শুনলাম ঐখানে হাইকোর্টের একজন কর্মচারী ও একজন রিকশাওয়ালা নিহত হয়েছেন। ছাত্র-জনতার রক্ত মিশে একাকার হয়ে রাখীবন্ধন রচনা করল। বন্দুকের অগ্নি-ঝলকে বাঙালী নিজেকে চিনল।

www.pathagar.com

কয়েক দিনের মধ্যে পাইকারী গ্রেফতারের দ্বারা আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ততক্ষণে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। ভাষা আন্দোলনের কয়েকজন নেতাই পরবর্তাকালে পূর্ব বাংলার সবগুলো আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

১৯৫৪ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ভোর সাড়ে চারটায় করাচীর এ, পি, পি'র একজন সংবাদদাতাকে সঙ্গে নিয়ে আজিমপুর কলোনীর চৌমাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি প্রথম প্রভাতফেরীটি দেখার জন্য। "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি" গানটা গাইতে গাইতে প্রভাতফেরীটি এল সামনে। খালি পায়ে কালো শাড়ি পরা হাতে ফুল বেশ কয়েকজন ছাত্রী। সে বিচিত্র অনুভূতি পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধুরও মনে সংক্রামিত হল। সে খালি উচ্চারণ করল "My god". তিন ঘন্টা ধরে একটানা প্রভাতফেরী করে কবরস্থানে যাওয়া দেখে ফিরে এসে নিজের ফ্লাটে বসে যখন দু'জনে চা পান করছি তখন সে বলল ঃ "I have never seen anything like this Zahur. I think Muslim League's goose is cooked as far as the elections here are concerned. No, I think unless the rulers in Karachi soon realise the depth of the Bengali sentiments, bad days are ahead for Pakistan."

করাচী-'পিণ্ডির শাসকগণ বাঙালীর মনোভাবকে বুঝবারও চেষ্টা করলেন না। সুতরাং একুশের আন্দোলনের অগ্নিশিখায় বাঙালীর যে আত্মোপলব্ধি হয়েছিল তা সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকে এবং বরকত, সালাম, রফিক ও পরবর্তীকালে আরও অনেক শহীদের রক্ত ১৯৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে লাখ লাখ শহীদের রক্তের সাথে মিলে গিয়ে জন্ম হল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। আজাদী লাভের পরও প্রতিটি বছর একুশে ফেব্রুয়ারীর অগ্নিশিখায় বাঙালী জাতি নিজের সত্তাকে প্রাণভরে দেখে। যত দিন বাঙালী জাতির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন একুশে ফেব্রুয়ারীর এ অগ্নিশিখা অনির্বাণ রইবে, ১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারীর চব্বিশ বছর পরেও এ বিশ্বাস অটুট থাকার কারণ আছে।

২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬।

www.pathagar.com

১

শরীরটা বোধহয় আর সারবে না। দু'দিন ভাল থেকেই আবার জ্বরে পড়লাম এবং সে জ্বর একটানা দশ-বারদিন ধরে চলল। একটু ভাল বোধ করছিলাম গত দু'তিন দিন, আজ আবার খারাপ লাগছে। তবু কলম আর কাগজ নিয়ে বসলাম। কিন্তু কি লিখব মাথায় আসছে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা কথা এলোমেলোভাবে চিন্তা করছিলাম। কাগজে প্রায়ই দেখি, দেশের এই সঙ্কট মুহূর্তে জাতীয় ঐক্যকে বজ্র-দৃঢ় করে তোলার প্রয়োজন সম্পর্কে মওলানা ভাসানী থেকে শুরু করে জেনারেল জিয়া পর্যন্ত সকলেই বলছেন। কিন্তু কার্যতঃ দেখছি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঘটছে ঠিক উল্টো ব্যাপার।

আমার একেক সময়ে মনে হয় মৌলিক জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারেও দলীয়, উপদলীয় এমনকি ব্যক্তিস্বার্থের ওপরে উঠে চিন্তা করাটা অন্ততঃ আমাদের মধ্যবিত্তের ধাতেই নেই। এ ব্যাপার দেখে আসছি পাকিস্তানী আমলেরই প্রথম থেকে। রাজনীতি ক্ষেত্রে মতবিরোধ ও বিভিন্ন দল থাকবেই। গণতান্ত্রিক জীবনধারার এটা একটা পূর্ব-শর্ত। কিন্তু এই শর্তকে আমরা কোনদিনই মেনে চলিনি। সরকার-বিরোধিতাকে দেশদ্রোহিতার সামিল করতে যখন যে দল ক্ষমতায় গেছে তাদেরই দেখেছি। পাকিস্তানের সময় আমাদের সবগুলো এমনকি অধিকাংশ দল যদি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দাবী সম্বন্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকত, তবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এত অবিচার সম্ভব হত না। সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের ভাষা, সংস্কৃতি এসব ব্যাপারে ভুল বুঝিয়েছেন এদেশীয় মুসলমান অফিসার ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। আগে থাকতেই পশ্চিমা মুসলমানদের মনে বাঙালী মুসলমানদের সম্বন্ধে একটা নফরতের ভাব ছিল। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে

www.pathagar.com

যাদের সংশ্রবে তারা এসেছে তাদের অধিকাংশই শিক্ষায় সংস্কৃতিতে তাদের চেয়ে অনেক নীচু স্তরের ছিলেন। এর সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ অবশ্য ছিল, কিন্তু তাতে বাস্তবের কোন হেরফের হয়নি। এরপর পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের কেউ কেউ যখন নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদের বুঝালেন যে, বাংলা ভাষা ও এদেশীয় মুসলমানেরা হিন্দুর সাংস্কৃতিক প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তখন তারা একটা সৎ কাজ করছে এমন উৎসাহে আমাদের খাঁটি মুসলমানে পরিণত করার কাজে উঠে-পড়ে লেগে গেল। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর স্যার ফিরোজ খান নুন করাচীতে একবার ঘোষণা করলেন যে, এদেশের মুসলমানদের অনেকেই ছেলেপিলে হলে হিন্দুদের বাড়ী যেয়ে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সন্তানদের নামকরণ করে এবং অধিকাংশ ছেলেরই খতনা হয়নি। জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার তখনই করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্যার ফিরোজ খান নুনের উপরোক্ত অশোভন ও অসত্য উক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানেও ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহলে এর অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। আমি জানি যে, এ প্রতিক্রিয়ায় স্যার ফিরোজ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, এদেশীয় মুসলমানদের সম্বন্ধে এসব আজগুবি তথ্য তাকে জনৈক উচ্চপদস্থ স্থানীয় মুসলমান অফিসারই সরবরাহ করেছিলেন এবং পুরোপুরি সৎউদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। একথা ব্যক্তিগতভাবে তিনি অনেককে বলেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৯৪৮ সালে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার পর কায়েদে আজম যতদিন বেঁচে ছিলেন এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আর কোন মন্তব্য করেননি। প্রশ্নটি একরূপ ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। ছাত্ররা অবশ্য প্রতিবছর এগারই মার্চ 'ভাষা দিবস' হিসেবে পালন করছিল। কিন্তু কোন কথাবার্তা নেই, ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব হঠাৎ পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষণা করলেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। আমি ঐ ঘোষণার দিন সন্ধ্যাবেলায় দেখেছি জনাব নূরুল আমিনকে রীতিমত বিব্রত বোধ করতে। তখনই জেনেছিলাম জনৈক অতিউৎসাহী এদেশীয় সরকারী কর্মচারী নাজিমুদ্দীন সাহেবের ঐ ভাষণটি লিখে দিয়েছিলেন

www.pathagar.com

এবং তিনি সেটা আগে না পড়েই পল্টন ময়দানে পড়ে যান। ফলে একুশে ফেব্রুয়ারীর পটভূমি রচিত হয়ে যায়।

১৯৫৪-এর নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে ৩০০টি আসনেই যুক্তফ্রন্ট ও কংগ্রেস জয়ী হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই আদায় করার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের পরেই যুক্তফ্রন্টের ঐক্য ভেঙ্গে যায় এবং যখন যে দল ক্ষমতায় আসেন তখন তাঁরা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের একচেটিয়া অধিকারের দাবী করে প্রতিপক্ষকে 'ভারতের দালাল' আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রিয়ভাজন হওয়ার চেষ্টা করেন। জাতীয় ঐক্যের পরিবর্তে দেখলাম আওয়ামী লীগই ভেঙ্গে দু'টুকরা হয়ে ন্যাপের জন্ম হল। লজ্জা হলেও স্বীকার করতে হবে যে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানকে দাবিয়ে রাখার যে প্রচেষ্টা পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীরা ইস্কান্দার মীর্জা, গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রমুখ করছিলেন, সে প্রচেষ্টার সঙ্গে দলীয় স্বার্থে এদেশের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই সহযোগিতা করেছিলেন। এটা নির্মম ঐতিহাসিক সত্য।

ফজলুল হক সাহেবকে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে 'ভারতীয় দালাল' আখ্যা দিয়ে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হল তখন তেমন কোন বিক্ষোভ এ দেশে হতে দেখা যায়নি। বরং তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের মনে মনে খুশী হয়ে গোলাম মোহাম্মদ ও ইস্কান্দার মীর্জার সঙ্গে আঁতাত করার চেষ্টা করতে দেখেছি এবং পরে ঐ দুই মহাত্মার কৃপালাভের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে ন্যাক্কার জনক প্রতিযোগিতা চলতেই দেখা গেছে। এরপর যখন জনাব সোহরাওয়ার্দীকে ইস্কান্দার মীর্জা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন তখন তাঁর এদেশীয় প্রতিপক্ষকে উল্লসিত হতে দেখেছি। তারপর মার্শাল ল' যখন জারি করা হল তখন নেতৃবৃন্দের কাণ্ডকারখানায় এদেশের সাধারণ মানুষ তাকে অভিনন্দন জানায়। ৯২-ক ধারার শাসন ও মার্শাল ল' জারির পর কোনরূপ সাধারণ বিক্ষোভ দূরে থাকুক একটা সিনেমা হলও বন্ধ হতে কেউ দেখেনি।

আইয়ুব খাঁ পাকিস্তানের সর্বময় কর্তা হওয়ার পর বিভিন্ন দলকে দেখা গেছে তাঁর অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করতে। তিনি বেশ কিছুটা জনসমর্থন রাজনৈতিক দলগুলোর মাথার উপর দিয়েই যোগাড় করতে

www.pathagar.com

প্রথম দিকে পেরেছিলেন। অবশ্য পরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জনমত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দ্রুত সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৬৪ সালে মিস জিন্নাহ প্রেসিডেন্ট পদের জন্য আইয়ুব খাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলে সবগুলো বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় দেশের জনসাধারণের মনে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনী প্রথার বৈশিষ্ট্য ও 'কপ'এর কোন কোন নেতার আন্তরিকতার অভাবে মিস জিন্নাহ পূর্ব বাংলায়ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অল্পের জন্য পেলেন না। ঢাকায় আইয়ুবপন্থীদের সে সময়ে উদ্দাম-উল্লাস আমার এখনও চোখের সামনে ভাসছে। এর মধ্যেই 'কপ'এর ভাঙ্গনের লক্ষণ দেখা দিল। জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মত ছিল, যে পর্যন্ত দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয় সে পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলো পুনরুজ্জীবিত না করা। কারণ, এর ফলে আইয়ুবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ভেঙ্গে যেয়ে গণতন্ত্র সুদূরপরাহত হবে। ১৯৬৫-র নির্বাচনের পূর্বেই তিনি ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। কিছুদিন পরই বিভিন্ন দল পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং শুরু হয় পুরনো কোন্দলের খেলা।

আওয়ামী লীগের তরফ থেকে যখন ছয় দফা কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয় তখন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একাংশ এর প্রতি উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু এই সময়ে আইয়ুব খাঁ ঘোষণা করেন যে, ছয় দফার উত্তর অস্ত্রের দ্বারাই দেয়া হবে। তাঁর আত্মজীবনী Friends not Masters বইটিতে এদেশের মুসলমানদের নমশূদ্র বংশোদ্ভূত বলে মন্তব্য করায় এদেশের মানুষের মনে তীব্র বিক্ষোভের সূচনা হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন ছয় দফা দাবী উপলক্ষে ঢাকায় সামগ্রিক হরতালের সময়ে পুলিশের গুলীবর্ষণে সরকারী হিসেবেই এগারজন মারা যাওয়ায় জনমনে বিক্ষোভ আরও ঘনীভূত হয়। ছয় দফা ঘোষিত হওয়ার পরই পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে পূর্ব বাংলার প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সকল যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। এর পর 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বুমেরাং হিসেবেই কাজ করে। অর্থাৎ এদেশের মুসলমানের যে ভারত ও হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাবের ওপর ভরসা করে এ মামলার প্রকাশ্য বিচার শুরু করা হয়েছিল তাতে ঈপ্সিত ফল না হয়ে উল্টোই হল। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামীদের মুক্তির জন্য ১৯৬৯-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুবের ক্ষমতার মসনদ ভেঙ্গে পড়ে

www.pathagar.com

এবং ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসীন হয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতি-শ্রুতি দেন। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মনে আশা ছিল, আওয়ামী লীগের বিরোধী দলগুলো অন্ততঃ শতকরা চল্লিশটি আসন পাবে। কিন্তু একটি বাদে কেন্দ্রীয় পরিষদের সমস্ত আসনই দখল করে আওয়ামী লীগ। ছয় দফা দাবী উত্থাপনের সময়েই পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধানগণ এবং অন্যান্য কায়েমীস্বার্থ স্থির করেছিলেন যে, ছয় দফা কোন মতেই মেনে নেয়া যায় না, কারণ তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের এমন অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় যার জন্য তাঁরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এরচেয়ে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়াও শ্রেয়ঃ বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

একথা গোপন ব্যাপার নয় যে, আওয়ামী লীগের একাংশও ছয় দফা নিয়ে দর কষাকষি করে একটা আপোষরফা করে পাকিস্তানে থেকে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের তরুণ অংশের মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন পরিষ্কারভাবে তখন জেগে উঠেছে। ১৯৭১ সালের পয়লা মার্চ কেন্দ্রীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশন মুল-তবী করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলায় এক অভূতপূর্ব জজবার সৃষ্টি হয় এবং সরকারী শাসনযন্ত্রে অচলাবস্থা দেখা দিয়ে এক চূড়ান্ত সংকটের সৃষ্টি হয়। পঁচিশে মার্চ রাত্রে সংকট প্রত্যক্ষ মোকাবিলার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভয়াল এক 'শুদ্ধি অভিযান' শুরু করে। এর ফলও বিপরীতই হয়। ২৬শে মার্চ জেনারেল (তখন মেজর) জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা চট্টগ্রাম বেতারে ঘোষণা করেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট, পুলিশ, ইপিআর সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করে। তারপর কিভাবে ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়, সে ইতিহাসের বর্ণনার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, এ কাহিনী এখনও সকলের মনেই আছে। তবে একটা কথা বলা দরকার যে, সে সময়েও এক শ্রেণীর রাজনীতিক ভারতীয় সাহায্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সমর্থন করেননি। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের একাংশ চেয়েছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে একটা আপোষরফায় পৌঁছতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয় না। এসব পুরনো কাসুন্দি ঘাঁট-লাম এ জন্য যে, আমাদের মধ্যে সামগ্রিক ঐক্য পাকিস্তানী আমলে ছিল না; এমনকি ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েও যে ঐক্য দেখা গিয়েছিল তার মধ্যেও ফাঁক ছিল।

www.pathagar.com

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনসাধারণ আশা করেছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে নতুন করে গড়ার জন্য এবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু হবে। তাদের মানসিক প্রস্তুতিও ছিল সে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কিন্তু সব দল না হলেও অধিকাংশ দলের কার্যকরী ঐক্যের বদলে দেখা গেল আওয়ামী লীগের একাংশই বেরিয়ে গেল। যে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট করা হল সেটাও নামকা ওয়াস্তে রয়ে গেল। রাজনৈতিক দলগুলোর একে অপরকে দেশদ্রোহী, অমুকের দালাল, তমুকের দালাল বলা শুরু হয় স্বাধীনতার পর থেকেই অর্থাৎ সে পুরনো ট্র্যাডিশনের পুনরাবৃত্তি। তফাত এটুকু যে, এবার আর গলাবাজি বা হাতাহাতি নয়, রীতিমত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের মারাত্মক খেলা। কারণ, সরকার-সমর্থক ও বিরোধী দলগুলো সকলের হাতেই অস্ত্র ছিল। এর ফলে কত রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষের মৃত্যু হল তার কোন ইয়ত্তা নেই। শাসনযন্ত্রেও বিশৃংখলা ক্রমে চূড়ান্ত হয়ে উঠল। এসবের প্রতিক্রিয়া দেশের অর্থনৈতিক জীবনে সংকটের সৃষ্টি করল। তার-পর কিভাবে পরিস্থিতি ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে এবং বর্তমান নির্দলীয় সরকারের পত্তন হয় এসব ঘটনা এত টাটকা যে, তার বিবরণ দেয়া একেবারেই নিরর্থক। এ সরকার একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং রাজনীতির পুনঃ প্রবর্তনের পর অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপ শুরু হওয়ার পর নির্বাচনের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিদের হাতে তাঁরা ক্ষমতা অর্পণ করবেন।

মুখে অনেককেই রাজনীতি ও গণতন্ত্র ফিরে আসা ও নির্বাচনের কথা বলতে শোনা যায়। পর মুহূর্তে এঁরা বলেন যে, উপযুক্ত পরি-বেশ সৃষ্টি না হলে নির্বাচন হবে কি করে, তাঁরা বুঝেন না। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে, যেন-তেন প্রকারে একটা নির্বাচন করে সেই নির্বাচনে নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিলেই রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূরীকরণ সম্ভব হবে। অন্যরা তাড়াতাড়ি নির্বাচনের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। আসলে এমন কি একমনা রাজ-নৈতিক নেতাদের মধ্যেও কোন দৃঢ় ঐক্য এখনও গড়ে ওঠেনি। এত ব্যাপারের পরও আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন শিক্ষা হয়েছে বলে মনে হয় না। দেশের এই সঙ্কট সময়ে দলীয়, উপদলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠার শক্তি যদি আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর না থাকে, এখনও যদি পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ না হয় তার

www.pathagar.com

চাইতে দুঃখের ব্যাপার আর কি হতে পারে? এ অবস্থায় জন-সাধারণের শুভবুদ্ধি ও ঐক্যের অন্তর্নিহিত প্রেরণার ওপর আস্থা রেখে সকল সঙ্কট আমরা উত্তীর্ণ হতে পারবো এ আশা নিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া আর উপায় কি!

৫ মার্চ ১৯৭৬।

www.pathagar.com

১০

গত ১১ই এপ্রিল বড় আপা বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী গেল। দেখলাম, একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "শামসুন নাহার হল"-এ একটা যেন-তেন প্রকারের স্মৃতিসভা ভিন্ন দেশের মেয়েরা তাঁকে স্মরণ করেনি। ১৫ই এপ্রিল ছিল বড় ভাই জনাব হাবীবুল্লাহ বাহারের দশম মৃত্যুবার্ষিকী। নিছক আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীদের নিয়ে তাঁর শান্তিনগরের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত মিলাদে আমি স্বতঃবতঃই উপস্থিত ছিলাম। দেশের আর কোথাও কোন অনুষ্ঠান হয়েছে বলে আমার নজরে পড়েনি। কেবল 'সংবাদ'-এ পরলোকগত প্রফেসার শ্রী অজিত কুমার গুহের লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এমন কি তাঁর নামে শান্তিনগরে যে একটি কলেজ চলছে সেটাতেও একটি মামুলি সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। অথচ "জাতীয় ঐতিহ্য" সম্বন্ধে চারদিকের শোরগোলে কর্ণপটাহ বিদীর্ণ হওয়ার যোগাড়।

আমার পক্ষে এ মন্তব্যগুলো করা যে একান্ত অশোভন হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। ওয়াদুদ সাহেব ত বলেছেনই আমি একটু বেশী পরিবার-সচেতন। কিন্তু আমি নিরুপায়। এ দু'জনের আম্মাকে আমিও আম্মা ডাকতাম। কারণ, দু'বছর বয়সেই আমার মাতৃ-বিয়োগ হয় এবং এঁদের আম্মা, অর্থাৎ আমার বড় খালার হাতেই আমি মানুষ হই। আমার চরিত্রে এ দুই ভাই-বোনেরই প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশী। এঁদের দু'জনের মৃত্যুদিবসগুলো এভাবে একরূপ অলক্ষ্যে চলে যাওয়াতে আমি বিন্দমাত্র আশ্চর্য হইনি। আর যাই হোক, আমাদের মধ্যবিত্তের মনের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় আছে বলে আমার ধারণা। নানা বড় বড় কথার অন্তরালে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের বিপুল অংশের মন একান্তভাবেই কেবল নিজের হালুয়া-রুটি, দরবরা বৃদ্ধিতেই এত ব্যস্ত যে, অন্যদিকে একটু মনোযোগ দেয়ারই

www.pathagar.com

অবসর নেই---কথাটি অপ্রিয় হলেও একান্ত বাস্তব। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর "সিন্ধু হিন্দোল" বইটি এই ভাই-বোনকে উৎসর্গ করতে যেয়ে নজরুল লিখেছিলেন ঃ

"কে তোমাদের ভালো ?
'বাহার' আনো গুলশানে গুল
'নাহার' আনো আলো।
'বাহার' এলে মাটির রসে
ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
'নাহার' এলে রাত্রি চিরে
জ্যোতির অভিযান।"

আমৃত্যু এ দুই ভাই-বোনের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে থেকে উপলব্ধি করেছি যে, নজরুলের মন্তব্যগুলো সার্থক হয়েছিল এঁদের জীবনে। প্রায় তিন যুগ ধরে বাহার সাহেব সাহিত্য, রাজনীতি, খেলার মাঠে ও মজলিসী আড্ডায় বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের জীবনে 'সবুজ প্রাণের' প্রতীক ছিলেন। আর মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে মিলিতভাবে এবং তাঁর মৃত্যুর পর নিজে বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত মেয়েদের জন্য "রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান" পরিচালনা করে গেছেন তিন যুগেরও বেশীকাল যাবৎ বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ। এঁদেরই সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে আজ জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধমান হারে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা, পেতে শুরু করেছেন নিজেদের অধিকারের স্বীকৃতি। আর মশার কামড় খেলেই ঢাকার জনসাধারণ যাঁরা তারের জালি দিয়ে ঘেরা বাড়ীতে বাস করেন না, তাঁরা বাহার সাহেবকে স্মরণ করেন দেখতে পাই। সুতরাং এ দুই ভাই-বোনের স্মৃতি দিবস যথাযোগ্যভাবে পালিত না হলেও আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই।

আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠানের বিরোধী। কারণ, অনেক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে দেখেছি সেগুলোতে এমন সব কথা বলা হয় যাতে যাঁর উপলক্ষে সভা তাঁকে একরূপ বিদ্রূপই করা হয়। এটা যে ঘটবে তা বুঝতে পেরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর পর স্মৃতিসভা ডাকার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাঁর 'স্মরণ' কবিতায় লিখে গেছেন ঃ

www.pathagar.com

"যে আমি চাইনি কারে
ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার--
সে আমারে কে চিনেছে মর্ত-কায়ায় ?
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না, ডেকো না সভা,
এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।"

পূর্বসূরীদের যে এখনও সাধারণ মানুষ মাঝে মাঝে মনে করে, এটাই তাঁদের প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা নিবেদন। সুতরাং দুঃখ করার কিছুই নেই। এছাড়াও ইতিহাসের গতিপথ কত লোকের স্বেদে ও রক্তে পিচ্ছিল হওয়াতেই এর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে এবং যাদের নামও আমরা জানি না, তাদের স্মৃতি দিবস করে কে ?

মধ্যবিত্ত চরিত্র স্ববিরোধিতায় ভরা। আমিও মধ্যবিত্ত সন্তান। সুতরাং আমার কথায়-কাজেও স্ববিরোধিতা যথেষ্ট পরিমাণেই হাজির রয়েছে। স্মৃতিসভা, স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে দার্শনিকসুলভ ঔদাসীন্য থাকলেও বড় ভাইয়ের মৃত্যুবার্ষিকীর সময়েই স্থির করেছিলাম তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে কিছু একটা করার জন্য উদ্যোগী হতে তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু বর্তমানে রাষ্ট্রপতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসার আবুল ফজল সাহেবকে অনুরোধ করব। এর দু' তিন দিন পরে তাঁকে টেলিফোন করে পি, এ'র কাছে নিজের নাম বললাম। কয়েক সেকেণ্ড পরে ভারী গলায় আওয়াজ ভেসে এল, "হ্যাঁ, বলুন"। আমি রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, "আপনি আমাকে আপনি বলছেন ফজল ভাই ?" একেবারে গালে সজোরে চপেটাঘাত পেলাম। "তুমি ক'বছর পরে আমার খোঁজ করছ বলত ? তোমাকে আপনি বলবনা ত কি বলব ?" তিরস্কারটার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কিছু বলার কোন উপায় নেই। ছেলেবেলা থেকে তাঁর সঙ্গে যে নিবিড় পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ তাতে এ তিরস্কার আমার নিঃসন্দেহে প্রাপ্য। কিন্তু গত আট বছর যাবৎই আমি সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক কমিয়ে আনতে আনতে প্রায় শূন্যে এনে ফেলেছি। শরীরের ও কিছুটা মনের অবস্থা এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। সুতরাং বিনা দ্বিধায় ফজল ভাইয়ের কাছে মাফ্ চেয়ে নিলাম। যে অল্প কয়-

www.pathagar.com

জন বুদ্ধিজীবী সম্বন্ধে এখনও শ্রদ্ধা রাখি তিনি তাঁর একজন। তিনি যে কথাই বলেন বা লেখেন তা নির্ভীকভাবেই বলেন ও লেখেন এবং এগুলোর পেছনে কোন প্রকার স্বার্থের বিন্দুমাত্র তাগিদ আছে বলে মনে করার কোন কারণ কখনও ঘটেনি। দূর থেকে তাঁকে শ্রদ্ধাই করে এসেছি। বিনা সঙ্কোচে বড় ভাইয়ের ও অন্য দুটো বিষয়ের উল্লেখ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলাম ও সম্মতি পেলাম।

এর পর একটু সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার লেখা আপনি পড়েন ?" "সময় পেলে মাঝে মাঝে পড়ি।" "কেমন হচ্ছে ?" "লেখা যেমনই হোক, এর শিরোনামটা আমার পছন্দ নয়। 'দরবার'ত রাজা-বাদশাদের ব্যাপার এবং এটা আমি আহমদুল কবিরকে বলেছি।"

একেবারে চুপসে গেলাম। তবু ভয়ে ভয়ে বললাম, 'দরবার' কথাটা রাজা-বাদশাদের কাছ থেকে এসেছে ঠিক, কিন্তু সাধারণ লোককেও দরবারী, মজলিসী বলা হয়। আমার ইচ্ছা ছিল মজলিস বা বৈঠক ব্যবহার করি, কিন্তু আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শেষ পর্যন্ত 'দরবার' শব্দটা পছন্দ করাতেই এটা দেয়া হয়েছে। এখন নামটা ত প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া আমার আবার 'দরবার'! এর একটা বিদ্রূপাত্মক আবেদন আছে, যেটা আমারও মন্দ লাগে না।"

"আচ্ছা একদিন টেলিফোন করে এসো" বলে আবুল ফজল সাহেব রেখে দিলেন। তাঁর কথাগুলো কিন্তু ক'দিন ধরে আমাকে একটু বিচলিত রেখেছে। তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জানি তাতে তাঁর আপত্তিটা যে কেবল 'দরবার' শব্দটির অপপ্রয়োগে নয়, সে সম্বন্ধে আমি প্রায় নিশ্চিত। 'দরবার-ই-জহর' এই পুরো শিরোনামায় তিনি যে অহম-ভাবের প্রকাশ অনুভব করেছেন সেটাই তাঁর মনে লেগেছে। হায়রে আল্লাহ! অহমভাবই যে এদেশের সকল দুর্গতির মূল কারণ বলে আমি এতদিন যাবৎ কলম ও তার চেয়ে বেশী জিহবা পরিচালনা নিরলসভাবেই করে এসেছি, শেষ পর্যন্ত বন্ধুবর ওয়াদুদ সাহেবের সলায় পড়ে আমার কপালেই এ অপবাদ জুটল। বন্ধু-বান্ধব অবশ্য 'দরবার-ই-জহর' শিরোনামাটা বিদ্রূপাত্মক অর্থেই নিয়েছেন। ইচ্ছা ছিল এ কলামটিতে প্রধানতঃ সকলকে এবং সবকিছুকে বিদ্রূপই করে যাব। এ ব্যাপারে যে আমি বেশ একটু পটু আমার জানাশোনা সক-লেই অতীতের আমি সম্বন্ধে বিনা দ্বিধায় এ প্রশংসা বা নিন্দাপত্র দিবেন। কিন্তু এখন রীমা সীমাকে একটু বিদ্রূপ করলে তারাও খামচে দিতে

www.pathagar.com

কিম্বা কেঁদে ফেলতে পারে। নিজেকে অবশ্য কিছুটা নির্বিবাদে বিদ্রূপ করা যায়। কিন্তু সেখানে ঐ অহমভাবটাই বাদ সাধে। বন্ধু-বান্ধবের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আবুল ফজল সাহেব মুরুব্বী লোক। তাঁর কথাগুলো সত্যিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তবে আমার এটুকু ঝুটা কৈফিয়ত আছে যে, নিজের নামে ও ছবি ছাপিয়ে লেখার রেওয়াজ পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। এতে পুরো পাপক্ষালন না হলেও পাপীর সংখ্যা অনেক জেনে মনে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যায়। তবে অহমভাবের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে আমি অতি সচেতন। এতদসত্ত্বেও আমার লেখায় মধ্যবিত্তসুলভ অহমভাবের যদি প্রকাশ হয় তবে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, পাঠকগণ নিজ গুণে আমার ত্রুটি মার্জনা করবেন এবং শুধু তাই নয়, আবুল ফজল ভাইয়ের ন্যায় আমাকে তিরস্কার করবেন, অবশ্য চিঠি লিখে, টেলিফোনে নয়। শিরোনামাটা দিয়ে ফেলেছি, এখন কি আর করি?

আমি যেকোন হলফ করে বলতে পারি যে অহমভাবকে আমি যতটা ঘৃণা করি আর কিছুকেই ততটা নয়। পূর্বেই বলেছি অহমভাবই আমাদের সকল সর্বনাশের মূল কারণ বলে আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি। বাল্যে মুরুব্বীদের বলতে শুনেছি, "হাদীসে ও কোরআন শরীফে বার বার উল্লেখ রয়েছে খোদা অহঙ্কারীকে ভীষণ নাপছন্দ করেন।" বাংলাতেও একটা প্রবাদ শৈশবেই শুনেছি 'অতি দর্পে হত লঙ্কা'। কথাগুলো তখনই মনে গেঁথে গেছে। সে যুগটাই ছিল ভিন্ন। অহঙ্কারী লোক তখন সমাজে নিন্দিত ছিল, আর বিনয় ছিল আসল শরাফতের লক্ষণ। অহংকারী লোকের ছায়া পারতপক্ষে কেউ মাড়াত না। বড় আপা বেগম শামসুন নাহারের জন্য বাংলাদেশের এক বিখ্যাত জমিদার পরিবার থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। কিন্তু নানী-খালারা রাজী হলেন না। কারণ, জমিদার পরিবারের ছেলেরা সাধারণতঃ অহংকারী, বিলাসী, মদ্যাসক্ত ও চরিত্রহীন হয়। তাঁরা বড় আপার বিয়ে দিলেন নেহাত মধ্যবিত্ত এক মৌলবী পরিবারের ছেলে ডাক্তার ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে। তাঁদের নির্বাচন ভুল হয়নি। বেগম শামসুন নাহার যতটুকু খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা সম্ভব হত না ডাঃ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের উৎসাহ ও সহযোগিতা না পেলে। অথচ তাঁর কথা কয়জনে জানে।

৫—

www.pathagar.com

নিরেট ভাল মানুষ, ভাল লেখাপড়া করা নিরহঙ্কার আমার দুলাভাইকে আমি বড় আপার চেয়েও মানুষ হিসেবে বেশী শ্রদ্ধা করতাম। বাল্যের উপরোক্ত শিক্ষার পর কৈশোরে বার্নার্ড শ'র "The Man of Destiny" (বাংলা করতে পারলাম না) বইটিতে নেপোলিয়ানের মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা, অর্থাৎ ডিক্‌টেটর হওয়ার চেষ্টার একেবারে মর্মভেদ করা কাহিনী পড়ে নাক-কান মলে প্রতিজ্ঞা করি জীবনে আর যাই করি হাম-বড়ামি করব না। প্রতিজ্ঞাটি পুরোপুরি রাখতে পারিনি বলেই মাঝে মাঝে বিপদে ফেলে খোদা আমাকে সাবধান করেছেন বলে বিশ্বাস করি। এখন এই 'দরবার-ই-জহর' শুরু করে যদি অহম-ভাবের পরিচয় দিয়ে থাকি, রহমানুর রহিম খোদা যেন মাফ করেন। এটার দ্বারা কারও, দেশের ত নয়ই, কোন উপকার হবে এ বিশ্বাসে লেখাটা শুরু করিনি। করেছি নেহাত জীবিকার প্রয়োজনে। দেশটার কেউ কিছু করতে পারবে না, এর ভার আল্লাহ্‌র হাতে, এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অবশ্য আল্লাহ্ আবার মানুষকে নিজ ভাগ্য গড়ার চেষ্টা করার অধিকার দিয়েছেন।

যুগটা কি রকম বদলে গিয়েছে। আগে শ'য়ে হাজারে দু'চার-জন অহঙ্কারী লোক দেখতে পাওয়া যেত। গত ত্রিশ বছরে গোটা দেশটাই অহঙ্কারে অহঙ্কারময় হয়ে গেছে। অবশ্য দেশটা বলতে আমি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তকেই বোঝাচ্ছি। কারণ, বিত্তহীন ও নিম্ন-বিত্তের লোকদের জীবিকার তাড়নায় অহঙ্কার প্রদর্শনের সুযোগ ও অবসর কই? তাদের মনে যেদিন নিজেদের সত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা আসবে সেদিনই দেশের সকল সমস্যার সমাধান সুগম হবে। কিন্তু চারপাশের লোকের অহঙ্কারের যন্ত্রণাই ঘর থেকে বার না হওয়ার অন্যতম কারণ। বিত্তের, ক্ষমতার, বিদ্যার, বুদ্ধির, ধার্মিকতার, গণতান্ত্রিকতার, বিপ্লবিতার, দেশপ্রেমের, সমাজতান্ত্রিকতার—কত রকমের অহমবোধের কত বিচিত্র ও ভয়াল খেলাই না গত ত্রিশ বছরে কেবল আমি নয়, সারাদেশের মানুষ দেখল। এসব খেলার ফলে সাধারণ মানুষের জীবন কতবার বিপর্যস্ত হয়ে চুরমার না হয়ে গেল! এ খেলা বন্ধ হোক, 'আমি কি হনুরে' এ মানসিকতা থেকে দেশ মুক্ত হোক, খোদার দরগাহে সাড়ে সাত কোটি মানুষের এটাই যে আরজ সে সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

আমার নিজের সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তব্য এই,

"আমার মৃত্যুর দিনে কৌতূহলী প্রশ্ন করে যদি--
সাধিলাম কি সুকৃতি, হব যার প্রসাদে অমর ?
মেনে নিও মুক্ত কণ্ঠে, নেই মোর পাপের অবধি,
সারা ইতিহাস খুঁজে মিলিবে না হেন স্বার্থপর ॥

- - - - - - - - - - - - - -

আমার মৃত্যুর দিনে তাই যদি অলস জিজ্ঞাসু
মাগে শব পরিচিতি, বিনা ভাষ্যে বোলো তারে সখা,
জগতের কোন কাজে লাগেনি এ-অখ্যাত গতাসু
যায়নি অনাথ করে কোন মৌন হৃদয়-অলকা ॥"

দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে দেশবাসীর ঐহিক পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য জীবন যৌবন উৎসর্গ অতীতে অনেকে করেছেন এবং এখনও করছেন। আমি তাঁদের সমীহ করি। আমি নিজে এখন নির্বাণের সাধনার সারমর্ম উপলব্ধির চেষ্টায় লিপ্ত।

৩০ এপ্রিল ১৯৭৬।

www.pathagar.com

১১

দিন তারিখ মনে নেই, তবে এক যুগের কম হবে না। দুপুর প্রায় আড়াইটার সময় চারু-কারু মহাবিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে মিন্টো রোডের দিকে যাচ্ছি। ডাক শুনলাম, 'এই জহর সাহেব।' দেখি, আবেদীন ভাই গেটে দাঁড়িয়ে আমাকে হাত নেড়ে ডাকছেন। থামতে হল এবং গাড়ী থেকে নেমে তাঁর সামনে হাজির হতে হলো। "আপনি ত আচ্ছা লোক। এ জিনিসটা এত কষ্ট করে দাঁড় করালাম আর আপনি একদিন দেখতেও আসলেন না, আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে গল্প করার সময় আপনার মত ব্যস্ত লোকের নেই, সেটা না হয় বুঝলাম।"

একেবারে জুতোর বাড়ি খেলাম, তবু পাল্টা আক্রমণ করলাম, "এ রকম বিল্ডিং অনেক জায়গায় ঢের ঢের দেখেছি, ঢাকার মতি-ঝিলেই ত দেখছি প্রায় মাসেই কিম্ভূতকিমাকার বিরাট আকারের বিল্ডিং একটা না একটা দণ্ডায়মান হয়ে আমাদের পুঁজিগঠনে তর-ক্কির সাক্ষী দিচ্ছে। সুতরাং এ বিল্ডিংটা এমনকি দেখার বস্তু হল। আর আপনার সঙ্গে আড্ডা মারার সময় আমার যথেষ্টই আছে।"

"তবে আসেন না কেন?"

"আপনি ত জানেন, রাগ করে। আমি কলকাতায় যে জয়নুল আবেদীনকে জানতাম, যাঁর মধ্যে এক সীমাহীন সম্ভাবনার কথা শিল্প রসিক লোকজনের মুখে মুখে উচ্চারিত হত, সে জয়নুল আবে-দীন ত পাকিস্তান হওয়ার পর সে সম্ভাবনা থেকে দূরে সরে গেছেন। আপনি ত এখন প্রিন্সিপাল জয়নুল আবেদীন, আর্টিস্ট জয়নুল আবে-দীন নন। অর্থাৎ একজন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার হিসাবে আপনি এখন ত ফাইলবাজি করেন, ছবি ত আর নেশাগ্রস্ত লোকের মত আঁকেন না, যেভাবে আঁকতে দেখেছিলাম কলকাতার পার্ক

www.pathagar.com

সার্কাসের সার্কাস রোডে সেই আট ফুটের মত চওড়া আর চৌদ্দ ফুটের চেয়েও কম লম্বা ঘরটিতে"।

আবেদীন ভাইয়ের হাসিমাখা মুখটা সেকেণ্ডের জন্য ম্লান হয়ে আবার তাঁর প্রাণমাতানো সরল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "বটে! আসুন আমার সঙ্গে। আমি এখনই আপনাকে দেখাব কেবল একটা বিল্ডিং তৈরী করেছি না আরও কিছু আছে এর মধ্যে। আর আপনার পুরনো গোস্‌সাটাও দূর করার চেষ্টা করব।"

"ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ, পথে একটা বাড়ীতে পাঁচ মিনিটের জন্য থেমে বাড়ী ফিরে আজ পেটটা ঠাণ্ডা করতে দিন। আর একদিন আসব।"

"তা হবে না। আপনাকে আমি চা-নাস্তা খাওয়াব। অবেলায় আজ ত আপনি আর প্রথম খাবেন না। এটুকু সহ্য করতে পারবেন না? আপনি ত জানেন, এক সময় আমার দিনের পর দিন খাবার জোটেনি। আজ আপনাকে ছাড়ছি না"।—বলে আমাকে এক রকম হিড় হিড় করে টেনে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ঘুরে ঘুরে তাঁর প্রতিষ্ঠানটির সব বিভাগ আমাকে দেখালেন। সামনের ও পাশের লনে, গাছতলায় ছেলেমেয়েরা ইজেল পেতে আঁকছে। সবই দেখালেন। দু'চারজন বিদেশিনীকেও দেখলাম। চিত্রাঙ্কন এমন কিছু অর্থকরী বিদ্যা নয়। অধিকাংশ আর্টিস্টকেই দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়, সব দেশের ব্যাপারেই একথাটি সত্য। আমাদের দেশে বিত্তের আকাঙ্ক্ষাটা তখনও মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে উদগ্রভাবেই বর্তমান ছিল। সুতরাং আমাদের এতগুলো ছেলেমেয়ে অধিকতর অর্থকরী পেশার পশ্চাদ্ধাবন না করে চিত্রাঙ্কনের দিকে ঝুঁকেছে দেখে খুবই ভাল লাগল।

দোতলায় তাঁর কামরায় প্রবেশ করেই বললেন, "এই যে দেখলেন, এগুলো কি সম্ভব হোত যদি আমি নিজেই ছবি আঁকার নেশা নিয়ে পড়ে থাকতাম? আপনি আমার কাছে কয়েকবারই অভিযোগ করেছেন, আমি এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লাইনে আসায় আমার শিল্পী-জীবনের ক্ষতি হয়েছে, দেশকে আমি বঞ্চিত করেছি। যে-কোন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীই একমাত্র আঁকার নেশাতেই মশগুল থাকেন, অন্য কোন দিকে মন দেয়ার সময় তাঁদের হয় না। এ সবই সত্যি। কিন্তু আপনি ত জানেন, আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থা চিত্রাঙ্কন

www.pathagar.com

শিল্পের বিকাশের কত প্রতিকূল। এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে আমাকে কত লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। আমি চাই চিত্রাঙ্কন শিল্পটি একটি আন্দোলনের আকারে গড়ে উঠুক। আমার দেশ এ ব্যাপারে দুনিয়ার শিল্পজীবনে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারুক। এতে আমার নিজের ক্ষতি যা হচ্ছে, তা খুশীমনেই আমি মেনে নিয়েছি। তবে আমি আমার কাজ অনেকটা সেরে এনেছি। আপনাকে ধরে নিয়ে আসলাম এ বিল্ডিং দেখাতে নয়, যে ছেলেমেয়েগুলোকে আপনি দেখলেন তাদেরই দেখাতে। কে জানে এদের মধ্য থেকেই একদিন ভ্যান গগ্, মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর মত আর্টিস্ট জন্মাবে না। আপনি ত জানেন পরিবেশ এদের প্রতিভার স্ফুরণে কতটা সাহায্য করেছিল।"

"ব্যক্তিগত প্রতিভা পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠেই তার স্বাক্ষর রাখে", আমার একথার জবাবে তিনি উত্তর দিলেন, "কদাচিৎ। এ অনেকটা দৈবের ওপর নির্ভর করে থাকার মত। দেশের মানুষকে সাধারণ-ভাবে শিল্প-সচেতন করে তুললেই প্রতিভার অন্ততঃ নিম্নতম স্ফুরণ সুযোগ পায়, সহজ হয়।"

"তার জন্য প্রয়োজন সামাজিক পরিবেশে আমূল, বৈপ্লবিক পরি-বর্তন।"

"ঐ ত আছে আপনাদের রাজনীতিমনা মানুষদের এক বাঁধা বুলি। যতদিন সে পরিবর্তন না হয় ততদিন কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব? আর আমি সমাজের সে পরিবর্তনের সংগ্রামে আছি আমার ভাবে। এই আর্ট স্কুলটিকে গড়ে তোলাও সে সংগ্রামের অংশ বলে মনে করি।"

এরমধ্যে চা, বিস্কুট এসে গেল। আবেদীন ভাই বলে চললেন, "আপনাকে আমি ত কতবার বলেছি, আমি তাজমহলের ছবি, মোগল মহিষীদের ছবি আঁকি না, কারণ তারা এবং সে সমাজের আধুনিক সংস্করণ আমার মাথায়, মনে নেই। আমি কারও "কোর্ট পেইন্টার" নই। জানেন কোন বড়লোক আমাকে বলেছিলেন, তাঁর ছবিতে নাম লিখে দেওয়ার জন্য, যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেবেন। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় আসার পর দেখি আমার কোন চাকরি হচ্ছে না। শিক্ষা ডাইরেক্টরেটের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি হাইস্কুলের ছাত্রদের ড্রইং শেখাতে পারব কিনা। এ সবই ত আপনাকে আমি তখনই বলেছি। (এ, ডি, পি, আই ভদ্র-

www.pathagar.com

লোক আমারই জেলার লোক ছিলেন। তিনি এমনিতে অতি সজ্জন লোক ছিলেন। বেশ কিছুদিন হয় মারা গেছেন।) আজ দেশের অবস্থা অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। এর জন্য আমাকে অনেক ধরনের সরকারী কর্তাদের কাছে ধরনা দিতে হয়েছে। এ বিড়ম্বনায় আমার কোন খেদ বা অপরাধবোধ নেই, কারণ এটা আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য করিনি। আমার সহকর্মীরাও অনেকে আমাকে ভুল বুঝেছেন, এখনও তাঁদের অনেকের মনে আমার সম্বন্ধে ক্ষোভ যে আছে তা আমি জানি। কিন্তু আমি কি করব? যাক, আমি শিগগিরই ঝামেলা আরও কমিয়ে ফেলে, সম্ভব হলে একেবারে মিটিয়ে দিয়ে নিজের কাজ শুরু করব। আপনি জানেন না, এতসব কাজের মধ্যেও আমি ছবি আঁকা একেবারে ছেড়ে দিইনি। আমার বাড়ীতে একদিন আসেন, আপনাকে দেখাব। আমি পূর্ব বাংলার পচা পুকুর, ডোবা, কৃষকের ঝড়ে উড়ে-যাওয়া কুঁড়েঘর, তারই জীবন সংগ্রামের, তারই সুখ, দুঃখ, প্রেমের পটুয়া। দেখি এদের জীবনের ছবি আমার তুলিতে আরও ভাল করে ধরতে পারি কিনা।"

জয়নুল আবেদীন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ঘোষণা, আদর্শের (Credo) যেভাবে ঘোষণা করলেন, তাতে আমার আর কিছু বলার রইল না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কমলিকে ছাড়তে রাজী হলেও কমলি তাঁকে ছাড়ল না। শেষের ক'বছর সোনারগাঁয়ে লোকশিল্পের যাদুঘর প্রতিষ্ঠার নেশাটা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এদেশের লোকসংস্কৃতির যে চিহ্নগুলো দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে সংগৃহীত করে বাঁচাবার ব্যবস্থা না করলে সামগ্রিকভাবেই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন সুস্থ হবে না, সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে না।

আবেদীন ভাইয়ের সঙ্গে কবে এবং কোথায় যে আমার প্রথম দেখা হয়, মনে নেই। খুব সম্ভব কলকাতায় 'আজাদ' অফিসে কিম্বা ২৩ নং ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রীটে আমাদের বাসায়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার আসল পরিচয় হয় যে ঘরটির বর্ণনা উপরে দিয়েছি সে ঘরেই। পার্ক সার্কাস পাড়াতেই আমার আড্ডার কেন্দ্রভূমি ছিল। ওদিক দিয়ে যাওয়ার সময় প্রায়ই তাঁর কুঠরিতে ঢুঁ মারতাম। তখন তিনি ১৯৪৩-এর মন্বন্তরকে তাঁর তুলিতে ধরার চেষ্টা করছেন। কঙ্কাল-

www.pathagar.com

সার মৃত মা ও তার জীবন্ত শিশু, মৃতদেহ আর কাক এসব ছবিই তখন তিনি তাঁর তুলির দু'চারটি বলিষ্ঠ টানে ফুটিয়ে তুলছেন। সে দুর্ভিক্ষে সরকারী হিসেবেই বাংলার চল্লিশ লাখ লোক মারা গিয়েছিল। সব সরকারের ন্যায় তদানীন্তন সরকারও এ অকল্পনীয় ট্রাজেডীকে দুনিয়ার সামনে ধামাচাপা দেওয়ার অন্ততঃ খাটো করে দেখাবার চেষ্টাই করেছিলেন।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, জাপানীরা সীমান্তে। ব্ল্যাক আউটের রাতে ওয়েলেসলি স্ট্রীটে ট্রাম ধরতে যাওয়ার সময় মৃতদেহে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। একদিন শুনলাম, কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে জয়নুল আবেদীনের চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি'র উদ্যোগে। চিত্রকলা সম্বন্ধে আমি একেবারে আনপড়্। তবু গেলাম। সেদিনের অভিজ্ঞতা ভুলতে পারব না। মনে হল একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে গিয়ে পড়েছি। অথচ প্রত্যহ আমাদের চোখের সামনেই একের পর এক হাজারে হাজার প্রেতের মত লোকগুলো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল। জয়নুল আবেদীনের তুলিই ট্রাজেডীর আসল ও বিশাল রূপটা সেদিন আমার চোখের সামনে প্রথম তুলে ধরেছিল।

এ সময়েই দেখলাম "জনযুদ্ধে" এগুলো ছাপা হচ্ছে। এরই কিছুদিন পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের দৌহিত্রী এলা রীড (রীড সাহেব সে সময়ে স্টেটসম্যান পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন) জয়নুল আবেদীনের চিত্রকলা সম্পর্কে স্টেটসম্যান পত্রিকায় সচিত্র প্রবন্ধের সিরিজ লিখতে শুরু করেন। বাস। এতে যে জয়নুল আবেদীন দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এটা বড় কথা নয়, বাংলার লাখ লাখ কৃষক সন্তানের মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে করুণ মৃত্যুর কাহিনী সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বাংলা সরকারের মাথা হেঁট করল। তুলি রূপান্তরিত হল মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামী জনতার বর্শার ফলকে। স্টেটসম্যান পত্রিকা তখন পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি সংবাদপত্রের একটি বলে পরিগণিত হত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় জয়নুল ভাইয়ের দুর্ভিক্ষের ছবি পুনর্মুদ্রিত হল। কারা জানি তাঁকে আখ্যা দিল People's artist (জনগণের চিত্রশিল্পী)। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ নামের মর্যাদা রাখার চেষ্টা তিনি করে গেছেন।

তিনি মারা যাওয়ার সপ্তাহখানেক আগে একদিন দুপুরবেলায়

www.pathagar.com

বন্ধুবর সাইয়ীদ আতিকুল্লাহ আমার ছোট ঘরটিতে প্রবেশ করা মাত্র বুঝলাম কিছু একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে। আগের দিন রাতেই তাঁর আমার এখানে আসার কথা ছিল। তিনি না আসাতে মনটা চঞ্চল ছিল। ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, "রাতে আসতে পারিনি, কারণ আবেদীন ভাই যেকোন মুহূর্তে মারা যেতে পারেন। তাঁর কষ্ট আর দেখা যায় না।" পাথর হয়ে গেলাম। পরে কথায় কথায় তিনি বললেন, "ভাল মানুষ হলে, অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তিটা একটু বেশী পরিমাণে থাকলে আর তার সামাজিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলে শিল্পীর প্রাথমিক দায়িত্বে ব্যাঘাত ঘটে। আবেদীন ভাইয়ের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। অন্যের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়তেন, দেশের কল্যাণের চিন্তাও তাঁর মাথায় সব সময়েই ছিল। শিল্পীকে থাকতে হয় একা নিজের কাজের নেশায় মেতে। প্রয়োজন হলে হতে হয় অমানুষ। আবেদীন ভাই তা পারেননি। এর মূল্য শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁকে দিতে হয়েছে এবং তিনি তা খুশীমনেই দিয়েছেন।" আশ্চর্যও হলাম চিন্তার একই খাত দেখে।

আবেদীন ভাই মহৎ শিল্পী ছিলেন। মানুষ হিসেবে তিনি মহত্তর। তাঁর হৃদয় এদেশের জনতার হৃদয়ের সঙ্গে একই তালে স্পন্দিত হয়েছে। আবার বলছি, চিত্রকলার আগামাথা আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তবু আমি সাহস করে বলব, তাঁকে যদি আমাদের পিকাসো বলি তবে বোধহয় বেশী বলা হয় না। পিকাসোও সমাজসচেতন শিল্পী ছিলেন। কিন্তু জনতার জন্য এতখানি প্রত্যক্ষ দরদের অনুভূতি তাঁর ছিল কিনা আমি জানি না।

আবেদীন ভাইয়ের বিদেহী আত্মা শান্তি লাভ করুক। আল্লাহ্ তাঁর রুহকে মাগফেরাত দান করুন।

৪ জুন ১৯৭৬।

www.pathagar.com

১২

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্‌টোবর রাতের শো'তে 'মুকুল' হলে 'সাহেব বিবি গোলাম' দেখে আজিমপুরের ৬৪-ই ফ্লাটে বাসায় ফিরেছি। বইটি অত্যধিক দীর্ঘ। হলের ভিতর গরমে ও ছারপোকার কামড়ে বইটি উপভোগ করতে অসুবিধা হয়েছে। তাছাড়া বইটি যত ভাল লেগেছিল, ছবিটি তত লাগেনি। সুতরাং মনটা প্রসন্ন ছিল না। নামমাত্র সামান্য কিছু একটা খেয়ে, তেমন কোন খবর আছে কি-না ফোনে অফিসে জিজ্ঞাসা করে, কানের দু' পাশে ভিজে আঙ্গুল বুলিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে চোখটা কেবল লেগে এসেছে এমন সময়ে বসার ঘরে ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল। রীতিমত বিরক্তভাবে উঠে গিয়ে টেলিফোনটা কানে লাগাতেই শুনলাম, "চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর, মোওওর। হ্যালো।" কবিবর হাবিবরের গলা। কবি হাবীবুর রহমানকে আমি 'কবিবর হাবিবর' বলেই ডাকতাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, "এত রাত্রে কবিতা শোনাবার জন্যেই টেলি-ফোন করেছেন নাকি? তাছাড়া এ ত আপনার কবিতা নয়, এ গলাটা ত বহু পুরোন এবং এ লাইনটা ত গোঁফ ওঠার পর থেকে এযাবৎ লাখোবার মনে মনে আওড়েছি।" একটা মৃদু হাসির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, "না জহুর ভাই, গান শোনাবার জন্য এত রাত্রে আপনাকে টেলিফোন করিনি, হয়ে গেছে।" "কি আবার হল? একটু আগেই ত ফোন করেছিলাম।" "খবর এই এল, হয়ে গেছে।" "কি হলো? ৯২/ক ধারা?" "না"। "ইমারজেন্সি?" "না"। "মার্শাল ল'?" "হ্যাঁ"।

নিঃসাড় হয়ে গেলাম। কিন্তু প্রথমেই মনে হল, কি অদ্ভুত লোক। দেশে মার্শাল ল' জারির খবর দিচ্ছে কিনা নিছক প্রেমের গানের লাইন আওড়ে! লাফ দিয়ে ওঠা হৃদয়টাতে ঠাণ্ডা প্রলেপ দেয়া হল—এ জাতকে কোন আইন দিয়ে কিছু করা যাবে না, যদি

www.pathagar.com

কিছু করা যায় তবে তা হবে প্রেম-ভালবাসা দিয়ে। চুপ করে আছি। আবার আওয়াজ ভেসে এল, "জহুর ভাই, আপনি অফিসে আসবেন না?" "আমি অফিসে এসে আর কি করব? তাছাড়া এত রাত্রে রিকশা পাব না।" "সে কি, সব গোলমেলে সময়ে ত আপনি অফিসে হাজির থাকেন।" "এ ত কোন গোলমেলে ব্যাপার নয়। এখনি সব রেগুলেশন একের পর এক আসতে শুরু করবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাপটেন কাসেম হাজির হবে, কিংবা টেলিফোনে নির্দেশ দেবে। সেগুলো পালন করে যাবেন অক্ষরে অক্ষরে। ভিতরের পাতাও দেখে নেবেন ভাল করে, কোন রেগুলেশন বিরোধী ছোট্ট খবর থাকলে পাতাটাই ফেলে দেবেন। আমি আর রাত্রে আসছি না। মাথা ঠাণ্ডা করে একটু চিন্তা করি। আপনার ওপর নির্ভর করছি, দেখবেন, যেন ঝামেলায় না পড়ি।" ফোনটা রেখে দিয়ে গালে হাত দিয়ে চেয়ারে বসে রইলাম। কানে তখনও বাজছে, "চলে নীল শাড়ী----।"

মার্শাল ল'কে প্রেমের গানের কলির মারফতে ঘোষণা করার মত প্রাণশক্তির অধিকারী যে কবি ছিলেন, তাঁর কণ্ঠ চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। কবি হাবীবুর রহমানকে আমি চিনতাম কলকাতার 'আজাদ'-এর জমানা থেকে; ঘনিষ্ঠতা হয় 'সংবাদ'-এ। খবরের কাগজগুলো সে যুগে ছিল একান্তভাবে রাজনীতির আখড়া। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে কোন উৎসাহ দেখাতে তাঁকে কোনদিন দেখিনি। রাজনৈতিক আলোচনার ঝড় যখন বয়ে যাচ্ছে, তখনও তাঁকে দেখেছি সে আলোচনায় যোগ না দিয়ে অনুবাদ করে যেতে, 'খেলাঘরের' লেখা সাজাতে, কিংবা 'সনেট' লেখায় ব্যস্ত থাকতে। কেউ মারা গেলে কিংবা কোন বিশেষ দিবস উপলক্ষেই তাঁর ওপর ফরমাশ হত একটা কবিতা লিখে দিতে, আর অমনি তিনি কলম-কাগজ নিয়ে বসে যেতেন। জীবনে যে এক লাইন কবিতা লিখতে পারেনি তাঁর কাছে অবাক লাগত। নিজের প্রাণশক্তিটা তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন খেলাঘরের ছেলেমেয়েদের সংগঠিত করা, তাদের সুন্দর সার্থক জীবনের সন্ধান দেয়ার ব্যাপারে।

১৯৫৮ কি '৫৯ সালে একবার কবিবর হাবিবর আমাকে বলেন, "ভাবী ত বিদেশে। খেলাঘরের অনুষ্ঠান হবে বৃটিশ কাউন্সিল হলে। আপনার বসার ঘরটা দেননা দিন দশেকের জন্য। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত রিহার্সেলের জন্যে। না ভেবেচিন্তেই রাজী

www.pathagar.com

হই। সে সময়ে সন্ধ্যা ছ'টা-সাতটার সময় আমি আবার দ্বিতীয় দফা বাড়ীর বার হয়ে প্রেসক্লাব ঘুরে অফিসে যেতাম। দু'দিনেই পাগল হয়ে পাঁচটার আগেই বাড়ী থেকে বার হয়ে যেতে হতো। কবি-বরকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি ত পাগল হয়ে যাওয়ার ভয়ে পাঁচটার আগেই ফ্লাট থেকে পালিয়ে যাই। আপনি এতগুলো ছেলেমেয়ের ক্রমাগত 'ভাইয়া' 'ভাইয়া' চীৎকার শুনে দৌড় না মেরে থাকতে পারেন কি করে?" তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "বলেন কি জহুর ভাই, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের আবদার আপনি পছন্দ করেন না?" একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিলাম, "এরকম জামাতে আবদারের চোটে যেকোন জননেতাও রাজনীতি ছেড়ে পালিয়ে যাবে।" হাসিতে উজ্জ্বল মুখ 'ভাইয়া' বলেছিলেন, আমি ত রাজনীতিক নই, আমি যে ওদের 'ভাইয়া'।

রাজনীতিতে কোন উৎসাহ না থাকাতেই বোধহয় হাবীবুর রহমানের ওপর 'সংবাদ'-এর রাতের শিফটের ভার ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম। কারণ, অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, রাজনীতির পোকা একটু বেশী পরিমাণে মাথায় থাকলে খবর লেখা ডান-বাম হতে বাধ্য এবং সেটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়াটা বিপজ্জনক হত। তাছাড়া "জনগণের মোক্ষের" দায়িত্বের নিজেই অভিভাবক সাজার ফলে চারপাশের লোকজনের প্রতি অবজ্ঞা, তাদের সমস্যা সম্বন্ধে সংবেদনশীলতার অভাবও বাঘা বাঘা রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের মধ্যে বহু দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে। হাবিব ভাই যেমন ছিলেন কর্তব্যের দায়িত্বশীলতা সম্বন্ধে সজাগ, তেমনি ছিলেন সহকর্মী বন্ধু-বান্ধবের সমস্যা সম্বন্ধে সংবেদনশীল। এত বছর একসঙ্গে 'সংবাদ'-এ কাজ করেছি, কোনদিন কোন সহযোগী সম্বন্ধে অনুযোগ করতে শুনিনি, শুনিনি তাঁর সম্বন্ধে কাউকে কোন অভিযোগ করতে। আমার ধারণা, কবিরা একটু অসামাজিক হন। নিজস্ব গণ্ডির মধ্যেই তাঁরা বাস করেন এবং মন নিয়ে কারবার করতে করতে বাইরের জগৎ থেকে তাঁরা নিজেদের গুটিয়ে নেন। ধারণাটা যে ভুল, হাবীবুর রহমান সাহেব তা প্রমাণ করেছিলেন।

হাবিব সাহেব যখন আমাদের ছেড়ে ইউসিস-এ চলে গেলেন তখন আমি কিছু না বললেও তিনি নিজেই একদিন এলেন আমার কাছে। আমি তখন একা বসে। এসে বললেন, "জহুর ভাই,

www.pathagar.com

আপনি বুঝবেন না 'সংবাদ' ছেড়ে দিতে আমার কিরকম লাগছে। কিন্তু কি করব! আমি পশ্চিম বাংলার লোক, রিফিউজি—এদেশে আমার আত্মীয়-স্বজন আশ্রয় কিছুই ছিল না। কিন্তু আপনি ত জানেন, এদেশে শিকড় গাড়ার জন্য আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের নিম্নতম নিরাপত্তার জন্য আমাকে কি পরিশ্রম করতে হয়। 'সংবাদ'-এর কখন কি হয় ভরসা পাই না। সেজন্য ইউসিস-এ চলে যাচ্ছি। কিছু মনে করবেন না। 'সংবাদ'-এর কাছে আমি চিরঋণী থাকব।" আমি খুশীমনেই তাঁকে বিদায় দিয়েছিলাম। "আমরা অনেকেই মুখে জনগণ সম্বন্ধে বড় বড় বুলি আওড়ালেও আসলে বিত্ত ও নিরাপত্তার ভাবনাতেই অস্থির আছি। আপনার ত আরও বেশী থাকবারই কথা। তবে 'সংবাদ'ও বেঁচে থাকলে আপনার কাছে ঋণী থাকবে, কারণ 'খেলাঘরের আসর'ই 'সংবাদ'-এর সবচাইতে জনপ্রিয় ফিচার এবং এ জেনারেশনের কিছু হবে বলে মনে হয় না, পরবর্তী জেনারেশন কি দাঁড়ায়, দেখা যাক না।"

ইউসিস-এ মাঝে মাঝে নিমকফের সঙ্গে দেখা করতে যেয়ে হাবিব সাহেবের টেবিলেও ছুঁ মারতাম। একই রকম কর্তব্যপরায়ণ, কাজে ডুবে আছেন। শেষের দিকে জীবনের আবর্ত ভিন্ন হয়ে যাওয়াতে দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হত। লোকসানটা আমারই। বন্ধু-বান্ধবের কাছে যেটুকু শুনলাম, নিরাপত্তার সংগ্রামই তাঁর জীবনী-শক্তিকে শুষে নিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছে। এটা এ সমাজে অসাধারণ ব্যাপার নয়। জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়ে আমাদের কত সম্ভাবনাময় মানুষ অকালে বিদায় নিচ্ছে, কত মানুষের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র বিকশিত হওয়ার সুযোগ না পেয়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে তার কোন হিসাব কেউ রাখে না, রাখা সম্ভবও নয়। এদিক দিয়ে হাবিব সাহেব অন্ততঃ কিছুটা ভাগ্যবান। কবি হিসেবে জীবদ্দশাতেই তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর আসন স্থায়ীই হবে। আমার চেয়ে আরও অনেক যোগ্যতর লোক হাবিব সাহেবের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। আমার কেবল আজ কানে বাজছে সেই কৃষ্ণরাতে তাঁর কণ্ঠে শোনা, "চলে নীল শাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।"

কবিবর হাবিবর রহমানের বিদেহী আত্মা শান্তি লাভ করুক, খোদার দরগাহে এই মোনাজাত করছি। ২২ জুন ১৯৭৬।

www.pathagar.com

১৩

'আজাদ' আবার বের হওয়াতে আমি খুশী হয়েছি একান্ত ব্যক্তিগত কারণে। এ পত্রিকাটির সঙ্গে আমার জীবনের বহু স্মৃতি, অনেক তুমুল বিতর্কের কাহিনী বিজড়িত। 'নীতি' হিসেবেই স্থানীয় কোন পত্রিকা আমি কিনি না। 'সৌজন্য কপি' হিসেবে পেলে পড়ি, নতুবা পড়ি না। এবার 'আজাদ' বের হওয়ার ক'দিন পর এর অফিসে টেলিফোন করে মুজিবুর রহমান ভাইকে চাইলাম। ওপার থেকে শুনলাম, "উনি দোতলায় আছেন, ডাকতে হবে। আপনি কে বলছেন?" নাম বলায় জবাব পেলাম, "আমি জয়নুল বলছি চাচা, খলিল সাহেবের ছেলে। আপনি কেমন আছেন?" খলিল ভাইয়ের কন্দর্পকান্তি চেহারাটা (হিন্দু দেবতার চেহারার সঙ্গে তুলনা করায় মুজিবুর রহমান ভাই মাফ করবেন। খলিল ভাই বেঁচে থাকতে একথা তাঁকে অনেকবার বলেছি। তিনি আপত্তি করেননি। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা সত্যি নিবিড় ছিল।) চোখের সামনে ভেসে উঠল। জয়নুলকে বললাম, "চিনতে যখন পেরেছ, তখন কথাটা তোমাকে বললেও চলবে। ঢাকা থেকে 'আজাদ' যেদিন প্রথম বের হয় সেদিন থেকে এক কপি করে কাগজ পেতাম"। কথাটা শেষ করার আগেই শুনলাম "এখনও নিশ্চয়ই পাবেন। কাল থেকেই কাগজ যাবে। আপনার বাসার ঠিকানাটা বলুন।" খুব ভাল লাগল। সাধারণ সৌজন্য, যেটাকে আমরা আদব-তমিজ বলি, সেটা এ জেনারেশনে একটু অসাধারণ অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার হয়ে গেছে বলেই শুনি। সৌজন্যবোধটা কি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থারই একটা মূল্যবোধ? অবশ্য আমি এ ব্যাপারে অভিযোগ করতে পারি না। আশা করা যায় না এমনসব মহল থেকেই সহৃদয় ব্যবহার পাওয়ার অভিজ্ঞতাই আমার বেশী। আবার আশা করা যায় এমন সব মহল থেকেও কোন কোন সময়ে রূঢ় আঘাতও পেয়েছি। তবে জমার ঘরই আমার

www.pathagar.com

ভারী। সুতরাং, কোন খেদ নেই। সাদাকালো দুটি রঙ মিলিয়েই জীবন। তত্ত্ব কথা থাকুক, পরদিন থেকেই 'আজাদ' নিয়মিত পেতে থাকলাম।

দু'একদিন অবশ্য হকার ফাঁকি দেয়। সেদিন দিনটা একটুখানি শূন্য মনে হয়। কারণ, ৬টা দৈনিকের মধ্যে দিনের ডামাডোলে সময় না পেলেও রাতে শোয়ার আগে আদ্যোপান্ত পড়ি এবং উপভোগ করি। আমার মন চলে যায় তিন-চার যুগ আগে, মনে হয় কাল যেন স্থির হয়ে রয়েছে। আমার কিছু বন্ধু 'আজাদ' নিয়মিত পড়েন এবং বলেন, "আজাদ'ই এদেশের মুসলিম মানসের প্রতিনিধিত্বের সত্যিকার দাবীদার, বাকী সব কাগজই আস্ত ভেজাল।" আমি এ তর্কের মধ্যে এখন যেতে নারাজ। এমন এক যুগ ছিল যখন 'আজাদ'-এর শীর্ষেই লেখা থাকত "মোছলেম বাংলার একমাত্র দৈনিক" এবং তখন এ দাবী বাস্তব সত্য ছিল। ১৯৪৬ সালে শহীদ সাহেব আবুল মনসুর সাহেবকে সম্পাদক করে দৈনিক "ইত্তেহাদ" বের করার পরও কিছুদিন যাবৎ উপরোক্ত দাবী বহাল ছিল। 'আজাদ'-এর পুনরুজ্জীবনের পর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে জনাব মুজিবর রহমান খাঁর নাম দেখে আমি সত্যি আনন্দিত হয়েছি। আমার মনে পড়ে গেল প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার চিকন শ্যামল সুদর্শন এক যুবকের কথা, যিনি একদিন রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতার "অচ্ছোদসরসী-নীরে রমণী যেদিন নামিলা স্নানের তরে" থেকে শুরু করে "নিরস্ত্র মদনপানে চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে" পর্যন্ত প্রায় এক নিঃশ্বাসে আবৃত্তি করে আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কাব্যে তাঁর আসক্তি ছিল সত্যি প্রচণ্ড। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা তিনি যেভাবে অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন তাতে আমার সত্যি ঈর্ষা হত। গত কয়েকদিন ধরে 'আজাদ'-এ কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মূল্য ক' পয়সা এবং কিরূপ নিপুণভাবে তিনি ইংরেজের দালালি ও মসলমানের দুশমনি করেছেন সে সম্বন্ধে 'কাল পুরুষ'-এর যে মূল্যবান গবেষণামূলক লেখা বের হচ্ছে বিভাগ-পূর্ব যুগে পাকিস্তান আন্দোলন যখন উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছেছে তখনও এবং পাকিস্তান আমলের চব্বিশ বছরেও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমন জোরালো কোন লেখা 'আজাদ' বা অন্য কোন পত্রিকায় পড়েছি বলে মনে পড়ে না। মুজিবুর রহমান ভাইয়ের সঙ্গে চার যুগের সম্পর্কের মধ্যে বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে। কিন্তু তাঁর

www.pathagar.com

সঙ্গে মতান্তর একদিনের জন্যও মনান্তরে পরিণত হয়নি। বহুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না। ভাবছি একদিন 'আজাদ'-এ যেয়ে আবার নতুন করে তর্কে প্রবৃত্ত হব ও কিছু চা-নাশতা-সিগারেট ধ্বংস করে আসব। সম্ভব হলে তাঁর কাছে আবার রবীন্দ্রনাথ, ম্যাথু আর্নল্ড এবং নজরুলের কবিতা শুনতে চাইব। ইংরেজীর ছাত্র ছিলেন তিনি। 'আজাদ' সম্পর্কে আলোচনা করা আজ আমার এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। আজ একটি গুরুতর ত্রুটি স্বীকারের পালা। আজকের 'আজাদ'-এর পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে জনাব শাহীন রেজার "মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের জন্মবার্ষিকী প্রসঙ্গে--"আমরা তাঁকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছি কি ?" শীর্ষক প্রবন্ধ নজরে পড়ল। লেখক মন্তব্য করেছেন "রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, একথা কি বিস্মৃত হওয়া উচিত যে, মওলানা আকরাম খাঁ একজন জ্ঞানী সাধক ও নির্ভীক সেনানী ছিলেন, উপরন্তু তিনি এদেশের সাংবাদিকতার জনক ছিলেন।---তাঁর আবির্ভাব না হলে আমরা যারা আজ নিজেদেরকে 'সাংবাদিক' বলে দাবী করি ও 'সদর্পে মেদিনী কাঁপিয়ে ফিরি' তাদের এ দর্প চূর্ণ হয়ে যেত বহু আগেই। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় যখন দেখি দেশের কোন দৈনিক পত্রিকায় মরহুম আকরম খাঁর জন্মদিনের ছোট্ট খবরটি ছাপার সামান্যতম তাগিদ বোধ করেন না কেউ।" সাংবাদিকদের ব্যাপারে লেখকের মন্তব্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নেই। নিজেকে আমি সাংবাদিক মনে না করার চেষ্টাই ক্রমাগত করে এসেছি। তবে আমি বিনাদ্বিধায় স্বীকার করব যে, মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের কাগজেই আমার সাংবাদিকতার হাতেখড়ি এবং 'আজাদ' অফিসে আমার যৌবনের বহু সন্ধ্যা কেটেছে। এ অফিসে বসেই মুসলিম বাংলার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের বাঁকা-সোজা নানা গতি-প্রকৃতি কাছে থেকে লক্ষ্য করার সুযোগ ঘটেছে এবং এ অভিজ্ঞতার মূল্যের সীমা নেই। এজন্য আমি মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ও তাঁর কাগজের কাছে কৃতজ্ঞ; যদিও মওলানা সাহেবের ও তাঁর কাগজের রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে আমি একমত ছিলাম না। তাঁর জন্মদিনটা আমারও অলক্ষ্যে চলে যাওয়ার জন্য সত্যি আমি লজ্জিত।

মওলানা সাহেবকে কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর যৌবনকাল থেকেই তাঁর ধর্মীয়, রাজনৈতিক মতামত ও বক্তব্য

www.pathagar.com

নিয়ে প্রবল ও তিক্ত তর্ক চলেছে প্রায় তাঁর জীবনের শেষকাল পর্যন্ত। তিনি বহু লোককে 'কুফরী' ফতোয়া দিয়েছেন আর নিষ্ঠাবান সুন্নীরাও তাঁকে এই খেতাবে আখ্যায়িত করেছে। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর আবির্ভাব হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুরক্ত ভক্ত হিসেবে, আগাগোড়া খদ্দরে ভূষিত কংগ্রেসী মওলানারূপে, ইংরেজভক্ত আলেমদের ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজের মৌলিক সংস্কারের প্রয়োজনের অকুতোভয় তেজস্বী প্রবক্তা হিসেবে। বোধহয় কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব স্বদেশপ্রেমের ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তা আমার বালকমনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

অন্য অনেক কংগ্রেসপন্থী মুসলমানের ন্যায় মওলানা সাহেবও পরে উগ্র মুসলিম লীগপন্থী হয়ে পড়েন। ১৯৩৮-৩৯ সালেও কলকাতার মুসলিম ইন্সটিটিউটে এম, এন রায়ের এক সম্বর্ধনা সভায় তাঁকে বক্তৃতা করতে আমি নিজেই শুনেছি, "যদি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যু না হতো তবে হয়ত আমরা কংগ্রেস ছাড়তাম না।" এসব এখন ইতিহাসের অন্তর্গত; তবে একটি কথা অন্ততঃ আমি বিশ্বাস করি যে, যদি মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের 'আজাদ' পত্রিকা না থাকত তবে পাকিস্তানের উদ্ভব হত কি-না সন্দেহ। মওলানা সাহেব ও 'আজাদ' উগ্র মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানপন্থী হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার 'আজাদ' অফিসে কমিউনিস্ট, রায়পন্থী ও অন্যান্য প্রগতিপন্থী অমুসলমান বুদ্ধিজীবীদেরও যে ভিড় ছিল একথা আমি এ কলামে আগেও একবার লিখেছি। আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাহেব, মুজিবুর রহমান সাহেব ও আরও অনেকে, যাঁরা মওলানা সাহেবের মতামতের ঘোর বিরোধী ছিলেন তাঁরাও পরে 'আজাদ' অফিসে নির্বিঘ্নে আসন করে নিয়েছেন।

মওলানা সাহেব সম্বন্ধে আলোচনা করতে শুরু করলে একটা বিরাট আকারের বই-ই লিখে ফেলতে হয়। আমাদের আরও অন্য অনেক নেতার ন্যায়ই মওলানা সাহেবের একটা প্রামাণ্য কেন, কোন ধরনের জীবনীই কেউ লিখলাম না, এটা সত্যি দুর্ভাগ্যের কথা। প্রায় সত্তুর বছর ধরে এদেশের জীবনকে যিনি প্রভাবান্বিত করে গেছেন, তাঁর জীবন-কথা যদি হারিয়ে যায় তবে ভবিষ্যতে যাঁরা আমাদের একটা বাস্তবভিত্তিক নিরুত্তাপ ইতিহাস লিখতে যাবেন, তাঁরা সে ইতি-

৬--

www.pathagar.com

হাসের অনেকগুলো অমূল্য মালমসলা পাবেন না।

মওলানা সাহেবের জন্মদিবস একরূপ অলক্ষ্যে চলে যাওয়াটা নিঃসন্দেহে দুঃখের বিষয়। তবে এ সম্বন্ধে খেদের বিশেষ কোন কারণ নেই। রাজনৈতিক নেতা মওলানা আকরাম খাঁর চাইতেও 'মোস্তফা চরিতের' লেখক, কোরান শরীফের অনুবাদক, অনুপম বাংলা গদ্য লেখক হিসেবে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ বাংলা সাহিত্যে চিরদিন বেঁচে থাকবেন। এবং তাঁর বাংলা তথাকথিত 'এছলামী বাংলা' ছিল না। বর্তমানে আমি 'মোস্তফা চরিত' পড়ছি। তবে কাজটা সহজ হচ্ছে না। এর পাণ্ডিত্যের গভীরতায় আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। 'মোস্তফা চরিতের' 'প্রাথমিক কথার' একটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে আমি অসামান্য শক্তিধর পুরুষ মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ঃ

"মানুষের দেহের ন্যায় তাহার আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তিগুলিও খুব বাবু। এই বাবুগিরির খাতিরে আমাদের জ্ঞান ও বিবেক স্বাধীন আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা অসত্যের পুঞ্জীভূত ন্যককারজনক আবর্জনারাশির নিম্ন হইতে সত্যের উদ্ধারসাধন করার জন্য পরিশ্রম স্বীকার করিতে বড় একটা চাহে না। এই সহজিয়া মানসিকতা কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের গাড়ী-পাল্কিগুলিতে চড়িয়া পরম আনন্দে গা এলাইয়া শুইয়া পড়ে। ইহা মানবীয় দুর্বলতার মারাত্মক দিক। মহাপুরুষগণের জ্ঞানের গভীরতা, তাঁহাদের চরিত্রের মহিমা, তাঁহাদের জীবনের ব্রত ও সাধনা—এসব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে অনেক হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে মহাপুরুষকে ভক্তি করিতে গেলে, তাঁহার জীবনকে একেবারে বাদ দিয়া গেলেও চলে না। তাই ভক্তগণ খুব সহজে উভয়কুল রক্ষার জন্য কতকগুলি আজগুবি, অনৈতিহাসিক গল্পগুজব এবং কতকগুলি অলৌকিক ও অস্বাভাবিক উপকথার আবিষ্কার করেন এবং সেগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার জয়-জয়কার করিয়া মনে করিয়া লন যে, তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করা হইল।—কালক্রমে তাহাই শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং সেগুলি সম্বন্ধে সাধারণ সংস্কারের বিপরীত কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে শাস্ত্রদ্রোহী, ধর্ম-দ্রোহী ও কাফের বলিয়া নির্ধারণ করা হয়। যুক্তির দিক দিয়া কোন কথা বলিয়া উদ্ধার পাইবার আশাও এক্ষেত্রে খুবই কম। তুমি ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদান করিয়া এমনকি মূল শাস্ত্র-

www.pathagar.com

গ্রন্থের শত শত অকাট্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাও ; কিন্তু 'ভক্তের' নিকট সবই বিফল। তিনি এককথায় সকল যুক্তির উত্তর দিয়া বলিবেন, প্রাচীন মুনি-ঋষি ও শাস্ত্রকারগণ, 'ছালফে ছালেহীন ও বোজোর্গানে-দীন' কি এ সকল কথা বুঝিতেন না ? তোমরা কি বাপ্ তাঁহাদের অপেক্ষাও বিদ্বান হইয়াছ ? বাপ-পিতামহ চৌদ্দপুরুষ যাহা বুঝিয়া ও বলিয়া গিয়াছেন তাহাকেই আঁকড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে হইবে, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ'---ইহাই হইতেছে মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের শোচনীয়তম অধঃপতন।"

কি বাংলা, মুক্তবুদ্ধি, স্বাধীন চিন্তার কি জবরদস্ত নিশানবরদারী। ধর্মের ক্ষেত্রে মওলানা সাহেব আটত্রিশ বছর আগে যা বলেছেন, আজ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিষয়েই এ ধরনের কোন কথা বললে নানা কথা কোন কোন মহলে ওঠে।

২৯ জুন ১৯৭৬।

www.pathagar.com

১৪

"আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না, আড়ম্বর করি কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না, ভুরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না, আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না, আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি---"

কয়েক দিন আগে 'সংবাদ'-এর বার্তা সম্পাদক শ্রী সন্তোষ গুপ্ত যখন লাইনগুলো টেলিফোনে আমাকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তখন একটু চমকে যেয়ে জিজ্ঞাসা করি, কে বলেছেন কথাগুলো ? জবাব পেলাম, "রবীন্দ্রনাথ"। "আপনি এদেশের মধ্যবিত্তদের সম্বন্ধে লিখছেন কিনা, সেজন্য পড়ে শোনালাম।" লাইনগুলো লিখে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে বললাম এবং তারপর বহু তাগাদা তদ্বিরের পর লাইনগুলো লেখা চিরকুটটি আমার হস্তগত হয়। টেলিফোনে শ্রবণ করে মনের উপর এর ধাক্কাটা (impact) যথাযথরূপে হয়নি। চিরকুটটা পেয়ে লাইনগুলো বেশ কয়েকবার পড়ে পরম তৃপ্তি পেলাম। এর-পর আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে, রবি ঠাকুর সত্যি একজন তুখোড় লোক ছিলেন এবং বাঙালী চরিত্রের মাহাত্ম্য তিনি প্রকৃতই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। আমি বাঙালী মধ্যবিত্তের চরিত-মানস আলোচনা করতে যেয়ে এত কাগজ ও কালি খরচ করেও পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারিনি। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও একটি বাক্যেই রবীন্দ্রনাথ হেজেলব্লাড ক্যামেরার 'জুম লেন্স' এর ন্যায় একেবারে হাতে ছোঁয়া যায় মত করে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। "আমরা" বলতে রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালী মধ্যবিত্তকেই বুঝিয়েছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এদেশের সাধারণ মানুষ যাদের আমরা ইলেকশনের প্রয়োজনে বা এমনিও দলীয় স্বার্থের তাগিদে

www.pathagar.com

অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে, অনেক সোনালী স্বপ্ন দেখিয়ে আকাশে তুলে কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে মাটিতে ফেলে দিই, তারা কাজ করে না এমন অপবাদ রবীন্দ্রনাথ দিতে পারেন না। তিনি 'ওরা কাজ করে' কবিতায় লিখে গেছেন—

"ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে রীতিমত বাকায়দা জমিদারী চালিয়েও কবিমন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এদেশের চাষী কিভাবে রোদে পুড়ে, পানিতে ভিজে জোঁকের কামড় খেয়ে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ও উচ্চবিত্তদের কেবল অন্ন নয়, বিলাসবহুল জীবনযাপন করার জন্য ধান, পাট ফলায়। রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত চরিত্র সম্বন্ধে যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো যে এ বিষয়ে শেষ কথা তা কি গত উনত্রিশ বছরে বিশেষ করে গত সাড়ে চার বছরে আমরা সকলেই হাড়ে হাড়ে টের পাইনি ? "আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না"—পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে ঢক্‌কা নিনাদে কত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার খবর সংবাদপত্রে, রেডিওতে শোনার দুর্ভাগ্য আমাদের হয়েছে, কিন্তু সেসব পরিকল্পনার কত শতাংশ কার্যকরী করা হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু জানার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

আমার পরিষ্কার মনে আছে ১৯৪৯ কি ১৯৫০ সালে খবরের কাগজে ব্যানার হেডলাইন দেয়া হয়েছিল, ঢাকাকে নিউইয়র্কের চাইতেও বড় ও সুপরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং নীচে খবরে একথাও বলা হয়েছিল যে, এ সম্বন্ধে শিগগিরই কাজ শুরু হচ্ছে। তখনই আমার মনে হয়েছিল যে, আরম্ভটা একটু মাত্রাজ্ঞানহীন আড়ম্বরের সঙ্গে করা হয়েছে। আজ পঁচিশ বছর পরেও এ শহরের হঠাৎ অভিজাতে রূপান্তরিত ব্যক্তিদের বাসস্থান ধানমণ্ডি এলাকাতেই পয়ঃপ্রণালীর কোন বন্দোবস্ত নেই এবং বর্ষাকালে অধিকাংশ বাড়ীর উঠোন অর্থাৎ লন বা 'কিচেন গার্ডেন' গা ঘিন ঘিন করে এমন নোংরা পানিতে ভাসতে থাকে। এ ধরনের উদাহরণ দিতে শুরু করলে তার আর শেষ হবে না।

www.pathagar.com

সে আমলেই আমি সরকারী নেতা ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের বিদ্রূপ করে বলতাম এবং এই 'সংবাদ'এ-ই লিখেছি, আপনাদের পরিকল্পনা শব্দটি শুনলে বা দেখলেই মনে হয় ধুলো-কাদার মানুষদের পরীর কল্পনা করতে উদ্বুদ্ধ করে আসলে বক দেখানো হচ্ছে। তখন অবশ্য বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার কথাটা মনে করতে পারিনি। যদি ভবিষ্যদ্রষ্টা হতাম, তাহলে জিহবাটা এখনকার মত তখনই কণ্ট্রোল করে ফেলতাম। এ পরিকল্পনাগুলো রচনা করেছেন এদেশেরই মধ্যবিত্ত অর্থনীতিবিদ ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা। এগুলো কার্যকরী করার দায়িত্ব ছিল একান্তভাবে মধ্যবিত্ত অফিসারদের। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় টাকা দেয়নি, এটা খাঁটি সত্য কথা। কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেত তার বিপুল পরিমাণ অংশই ফেরত যেত ব্যবহার না হওয়ায়। আইয়ুবী আমল শুরুর দু'বছরের মধ্যেই গোটা সেক্রেটারিয়েট পশ্চিমাশূন্য হয়ে যায় এবং প্রায় সবগুলো সেক্রেটারীর পদ বাঙালীর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়। সুতরাং পশ্চিমা অফিসাররা এখানে বসে সাবোটাশ করেছেন, এ বলে আত্মতৃপ্তি লাভের কোন উপায় নেই। নিজেদের দায়িত্ব বিন্দুমাত্র পালন না করে আমরা ঢালাওভাবে আমাদের সকল দুর্দশার দায়িত্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমা শোষণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে কেবল আত্মসন্তুষ্টিই লাভ করেছি। এর অর্থ এ নয় যে, আমি পাকিস্তানের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করছি। কিভাবে এদেশকে ভারত-বিভাগের সময়ে বঞ্চিত করে, কিভাবে বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এদেশের ১২২ কোটি পাউণ্ডের একটি ফাদিংও এখানে খরচ না করে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পের, বাণিজ্যের কাঠামো তৈরী শুরু হয় এবং কোরিয়া যুদ্ধের তেজী বাজারে এদেশের দরিদ্র চাষীর মাথায় বাড়ি দিয়ে ছ'টাকা থেকে দশটাকা মণ দরে পাট কিনে সেই পাটই বিদেশে দশগুণ দরে বিক্রি করে কয়েক হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানকে চমকপ্রদ গতিতে শিল্পায়িত করা হয় তা আমি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করে এসেছি এবং প্রথমে 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এ ও পরে 'সংবাদ'-এ ক্রমাগত বলে এসেছি। আরও বলে এসেছি যে, এটা হতে পারছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আমাদের নেতৃত্বের ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে সারা দেশের মানুষের স্বার্থকে বিক্রি করে দেয়ার জন্য। আমার বক্তব্য অতি সোজা--আমরা পরের

www.pathagar.com

ওপর সব দোষ চাপিয়ে নিজেদের নিম্নতম দায়িত্ব পালন না করে কেবল বড় বড় কথা, বিরাট বিরাট সব কল্পনা করে তৃপ্তি পাই। এ গুণটি আমাদের মধ্যবিত্তের রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিশে গিয়েছে।

বাংলাদেশ হওয়ার পর 'সোনার বাংলা' গড়ার পরিকল্পনা কি বীভৎস ও বিয়োগান্ত উপহাসে পরিণত হয় তা এত নিকটের কাহিনী যে এর কোন বর্ণনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। এবং এর দায়িত্ব কাদের? আমার মতে এ দায়িত্ব সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। একথা আমি যখন বলি, জানি এর ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু সে ব্যতিক্রম হলো সাধারণ সত্যটিকে সুপ্রমাণ করা।

"আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না"—রবীন্দ্রনাথের এ কথার সঙ্গে দ্বিমত হওয়ার কোন উপায় আছে কি? বিভাগ-পূর্ব যুগে মুসলমান হওয়ার অহংকারে আমরা মশগুল ছিলাম এবং যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা না করে প্রতিযোগিতাকেই খতম করে দেয়ার জন্য হিন্দুরা আমাদের প্রাপ্য দিচ্ছে না বলে আলাদা হয়ে যাই। পাকিস্তান হওয়ার পর মুহূর্ত থেকেই পশ্চিমারা সব খেয়ে ফেলল বলে পঁচিশ বছর কোন কাজ না করে বাঙালীত্বের অহংকারকে সম্বল করে তারস্বরে চীৎকার এবং সর্বশেষে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মারফত স্বাধীন হলাম। তারপর? এখন ত আর পশ্চিমাদের ওপর দোষ চাপাবার উপায় নেই। "আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি------।" পাকিস্তান হওয়ার পর যখন দেখলাম পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েটে স্বাস্থ্য দফতরে কাসেম সাহেব ও অর্থ দফতরে নবী সাহেব ছাড়া আর কোন ডেপুটি সেক্রেটারীও বাঙালী নেই, তখন আমি তখনকার এক মন্ত্রী বাহাদুরকে বলেছিলাম, "সেক্রেটারিয়েটের অফিসার পদে আরও বেশী বাঙালী নিয়োগ না করলে, ফল ভাল হবে না।" জবাব পেয়েছিলাম, "বাঙালীদের যোগ্যতা কোথায়? পশ্চিমাদের ওপর বেশ কিছুদিন পুরোপুরি নির্ভর করা ছাড়া আমাদের উপায় কি? এসব বিভেদাত্মক কথা তোমার মত পাকিস্তান-বিরোধীরা বলতে পারো।" এর দু'মাস পরেই দেখলাম "বাংলা ভাষাকে" উপলক্ষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রাদ্ধ শুরু হতে। পশ্চিমাদের উঠতে বসতে গাল দিলেও কিন্তু ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে আমেরিকান কূটনীতিবিদদের রাস্তায় বার হওয়াই অসুবিধাজনক

www.pathagar.com

করে ফেলেছিলাম। কারণ, আমেরিকা ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে ভারতের পক্ষে ছিল বলে সকলের ধারণা হয়েছিল। "ভারত বড় দেশ, ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ষাট কোটি। সুতরাং গাণিতিক, জ্যামিতিক দুই হিসাবেই আমেরিকার ভারতের দিকে যাওয়াটা অপ্রত্যাশিত নয়" বলাতে, এক বন্ধু আমাকে রীতিমত নাজেহাল করেন। অথচ এর কয়েক মাস আগেই বিদেশী সাহায্যের ফলে যে দেশের সার্বভৌমত্ব অনেক সময় বিপন্ন হয়ে পড়ে একথা আমার এই বন্ধুকে বলাতেই তিনি জবাব দিয়েছিলেন "আরে যান মিয়া! মার্কিন সাহায্য না পেলে আমাদের দু'বেলা ভাতই জুটবে না।" এবং এ মনোভাবে বন্ধু একক ছিলেন না। বামপন্থী মহল ছাড়া মধ্যবিত্তের বিপুল অংশেরই সে সময়ে এ মনোভাব ছিল। বস্তুতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে জজবা সে সময়ে ছিল তার অন্যতম প্রধান কারণই ছিল বিদেশী সাহায্যের ন্যায্য অংশ পূর্ব বাংলায় না আসায় ইণ্ডেন্টিং-এর যাদুকাঠির স্পর্শে তারা রাতারাতি বড়লোক হবার সুযোগ পুরোপুরি পাচ্ছে না।

স্বাধীনতার ভয়াল সংগ্রামের সময়ে ভারতীয় সাহায্যের প্রত্যাশায় বহুযুগের হিন্দু-বিরোধী ও ভারত-বিরোধী মনোভাব উবে গিয়ে এক অস্বাভাবিক 'ভ্রাতৃত্ববোধে'র বান ডাকল, তখনই আমার মনে হয়েছিল এটা খাঁটি এবং টেকসই হতে পারে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে ও দু'একমাস যাওয়া পর্যন্ত যে মার্কিন ও চীন-বিরোধী মনোভাব ছিল তাতেও আচ্ছন্ন দৃষ্টি নয় এমন লোকের বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় মধ্যবিত্তের চরিত্র যাঁরই জানা, তিনিই বুঝেছেন ভারতের প্রতি বন্ধুভাব ও মার্কিন-চীনের প্রতি বৈরিভাব কর্পূরের মত উবে যেতে বাধ্য। তাই আজ আবার নতুন করে আমেরিকা ও চীনের ওপর প্রত্যাশা সীমাহীন হয়ে উঠেছে এবং এটা অতি সঙ্গতকারণেই হয়েছে। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে অনায়াসে উপরে, আরও উপরে ওঠার যে আকাঙ্ক্ষা স্থায়ীভাবেই বাসা বেঁধেছে, তা মিটাতে পারে আমেরিকা। আর চীন আমাদের সম্ভাব্য ভারতীয় হামলার বিরুদ্ধে গ্যারান্টি এ বিশ্বাসই আমাদের তৃপ্তি দেয়। জনগণের সংঘবদ্ধ ঐক্য, জনসাধারণের মনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থাই যে সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বড় গ্যারান্টি---একথা আমাদের মধ্যবিত্তের মুখে থাকলেও মনে নেই। থাকলে আমাদের খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টালেই যে সব খবর নজরে পড়ে, তা পড়ত

www.pathagar.com

না। এটা লেখার সময় পত্রিকায় দেখলাম যে, চীনের পার্টির পলিট-ব্যুরোর সদস্য মিঃ ইয়াও ওয়েন-ইউয়ান সফররত বাংলাদেশের সাংবাদিক প্রতিনিধিদলকে ঠিক একথাই বলেছেন। কথার বদলে আমরা যদি একটু বেশী কাজ করতাম, আর একটু যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করতাম, তাহলে এত রক্তপাতের পর যে দেশটা আমরা পেয়েছি, সে দেশটির চেহারা কিছুটা অন্ততঃ বদলাতে পারতাম।

"যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না", রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যটাই সবচেয়ে মারাত্মকভাবে সত্য। আমাদের আসল সমস্যা এই হিপোক্রেসি, যেটার ব্যবহার আমরা নিজেদের ওপরই সবচেয়ে বেশী করেছি এবং এর ফলেই দেশের এ অবস্থা। ইংরেজ মধ্যবিত্তের হিপোক্রেসি ও মূল্যবোধের ওপরই বার্নার্ড শ' Pygmalion বইটি লিখেছেন। আমাদের এখানকার কোন সাহিত্যিক যদি বার্নার্ড শ'র অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টাও করতেন, দেশের উপকার হত।

২ জুলাই ১৯৭৬।

www.pathagar.com

১৫

তেল-আল-জাতার। গনগনে লাল উত্তপ্ত লোহা দিয়ে নামটা যেন মগজে দেগে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু পাঁচ সপ্তাহ পূর্বেও বৈরুতের উপকণ্ঠে পনের হাজার প্যালেস্টাইনী আরব উদ্বাস্তুর এই শিবিরের নামটি মাথায় একেবারেই ছিল না। দু' একবার কাগজে হয়ত দেখেছি এখান থেকেই ইয়াসির আরাফাত বা জর্জ হাবাশের প্যালেস্টাইনী কমাণ্ডোরা যেয়ে ইসরাইলের অভ্যন্তরে কোন কিবুৎজ বা লোকালয়ের ওপর হামলা চালিয়েছে। বাস্, ঐ পর্যন্ত: তার পরেই ভুলে গিয়েছি। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি তেল-আল-জাতারের এ ভয়াল করুণ পরিণতি হবে। রয়টারের রিপোর্ট ঃ "বিধ্বস্ত তেল-আল-জাতার শিবির আজ লুটেরাদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে তারা রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ ও আসবাবপত্র বের করে নিয়ে যাচ্ছে। রাজপথে এবং অলিতে-গলিতে ইতস্ততঃ পড়ে থাকা গলিত শবের ওপর দিয়ে তারা লুটের মাল টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পচা দুর্গন্ধ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা রুমাল দিয়ে মুখ বেঁধে নিয়েছে। দু'মাস পূর্বেও এলাকাটি ১৫ হাজার প্যালেস্টাইনী ও গরীব লেবাননবাসীর আবাস ছিল। আজ গোটা এলাকাটি এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ। ধ্বংসস্তূপের ইট-পাথর সরিয়ে লুণ্ঠনকারী দল লুণ্ঠনযোগ্য দ্রব্য খুঁজে বের করছে। অধিকাংশ লুণ্ঠনকারী দক্ষিণ-পন্থী খৃস্টান বাহিনীর অবৈতনিক সৈন্য, তাদের নিয়মিত বেতন দেয়া হয় না। ফলে, তারা বেতনের পরিবর্তে মালামাল সংগ্রহ করছে। লুণ্ঠনের জন্য অনেকে তাদের পরিবারের অন্যান্য লোকজনদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।" পড়া যায় না, এ লোমহর্ষক বিবরণের প্রথমেই ডাঃ আবদুল আজিজ লাবাদী ও ডাঃ ইউসুফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, দক্ষিণপন্থী খৃস্টানরা তেল-আল-জাতারে আহতদের সেবা-রত ৬০ জন নার্সকে গুলী করে হত্যা করেছে। আন্তর্জাতিক রেড-

www.pathagar.com

ক্রসের প্রধান প্রতিনিধি মিঃ জাঁ হোফ্লিজার জানান, তিনি নিশ্চিত, অন্ততঃ দশজন নার্সকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে এবং বাকী ৫০ জন নিখোঁজ। ৫২ দিনের অবরোধকালে দক্ষিণপন্থী খৃস্টানরা ৬০ হাজার শেল তেল-আল-জাতারের ওপর বর্ষণ করেছে। দু' হাজার প্যালেস্টাইনী নিহত হয়েছে, তিন হাজার হয়েছে আহত—এদের শতকরা নব্বুই জনই শিশু ও বেসামরিক লোক। একটি সুড়ঙ্গের ভিতর আশ্রয় গ্রহণকারী পাঁচশ' বৃদ্ধ, নারী ও শিশুর কয়েকজন ছাড়া কেউ বাঁচেনি। দক্ষিণপন্থীরা তাদের অপসারণের জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রসের আবেদনকে অবহেলার সঙ্গে উপেক্ষা করেছে।

এ জীবনে আরও অনেক বিরাট বিয়োগান্ত সংঘর্ষ, রক্ত স্বচক্ষে দেখার এবং অনেকগুলোর বিবরণ কাগজে, বইয়ে পড়ার দুর্ভাগ্য হয়েছে। ১৯৪৬-এর কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় (যাকে Statesman পত্রিকা আখ্যা দিয়েছিল Great Calcutta killing) বিভিন্ন এলাকায় স্তূপীকৃত হিন্দু-মুসলমানের বিকৃত লাশ দেখেছি। সরকারী হিসেবেই সে দাঙ্গায় এক মাসের কম সময়ের মধ্যে নিহতের সংখ্যা সতের হাজারের বেশী ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে দাঙ্গার পিছনেও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের "বিভেদ সৃষ্টি কর ও শাসন কর" নীতি কার্যকরী ছিল। থামার পরেও মাঝে মাঝেই সে দাঙ্গা আবার শুরু হতে থাকায় গান্ধীজী বেলেঘাটায় এসে আমরণ উপবাস করায় সে দাঙ্গা থামে বটে; কিন্তু তার আগেই নোয়াখালীতে দাঙ্গা ও বিহারে মুসলমানদের ওপর প্রায় কেয়ামত হয়ে গেছে। ভারত বিভাগের পূর্বাহ্নে সারা উত্তর ভারতে যে নরমেধ শুরু হয় তার বিরুদ্ধতা করাতে গান্ধীজী "হিন্দু ধরম কি দুশমন" হিসেবে চিহ্নিত হন এবং প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে মুসলিম বিদ্বেষী উগ্র হিন্দু রাষ্ট্রীয় স্বয়ম সেবক সংঘের নরপশু নাথুরাম গডসের গুলীতে প্রার্থনারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালে এদেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বীভৎসতা কাছে থেকেই দেখেছি। ঘরের ও ঘরের কাছের এসব ব্যাপার ছেড়ে দিলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নাৎসী বর্বরতার সব কাহিনী পত্র-পত্রিকায়, বই-পুস্তকে গোগ্রাসে গিলেছি। এখনও পেলেই পড়ি। ষাট লাখ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে ও বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও বিভীষিকার মধ্যে হত্যা করে হিটলার 'ইহুদী সমস্যার" স্থায়ী সমাধান যেভাবে করতে চেয়েছিলেন

www.pathagar.com

তার নানা বিবরণ এখনও পড়ে আমার গা শিউরে ওঠে। ইহুদী-দের ওপর আমার কোন আক্রোশ নেই। আইনস্টাইন ইহুদী ছিলেন এবং সময় থাকতে ভিয়েনা ত্যাগ করে আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই দুনিয়া এই বিজ্ঞানসেবীর সাধনার দ্বারা উপকৃত হয়েছে। কিন্তু ইহুদীবাদকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, যখন দেখি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঢালাও সাহায্য ও সমর্থনে বলীয়ান হয়ে ইহুদীবাদ আরবদের নিজ বাসভূমি থেকে উৎখাত করে দিতে, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়--ঠিক যেভাবে নাৎসীরা ইহুদীদের দিয়েছিল উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন করে জার্মানী থেকে। জাপানীরা চীনে "মাঞ্চুরিয়া ঘটনার" অজুহাতে প্রায় দু' যুগ ধরে কি বর্বরতার অনুষ্ঠান করেছে তারও মোটামুটি বিশদ বিবরণ আমার জানা আছে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে "সম-শ্রীবৃদ্ধি এলাকার" (Co-prosperity sphere) নামে প্রায় সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কি অমানুষিক "পীত বর্বরতার" রাজত্ব কায়েম করেছিল তার উত্থান ও পতনের কাহিনীও একাগ্র মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। তা সত্ত্বেও হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বর্ষণের পর আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভিয়েতনামকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচাবার মহৎ উদ্দেশ্যে মার্কিনীরা কিরূপ অকৃপণভাবে নাপাম বোমা আকাশ থেকে ফেলে গ্রামের পর গ্রামের মানুষকে রোস্ট করেছে, কেমিক্যাল ছড়িয়ে গাছপালা-ঘাস পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে, লাখ লাখ টন বিষম বিস্ফোরক বোমা ফেলে কমিউনিস্টদের ঝাড়ে-বংশে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছে, মাইলাই গ্রামের নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যা করে গ্রামটিকে বিশ্ববিখ্যাত করেছে--- এসব কাহিনীও আমার জানা আছে সব সংবাদপত্র পাঠকের ন্যায়ই।

ওপরের ঘটনাগুলোর তুলনায় তেল-আল-জাতারের ট্রাজেডী এমন কিছুই ব্যাপার নয়। রয়টার বলছেন, দু' হাজার মৃত, তিন হাজার আহত। আমার মনে হয় হতাহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। তবুও হতাহতের গাণিতিক হিসেবে এটাকে একটা বড় রকমের ট্রাজেডী বলা চলে না। কিন্তু একদিক দিয়ে তেল-আল-জাতার সত্যি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে, প্রমাণ করেছে দু'টি সত্য। ওপরের সবগুলো বর্বরতা-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত বিক্ষুব্ধ হয়েছে। ইহুদী-

www.pathagar.com

দের ওপর বর্বরতার জন্য অপরাধবোধ থেকে চুয়াল্লিশ বছর পরেও জার্মানীরা আজও নিষ্কৃতি পায়নি। এটা কম-বেশী সবগুলো ব্যাপারেই সত্যি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এদেশে যা করেছে তা এদেশের অনেক লোক স্বার্থের তাগিদে বা অন্য যেকোন কারণে হোক ভুলে গেলেও সে সময়ে সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পাকিস্তানেও এমন লোক আছেন, যাঁরা এখনও এ ব্যাপারে বিবেকের দংশনে ভোগেন, যেমন এখানেও এমন লোক বিরল নন, যাঁরা বিহারীদের ওপর বাঙালীরা যা করেছে তার জন্য লজ্জিত। বর্বরতার কোন অজুহাতই খাড়া করা যায় না। তেল-আল-জাতারের কথায় ফিরে আসা যাক। এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল ; কিন্তু দুনিয়ার কোথাও কেউ এর বিরুদ্ধে কোন আন্তরিক ঘৃণা বা ক্ষোভ প্রকাশ করল না, আশ্চর্যের সঙ্গে দু'মাস ধরে প্রতিদিন আমি তা বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। সবচেয়ে আমাকে আশ্চর্য করেছে আরব রাষ্ট্রগুলোর আচরণ। এদের অনেকগুলোরই সরকার যে প্রথম থেকেই প্যালেস্টাইনী আরবদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, তাদের সরকার ও রাষ্ট্রনায়কগণের অনেকে যে গত তিন-চার যুগ ধরেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কোন না কোনটির ক্রীড়নক এবং অধুনাও যে অনেকে পূর্বেকার নীতি ত্যাগ করে আমেরিকার কোলে চড়ে বসবার জন্য ফিকির খুঁজছেন, এসব তথ্য আমার অজানা নয়। সর্বোপরি এঁদের একে অপরের প্রতি যে কি বিষাক্ত মনোভাব বরাবরই পোষণ করে আসছেন এবং তার ফলেই যে ইসরাইলী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছে এসব ব্যাপার আমি আগেই আলোচনা করেছি। তবু আমি বলব, তেল-আল-জাতারের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। প্যালেস্টাইনী ও লেবাননী মুসলিমদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্গি সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু ইয়াসির আরাফাত, জর্জ হাবাশ ও কামাল জুমব্লাতের মুক্তিবাহিনী খৃস্টানদের সশস্ত্র হামলা যখন প্রায় গুঁড়িয়ে দিয়েছে তখনই সোভিয়েত পরামর্শ আগ্রাহ্য করে সিরিয়া তার সোভিয়েত অস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী প্রেরণ করে এবং ফ্রাঙ্গির বদলে অন্য একজন খৃস্টান প্রেসিডেন্ট মেনে নিয়ে শান্তি স্থাপন করতে প্যালেস্টাইনী, আরব ও লেবাননী মুসলমানদের আহবান জানায়। সিরিয়ার উদ্দেশ্য ছিল লেবাননে একটি সিরিয়ার প্রভাবাধীন

www.pathagar.com

সরকারে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু প্রায় এককভাবে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগুনে পুড়ে ইস্পাতে পরিণত প্যালেস্টাইনী মুক্তি সংস্থা ও তাঁদের মুক্তিবাহিনী সিরিয়ার মোড়লী ও দক্ষিণপন্থী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পোষা খৃস্টানদের সঙ্গে আপোষ করতে রাজী হল না। সিরীয় সেনাবাহিনী লেবাননের অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়ে খৃস্টান এবং প্যালেস্টাইনী ও লেবাননী মুসলমানদের মধ্যে ট্যাঙ্ক, কামান ও তাদের সেনাবাহিনীর দেয়াল তুলে সুযোগ দিল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে ফ্রান্স, ইসরাইলকে বিদ্যুৎগতিতে খৃস্টানদের আধুনিকতম মারণাস্ত্রে সাজ্জত করার। সিরিয়ার লেবাননে হস্তক্ষেপ আরব জাহানে কেউ সুনজরে দেখেনি। আরব লীগ ইয়াসির আরাফাত ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অনেক লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁরা সিরিয়ার বিরুদ্ধে অনমনীয় কঠোর মনোভাব দেখিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে শক্তি ক্ষয় করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আরব লীগের সহানুভূতি-সমর্থন কাকস্য পরিবেদনায় পর্যবসিত হয়। তাঁদের প্রেরিত দু'হাজার সৈন্য তেল-আল-জাতারের হত্যালীলার তামাশা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে কেবল অবলোকন করে গেছেন---একটিও বুলেট খরচ করেননি, পাছে সাগরপারের মুরুব্বীরা চটে যান। পরিষ্কার প্রমাণিত হল মানবতাবোধ, বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী ও স্থানীয় শাসকবর্গের স্বার্থের তাগিদের সামনে দাঁড়াতে পারে না।

মনে পড়ে গেল ১৯৫৬ সালে ইংরেজ, ফরাসী ও ইসরাইল যখন মিসরকে একযোগে আক্রমণ করে; আমেরিকা তখনও এ অঞ্চলে মোড়লীর ভার পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। বৃটিশ সিংহ তখনও কেশর ফোলায়। ফরাসী লিজিয়নারীরা তখনও আলজিরিয়ায় হত্যাযজ্ঞ ও নারীধর্ষণ (জামিলা বুহাইদ) অবলীলাক্রমে চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নাসের তখন জীবিত। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি পশ্চিমা শক্তিবর্গকে বেশী নারাজ করতে দ্বিধা করলেন। পোর্ট সৈয়দ, আলেকজান্দ্রিয়া জ্বলছে। আকাশ থেকে বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থাবিহীন দু'টি শহরে ঝাঁকে ঝাঁকে ইসরাইলী বোমারু বিমান বোমা বর্ষণ করছে। ইসরাইলী ট্যাঙ্ক বাহিনী দু'টি শহরেরই উপকণ্ঠে। 'সংবাদ'-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় লেখা হল এ শিরোনামায়---"বক্ষরক্ত পান করিব"।

www.pathagar.com

বক্তব্য ছিল ঃ যদি মিসরের ওপর এ হামলা অবিলম্বে বন্ধ না হয় তবে প্রতিটি শ্বেতাঙ্গ নরনারীকে হত্যা করে তাদের বুক চিরে অঞ্জলি ভরে রক্ত পান করে পোর্ট সৈয়দের শহীদদের স্মৃতি-তর্পণ করা হবে। সেদিন সকালেই পুরানা পল্টনের বৃটিশ তথ্য দফতরের কাঠের বাড়ীটিতে আগুন দিয়ে জনতা পুড়িয়ে ছাই করে দিল। আমি সাড়ে দশটায় অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলাম নারিন্দার যুবনেতা আশরাফকে পুলিশ পুরানা পল্টনে বৃটিশ হাইকমিশনের ছাদের ওপর বেশ লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ করছে। লক্ষ্য করে দেখলাম হাতে ছেঁড়া ইউনিয়ন জ্যাক। আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতে শুরু করলাম, ঐ পিচ্ছিল স্টীলের ফ্ল্যাগ পোলটায় তিনি আরোহণ করলেন কিভাবে। এমন সময়ে ডি, আই, জি জনাব এ, কে, এম হাফিজুদ্দিনের সামনে পড়ায় (বর্তমানে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা) তিনি ধমক দিয়ে বললেন, "আগুন লাগিয়ে তামাশা দেখছেন? আপনাকেই এ্যারেস্ট করা দরকার।" আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম—এভাবে বললাম, "আমি? আগুন দিয়েছি? চুলোর আগুনের কাছেই আমি যাই না। তা ঐ ঘোড়াটা কি দোষ করেছিল?" কোন উত্তর না দিয়ে হাফিজুদ্দিন সাহেব চলে গেলেন। উচ্ছৃঙ্খল জনতার ওপর মৃদু যষ্ঠি চালনা করতে যেয়ে পুলিশ গোলে হরিবোলে ঐ ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মাথায়ও এক বাড়ি মেরেছিল। ফলে সে পরলোকগমন করে এবং তার লাশটা ওইখানে তখনও পড়ে ছিল।

তেল-আল-জাতারের শেষ খবরটা পড়ার সময় ১৯৫৬ সালের সে দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেল তাই ভাবছি। আমার এক বন্ধু দেশে ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে দেহ-মন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর ধারণা, বাংলাদেশ হওয়ার পর বাংলাদেশে কুফরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারও মতবাদ নিয়ে তর্ক করা আমি ছেড়ে দিয়েছি বেশ কয়েক বছর। এই লেখা শুরু করার আগেই তিনি এসেছিলেন। তাঁকে বললাম, "তেল-আল-জাতারে এরকম একটা মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেল, আমাদের এখানে কোন নেতা, উপনেতা একটিবার 'আহা'ও বললেন না"। ভদ্রলোক স্পষ্টবক্তা। জবাব পেলাম, "বেহুদা ওসব ব্যাপারে যেয়ে যারা আমাদের খাওয়াবে-পরাবে, ভারতের হাত থেকে বাঁচাবে তাদের সঙ্গে একটা খটাখটি লাগাব নাকি?" অকাট্য এবং বাস্তববাদী যুক্তি। কিন্তু মনে পড়ল ইসলামের দ্বিতীয় পবিত্র

www.pathagar.com

স্থান বায়তুল মোকাদ্দাস এখন ইসরাইলের কবলে এবং হজরত ওমরের (রাঃ) মসজিদুল আক্সাতে এখন ইহুদীরা সিনাগগ প্রতিষ্ঠা করে প্রার্থনা করছে।

১৭ আগস্ট ১৯৭৬।

www.pathagar.com

১৬

"হ্যালো। সালাম ভাই আছেন?" ওপার থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রীর চিক্‌কন গলার আওয়াজ শুনলাম, "আব্বা, আপনারে জহুর চাচা ডাকছে।" কয়েক সেকেণ্ড পরেই শুনলাম, "কি খবর, জহুর মিয়া নি?" "জী, এ রকম গলা আর কার অইব? আইচ্ছা, সালাম ভাই, ডেমোক্র্যাসী অর্থাৎ গণতন্ত্রের অর্থটা আমারে একটু বুঝাই কইতে ফারেননি?" "এ্যাঁ? গণতন্ত্রের মানি বুঝেন না? তা অইলে এদ্দিন কম ফক্‌কে হাজার গা এডিটোরিয়াল গণতন্ত্রের ফক্‌কে লেই-খ্‌লেন ক্যামনে মিয়া?" এ 'লেইইত অন বিফদে ফইড়ছি। এই শেষ বয়সে তোবা করছি না বুঝি না হুনি আর কোন কাম কইরতাম ন, এক ফাও অগ্রসর হইতাম ন। আমনেরে ত বুজুর্গ গত ফঁচিশ-ত্রিশ বছর দরি মানি আইছি। অর্থাৎ আমনে যে একজন ফিওর ইনটে-লেক্‌ট্‌ (pure intellect) এই কতা ত আইজ ত্রিশ বছর দরি হুনি আইয়ের। হেই কতাল্লাই ত আমনে যা কন ঠিক তার উল্টা-টাই ঠিক বলি বরাবর মনে করার সঙ্গত কারণ ফাইছি।" "এত বয়সেও আমনের ফইচকামি গেল না। আরে মিয়া আমার ইনটেলে-ক্‌ট্‌ এপ্রেসিয়েট করার মত ইনটেলিজেন্স আমনের ত নাইই, হারা দেশেই কম বলিই ত দেশের এই দুরবস্থা।"

এখানে একটুখানি টীকা প্রয়োজন। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি যখন সালাম ভাই 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এ লিখতে শুরু করেন তখন থেকেই তাঁর সংগে আমার সম্পর্কটা গাঢ়ভাবে বিদ্যমান। আমরা দু'জনে সব সময়েই পিওর নোয়াখালী ভাষায় কথা বলি। আমি তাঁকে বুজুর্গ মানি এটা নির্ভেজাল সত্যি। আবার এও সত্যি, তাঁর পিওর ইনটেলেক্‌ট্‌ অর্থাৎ আত্মভোলা, আগামাথা-নেই মনের বিচিত্র সব কার্যকলাপের রসালো সব বিবরণ দিয়ে আমি ঢাকা, করাচী, লাহোর, পিণ্ডির বহু লোকের চিত্তবিনোদন করেছি। অনেক সময়ে

৭—

www.pathagar.com

আমাকে আর পরিশ্রম করতে হয়নি, তিনি নিজেই এ কার্য সমাধা করেছেন। এ সব সত্ত্বেও তাঁর ইংরেজী লেখার স্টাইল, 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এ তাঁর সম্পাদকীয়গুলো দেশে-বিদেশে অকুণ্ঠভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

সালাম ভাইয়ের পিওর ইনটেলেক্ট্ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এ লেখা আর শেষ হবে না। আমি আবার অনুনয় করলাম, "অ সালাম ভাই, দেন না আঁরে এককানা ডেমোক্র্যাসির অর্থ বুঝাই।". "আইচ্ছা, হুনেন তা অইলে, ডেমোক্র্যাসির মানি অইল "A Government of the people, by the people, for the people". "আঁরে (আমাকে) এত বকলম মনে করেন কিল্লাই? এই কথাটা আঁই আই, এ ফার্স্ট ইয়ারের সিভিক্স ক্লাসে প্রফেসর শামসুল হক সাহেবের কাছে হুনছি। স্যার কথায় বার্তায়, ফোশাকে আশাকে, উচ্চারণে এক্কেরে ইংরেজের মত আছিলেন। ফড়াইতেনও বালা। এক্কেরে ফানির মত করি সব বুঝাই দিতেন। ডেমোক্র্যাসির মানিও হেই রকম বুঝাই দিছিলেন। আমনে ডেমোক্র্যাসির যে ইংরাজী ব্যাখ্যা দিলেন হেই কতাআন্ত কইছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মরহুম আব্রাহাম লিঙ্কন সাব। দুনিয়ায় যে দুই-চারজন রাজনৈতিক নেতারে অন্তরেরতন বক্তি করি আব্রাহাম লিঙ্কন তাঁর একজন।" "বাজে কতা কওয়ার অভ্যাস আমনের হারা (সারা) জীবনেও গেল না। গেটিসবার্গে যাওয়ার সময়ে এক টুকরা কাগজের স্লিপের ওপর লিঙ্কন ঐ কতাগুলি খালি পয়েন্ট হিসাবে লেখি লই extempore oratory'র একটা all time classic সৃষ্টি করেন।" "বাজে কতা আঁই (আমি) কই, না? আঁই কই কি আর আঁর (আমার) তানফুরায় কয় কি? আঁই আমনের কাছে গণতন্ত্র বুইঝতাম ছাইলাম, আর আমনে আঁরে হেই বেডা লিঙ্কনে ক্যামনে গেটিসবার্গের বক্তৃতা দিছিল হেইটা বুঝাইতে শুরু কইচ্ছেন। আঁই যদি কই লিঙ্কনের বক্তৃতার ফরের একশ' বছরেরও বেশী তবিজতা অইতে ইয়াই বুঝা গেছে যে, গণতন্ত্রের মানি "Government by the enemies of the people, of the enemies of the people, for the enemies of the people, ত আমনে কি কইবেন?" "এরিস্টটলে ডেমোক্র্যাসি সম্বন্ধে কি কইছে জানেন নি?" "না"। এরিস্টটলে কইছে, "Democracy is the worst form of Government."

www.pathagar.com

"কি রকম ?" "He meant a Government by the ignorant, of the ignorant, for the ignorant." "এরিস্টটলের বাড়ী কোন্ জেলায় ?" "আরে মিয়া আমনেত হাঁচাই দেইয়ের একটা অচল মলট গাবুর। এরিস্টটলের মত এত্তড়া (এত বড়) গ্রীক দার্শনিকের নাম হুনেন ন। ডেমোক্র্যাসি শব্দটা যে গ্রীক ডেমস অইতে আইছে এই কতাও জানেন ন, কি কচুর সম্পাদকী কইরছেন বিশ না বাইশ বছর ?" "আইচ্ছা, এরিস্টটল অমুকের হুত্রে (পুত্রকে) নয় চিনলাম আমনের দৌলতে, কিন্তু হেই বেডার (ওর) মতলবটা কি আছিল কন ত ? হেতে কি ধরনের গরমেন্ট গ্রীসের শহরডা রাষ্ট্র অগলে (city states) কইরত চাইছিল ?" "He had in mind a Government of aristocracy and meritocracy." "Meritocracy ? আঃ, শব্দটা কি সোন্দর হুইনতে। এই ধরনের গরমেন্ট যদি আজো বাংলাদেশে অয় ত আমনে ত তার ফ্রদান মন্ত্রী নিচ্চই অইবেন। হেই বিষয়ে কোন mother's son-এর আফত্তি থাকা ত উচিত নয়। কিন্তু সালাম ভাই এই রকম গরমেন্ট ত অইতে ফারে ন।" "কেন ?" "আমনেই ত কইলেন আমনের ইনটেলেক্ট্ এপ্রেসিয়েট করার মত লোক কম বলিই ত দেশের এই দুরবস্থা।" "আরে মিয়া বুইঝলেন না, আঁই গরমেন্ট ফর্ম কইরলে দেশের লোকে এপ্রেসিয়েট কইরল কি না কইরল তাতে আঁর কি কেলাটা আইব-যাইব।" "ও সালাম ভাই, আমনে দেইয়ের জাতে মাতাল তালে ঠিক।" সালাম ভাই একগাল হেসে বললেন, "আপনার যেমন সব দুনিয়া ছাড়া ফ্রশ্ন, আমারও তেমন জবাব।" "এরিস্টটলের নিদান দেয়া গরমেন্ট meritocracy'র ফ্রশ্ন বাদ দিলেও ত অইত ফারে না।" "কেন ?" "এদেশে শক্ত হাড্ডি-ওয়ালা এরিস্টক্র্যাটের সংখ্যা ত এক ডজনও অইব না। ধান-মণ্ডি, গুলশান এ ধরনের এলাকার বাসিন্দাদের গায়েত এখনও মাটির গন্ধ যায় ন। বর্তমানে বোন চায়নার ফ্লেট এস্তেমাল কইরলেও হ্যাতাগো অধিকাংশই দশ-বিশ বছর আগে এনামেলের বাসনেই ভাত খাইত, লাঞ্চ-ডিনারের ঘন্টি হ্যাতাগো বাড়ীতে তখন বাইজত ন। সুতরাং শরিফদের সরকার এদেশে অইব ক্যামনে ?" "তাও ত কতা। না হোক। আমনের এই সব ব্যাফারে আৎকা (হঠাৎ) এত কুরকুরি (চুলকানি) উইটল কিল্লাই কন ত ? Let aristocracy

www.pathagar.com

and meritocracy go to blares. এখন আমনে টেলিফোনটা ছাইড়বেন?" "ও সালাম ভাই আমনে ডেমোক্র্যাসিতে বিশ্বাস করেন?" "What the bloody hell do you mean? I have been an ardent believer in democracy all my life. I have gone through hell for believing in democracy and opposing authoritarianism. How dare you ask me such a stupid question?" "সালাম ভাই, বুকে হাত রাই (রেখে) কন গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি? পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ত আঙ্গো দেশে ইংরাজের আমদানী। ১৯১৯ সালের মন্টেগো চেম্‌সফোর্ড রিফর্মসের ফর দফায় দফায় গণতন্ত্র চালু করি ১৯৪৭ সালের ফরের থাকিত আমরা ফুর্ণ গণতন্ত্র বেশ ক'বার ফরীক্ষা-নিরীক্ষা কইরলাম। এমনই আঙ্গো কফাল যে, ফ্রত্যেকবার গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ফর একটা না একটা উল্টা কিছু হয়। আমনের মত বুজুর্গ লোকের কাছে এইবার কিছু একটা দিশা চাইয়ের। বেশ কিছুক্ষণ ইংরেজীতে যাকে বলে pregnant silence-এর পর সালাম ভাই আশাহত কন্ঠে জবাব দিলেন, "The liberal democracy of the nineteenth century in which I believed with all my heart seems unsuitable to human nature. The whole bloody world seems to have gone mad, raving mad, Zahur." সালাম ভাই টেলিফোন রেখে দিলেন।

আমার এক সম্মানিত (আর্থিক কারণে নয়) বন্ধু আছেন যিনি কোনদিন রাজনীতি করেননি, কিন্তু ভাল পড়াশুনা আছে। তাঁকেও আমি কয়েকদিন আগে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। তিনি বললেন, "রাজনৈতিক সরকার গঠিত হতে পারে; কিন্তু রাজনৈতিক সরকার ও গণতান্ত্রিক সরকার কি এক বস্তু? এদেশের কোন রাজনৈতিক দলেরই নেতা ও কর্মীদের ব্যক্তিগত, সামাজিক আচরণে, তাঁদের অফিসের কর্মচারী, পরিচারকদের সঙ্গে ব্যবহারে দুনিয়াময় স্বীকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কোন নিদর্শন আজও দেখা যাচ্ছে কি? সুতরাং গণতন্ত্রের মোয়াটা কি টুপ করে আকাশ থেকে আপনাদের হাতে এসে পড়বে? নির্বাচন মানেই কি গণতন্ত্র? নির্বাচন কি এদেশে কম হয়েছে?" জবাব দিলাম, "কিন্তু নির্বাচন গণতন্ত্রের

www.pathagar.com

পূর্বশর্ত।" "একেই বলে চিন্তার দেউলিয়াত্ব কিম্বা সচেতন ধাপ্পা। নির্বাচনের পূর্বে গণতন্ত্রের মূল্যবোধগুলোর আন্তরিক উপলব্ধি ও ঈমানের সঙ্গে স্বীকৃতি প্রয়োজন। আগে তার বন্দোবস্ত করুন।" "সেটা কি হুকুম দিয়ে করা যায়?" "না। আমারও বক্তব্য তাই। তাছাড়া গণতন্ত্রের ডেফিনিশন নিয়েও নানা প্রশ্ন আছে। সেগুলোরও ন্যূনতম মীমাংসা প্রয়োজন।" "সময় যে এদিকে বয়ে যায়। আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে সমাধানের অপেক্ষা করছে।" "উপায় নেই। জোর করে, তাড়াহুড়ো করে কিছু করবার চেষ্টা করলে কোন প্রশ্নেরই মীমাংসা হবে না। মাথাটা পরিষ্কার করেন, ঈমানটা ঠিক করেন, দু'চারজন লোক এটা করলেই গুণগুলো সংক্রমিত হবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি আশাতীতরূপে দ্রুতই হবে। আপনার এ সম্বন্ধে মত কি?" জবাব দিলাম, "আর একদিন বলা যাবে।" আমার এ বন্ধু ও সালাম ভাইয়ের বক্তব্যের খেই ধরে আর একদিন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আমি সালাম ভাইকে জানিয়ে দিয়েছি, আমাদের এ কথোপকথন দরবারে ছেপে দেব। তিনি বলেছেন, "If you do it, I will sue you for slander." সালাম ভাই সাধারণতঃ চোস্ত ইংরেজীতেই বাক্যবাণ ছুড়ে থাকেন। জবাব দিয়েছি, "সম্পাদকী করার শাস্তি হিসাবে বেশ কয়েকবারই মানহানির মোকদ্দমায় আসামী অইতে অইছে। এখন আর সম্পাদক নই। আল্লায় বাঁচাইছেন। ত যদি আমনের কারণে আসামী অইতে অয় অমু। তবে আমনেরতনও এক বুজুর্গ লোকে কইছে মানহানির মোকদ্দমা যে বেকুবে করে তার আছে মানটুকুও চলি যায়।"

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।

www.pathagar.com

১৭

একটা কথা বহুদিন ধরেই বন্ধু-বান্ধব পরিচিতিজনকে আলাপে-আলোচনায় বলে আসছি যে, আমাদের রাজনৈতিক জীবনের সমস্যা প্রধানতঃ দু'টি--স্ববিরোধিতা এবং যেসব রাজনৈতিক আদর্শের কথা আমরা জোর গলায় প্রচার করে থাকি সেগুলোর ঐতিহাসিক, দার্শনিক পটভূমিকা সম্বন্ধে অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর অজ্ঞতা। সব রকমের মত ও পথের রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের কাছে থেকে দেখার ফলেই একান্ত বেদনার সঙ্গে উপরোক্ত কথাটা আমাকে বলতে হয়। এ উপলব্ধি নিশ্চয়ই আমার একার নয়। অবশ্য কেবল রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়, আজ আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে উপরোক্ত দু'টি গুণ জেঁকে বসে সমগ্র সমাজদেহটাকেই বিষাক্ত করে তুলেছে। একজন ব্যবসায়ী বা অফিসার অসাধু বা অমানুষ হলে তাতে ক্ষতি নিশ্চয়ই হয়; কিন্তু একজন ডাক্তার যদি অমানুষ বা অজ্ঞ হয় রোগীর প্রাণ হারাবার রীতিমত আশঙ্কা থাকে। তেমনি রাজনীতি ক্ষেত্রে যদি বিঘোষিত আদর্শগুলো সম্বন্ধে অসাধুতা অর্থাৎ স্ববিরোধিতা আর অজ্ঞতাই নেতা ও কর্মীদের অধিকাংশেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয় তবে তা সমগ্র জাতির পক্ষেই পরম অকল্যাণকর হয়। আমরাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আমাদের বেশ কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় নেতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নীতিবোধের অভাবের পরিচয় যে বারবার দিয়েছেন এটা মোটেই গোপন ব্যাপার নয়। একজনের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা একটা তামাসার ব্যাপার হিসেবে নিয়েছি। কেবল তিনি যখন পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেন তখনই তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রয়োগ করে তাঁর মাঠে-ময়দানে নামা অসম্ভব করে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের ঐরূপ চমকপ্রদ সামগ্রিক বিজয়কে সম্ভব করা হয়। লীগপন্থী সংবাদপত্রে তাঁকে "কওমী

www.pathagar.com

গান্দার" ও আরও নানা বিশেষণে ভূষিত করা হয়। আমি শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেবকেই যে বুঝাচ্ছি একথা বুঝতে কারও কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

'বাংলার কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর অবদান এবং সর্বোপরি তাঁর সিংহ-হৃদয়ের খ্যাতি শেরে বাংলার চরিত্রের সকল দুর্বলতাকে ঢেকে দিয়েছে। পাকিস্তান হওয়ার পর সরকারবিরোধী নেতা হিসেবে জনাব সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর সহযোগিতায় এদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

কায়েদে আজম জিন্নাহ মুসলিম লীগের সর্বময় নেতা হওয়ার পর এ প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক পরিবেশও নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এই জিন্নাহ্ সাহেবই কায়েদে আজম হওয়ার পূর্বে একবার অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আমি সর্বশক্তি নিয়ে আপনার বিরোধিতা করব, কিন্তু প্রয়োজন হলে আপনার মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবন দেব।" ("I will oppose you with all my might, but if necessary I will give my life for your right to express your opinion freely.") এর আগের দিনের দরবারে যে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের (liberal democracy) জন্য সালাম ভাইয়ের আক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছি জিন্নাহ সাহেবের উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি তারই মর্মবাণী। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মতবিরোধিতার কারণে কায়েদে আজম জিন্নাহ্ সাহেব শেরে বাংলাকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করে দিয়ে ঘোষণা করেন ঃ Fazlul Haque is finished forever "ফজলুল হককে চিরকালের জন্য খতম করে দেওয়া হল।" উল্লেখ করা প্রয়োজন করে না যে, তাঁর এ কথাটা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর এক যুগেরও বেশীকাল হক সাহেব বেঁচে ছিলেন এবং ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে 'পদ্মা-মেঘনা দিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন' (তাঁর নিজের কথায়)। কায়েদে আজমের গণতন্ত্র সম্বন্ধে কতটা জ্ঞান ও উপলব্ধি ছিল তার কোন হাতে-কলমে প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ, একজন রাজনৈতিক নেতার চিন্তাধারার সত্যিকার সাক্ষ্য বহন করে তাঁর রাজনৈতিক লেখা অর্থাৎ বই বা প্রবন্ধ, বক্তৃতা নয়। বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলীর উপস্থিতি বক্তার বক্তব্যকে কিছুটা

www.pathagar.com

হলেও এদিক ওদিক করতে বাধ্য। জিন্নাহ্ সাহেব সারা জীবনে কোন বই, এমনকি পাকিস্তানের আদর্শকে ব্যাখ্যা করেও কিছু লিখে যাননি। তাঁর বক্তৃতার একটি সংকলন আমার সামনেই রয়েছে। আমার পক্ষে বলা বেয়াদবি হলেও আমি বলব যে, এটার পাতা উল্টিয়ে আমি গণতান্ত্রিক বা ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে কোন গভীর চিন্তার বিশেষ নিদর্শন খুঁজে পাই না। তিনি নিজে কোন আত্ম-জীবনী লিখে যাননি। তাঁর একটা প্রামাণ্য জীবনী লেখার জন্য হেক-টর বলিথো নামীয় এক ইংরেজ সাহেবকে পরে প্রচুর টাকা দিয়ে পাকিস্তান সরকার ভাড়া করেছিলেন। তাঁর লেখা বইটিও আমার সামনেই রয়েছে। আমি জীবনে যত জীবনী পড়েছি এমন নিষ্প্রাণ কোন জীবনী আর পড়িনি। কায়েদে আজমের যেটুকু গণতন্ত্রবোধ ছিল নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের তাও ছিল না। তিনি নিজেকে প্রাক-ইসলাম ইরানের সম্রাট নওশেরোঁয়ার বংশধর বলে প্রচার করে পাকিস্তানে নিজ বংশের রাজত্ব স্থাপন করার পরিকল্পনা আঁটছেন, একথা তাঁর আমলে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে আলোচিত হতে শুনেছি। তাঁর মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে যাদের ষড়যন্ত্রের ফলে, তারাই ক্ষমতাসীন বলে করাচীর 'ডন' পত্রিকা বেশ কিছুদিন রীতিমত স্বল্প প্রচ্ছন্ন ছবি ছেপে প্রচার করেছিল। বেগম লিয়াকত আলী রাষ্ট্র-দূতের চাকরি গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত স্বামীর প্রকাশ্য জনসভায় দিবা-লোকে হত্যার নায়কদের গ্রেফতার ও বিচারের ব্যর্থ দাবী করে গেছেন। লিয়াকত আলীর পর যে ক'জনই পাকিস্তানে ক্ষমতা পরি-চালনা করেছেন, তাঁরা আর যাই ছিলেন না কেন, গণতন্ত্রের কোন ধ্যান-ধারণা যে তাঁদের ছিল, এমন অপবাদ তাঁদের শত্রুরাও দিতে পারবেন না। নাজিমুদ্দিন সাহেবকে একেবারে বেআইনীভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে গোলাম মোহাম্মদ যখন বগুড়ার জনাব মোহাম্মদ আলী চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রী করেন তখন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির একটা ডেপুটেশন তাঁর কাছে গিয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আবেদন জানালে তিনি জবাব দেন, "কায়েদে আজমের কাছে আপনারা গণতন্ত্র চাননি, কায়েদে মিল্লাতের কাছে চাননি, আমি কি অপরাধ করেছি যে, আপনারা আমার কাছে এটা চাচ্ছেন?" এ ঘটনাটা বোধহয় আমি আমার আগের কোন লেখায় উল্লেখ করেছি। মরহুম মোহাম্মদ আলী রসিকতাপ্রিয় ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি রসিকতা

www.pathagar.com

করে বললেও মুসলিম লীগ রাজনীতির ওপর তাঁর কথাটি সার্চলাইটের আলোকরশ্মির সম্পাত করে। কাহিনীটা আমি উপরোক্ত ডেপুটেশনের জনৈক সদস্যের কাছেই শুনেছি। নাজিমুদ্দিন সাহেবও ভাল মানুষ এবং একজন প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক যে ছিলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তা আমি জানি। কিন্তু তিনি ইংরেজ জামানাতেও বিশ্বাস করতেন যে, পুলিশ "ঝুট নেহি বোলতা" এবং "জুলুম নেহি করতা"। কারণ, "ঝুট বোলনা আওর জুলুম করনা আইনকি খেলাফ হ্যায়"। এরূপ সরলতার দৃষ্টান্ত রাজনীতিতে বিরল এবং নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক যে ছিল না একথা যেকোন অরাজনৈতিক লোকও স্বীকার করবেন। তাঁর আর একটি দুর্বলতা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর আপ্তার ম্যাট্রিক ভাই খাজা শাহাবুদ্দিনের মত যোগ্য ব্যক্তি খুব কম আছেন এবং তিনি তাঁকে অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ প্রজা পার্টির পার্লামেন্টারী কোয়ালিশন দলের চীফ হুইপ বানিয়েছিলেন। এই চীফ হুইপ-এর কাজ তিনি পরম যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেন এবং প্রধানতঃ তারই কর্মকুশলতায় জনাব ফজলুল হক সাহেবের মুসলিম লীগে যোগদানের পর যে কোয়ালিশনের অন্যতম প্রধান অঙ্গদল তাঁর নিজস্ব কৃষক প্রজা পার্টি তা থেকে তিনি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং কৃষক প্রজা পার্টি প্রায় লাটে ওঠে। এসব কথা জনাব আবুল মনসুর আহমদ এবং সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না ভাই) আশা করি ভাল করে জানেন। এ ব্যাপারটি অবিভক্ত বাংলার মুসলিম রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল এবং এসব পুরনো ব্যাপার আলোচনা করছি আমাদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পটভূমিকা সম্বন্ধে বর্তমান জেনারেশনকে একটু অবহিত করার প্রয়োজনে।

পাকিস্তানে জনাব সোহরাওয়ার্দী একবার বলেছিলেন, "এদেশে গণতন্ত্রকে কোন সুযোগই দেওয়া হয়নি," "Democracy has never been given a chance in this country." আমার মনে আছে সে সময়ে 'সংবাদ'-এ লেখা হয়েছিল "গণতন্ত্র কেউ কাউকে দান হিসাবে দেয় না, গণতন্ত্র সংগ্রাম করে পেতে হয়।" আমার বক্তব্য এই যে, ভারত বিভাগের পূর্বে ইংরেজের তত্ত্বাবধানে একটা আইনের শাসন ও সীমিত আপাত-গণতান্ত্রিক পরিবেশ যে ছিল পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সেটা উবে যেতে শুরু হয় এবং বাংলাদেশ হওয়ার পর

www.pathagar.com

যে সেটা একেবারে অন্তর্হিত হয় তার পরিষ্কার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা বর্তমান ছিল। এই পটভূমিকাকে হিসেবে না ধরে, একে আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা না করে কেবল জোড়াতালি, কেবল শ্লোগানের মারফতে আমাদের জীবনে কোনদিন কোন ধরনের গণতন্ত্র আসবে না। আমার বক্তব্যটাকে আবার পরিষ্কার করে বলি—গণতন্ত্রের দর্শন ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমাদের নেতৃত্বের ও কর্মীদের অজ্ঞানতা কিম্বা জেনেশুনে পরিষ্কার অবজ্ঞা এদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বার বার ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

সালাম ভাই যে উদার গণতন্ত্রের (liberal democracy) সমর্থক বলে দাবী করেন তার জন্য ইংল্যাণ্ডেই কয়েক শ' বছর ধরে তীব্র, এমনকি রক্তাক্ত সংগ্রাম চলেছে; সে সংগ্রামকেও রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও ব্যক্তিগত ক্ষমতাভিলাষ কণ্টকিত করেছে। এই সংগ্রামেই রাজা প্রথম চার্লসকে সিংহাসনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিরও হারাতে হয়। আবার এই সংগ্রামের নেতা নাগরিক অলিভার ক্রমওয়েল জেনারেল ক্রমওয়েলে উন্নীত হয়ে শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নিজেই রাজা হয়ে পড়েন। অবশ্য সে পার্লামেন্ট জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক একেবারেই ছিল না এবং সেটাকে বলাই হত Rump (মেরুদণ্ডের শেষাংশ—পশ্চাদ্দেশের শুরু) Parliament অর্থাৎ ঠুঁটো পার্লামেন্ট। নিছক রাজনৈতিক গণতন্ত্র যে শেষ পর্যন্ত বিশেষ অর্থবহ নয় একথা ক্রমওয়েলী মধ্যযুগীয় বিপ্লবের সময়েও অজানা ছিল না। ক্রমওয়েল সাংঘাতিক গোঁড়া খৃস্টান (puritan) ছিলেন। তাঁর সেই পিউরিটান সেনাবাহিনীর একটি অংশের নাম ছিল লোলার্ডস (Lollards)। তাদের ফেস্টুনে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল, "The poorest he in England has a right to live as the richest he." অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তির ন্যায় সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তির বাঁচার অধিকার রয়েছে। অবশ্য এ অধিকার তখন তারা পায়নি, কিন্তু ঐ যুগেও কথাটা রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বের একাংশের মাথায় ঈমানদারির সঙ্গে ছিল! ক্রমওয়েল রাজবংশ স্থাপন করলেও তাঁর পুত্র বেশীদিন সিংহাসনে টিকতে পারেননি। প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস পিতৃসিংহাসন ফিরে পেলেন; কিন্তু ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের পক্ষছেদন ততদিন অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। তারপর বহু

www.pathagar.com

সংগ্রামের পর এবং উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে চার্টিস্টদের দীর্ঘকালব্যাপী তিক্ত সংগ্রামের পর ইংরেজ জনতা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তাদের রাজনৈতিক অধিকার পাকা করে এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রাথমিক অধিকার আদায়ের দ্বারা অর্থনৈতিক আজাদীর সংগ্রাম অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। ক্রমওয়েলের শাসনকাল গোঁড়া পিউরিটান ধর্মীয় আমল হলেও সে যুগে মিল্টন তাঁর মহাকাব্য 'প্যারাডাইজ লস্ট' লিখেছিলেন এবং এর নায়ক ছিল শয়তান। এর জন্য মিল্টনকে শূলে চড়তে হয়নি, এমনকি কোন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে কোন ফতোয়া জারি করা হয়েছে বলে আমি জানি না। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ক্রমওয়েলের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যে জায়গায় যুদ্ধ হয়েছিল সে জায়গাটা আমি দেখে এসেছি। কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে খাজা শাহাবুদ্দিনের ন্যায় কাউকে ধর্ম বা গণতন্ত্রের নামে নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। গণতান্ত্রিক জীবনদর্শন সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল নেতা ও কর্মী আন্দোলনে থাকার ফলেই এসব সম্ভব। পাকিস্তানে খাজা সাহেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছেন। তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ আমার হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ভদ্রতায় তাঁর জুড়ি নেই এবং তাঁর মত কুশাগ্রবুদ্ধি লোকও আমি কমই দেখেছি। বিভাগ-পূর্ব যুগেও তাঁর অঘটন-ঘটনপটিয়সী ক্ষমতা সম্বন্ধে কারও মনে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ সম্ভব হয়েছিল মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলেই। কেবল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নয়, এর দ্বারা ন্যূনতম সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতিও যে কদলী প্রদর্শন করা হয় তার ফসল কুড়ানো আজও শেষ হয়েছে কিনা অন্ততঃ আমার মনে সন্দেহ রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খাজা শাহাবুদ্দিন সাহেব যখন আইয়ুব সরকারের তথ্যমন্ত্রী তখনই 'ইত্তেফাক' অফিসে তালা লাগানো হয়, মানিক ভাই শেষবারের মত গ্রেফতার হন এবং তাঁর স্বাস্থ্যটা এমনভাবে ভেঙ্গে পড়ে যে, তা আর সারলই না।

এসব পুরনো কথা আলোচনা আজ অপ্রাসঙ্গিক, এমনকি অবাঞ্ছিতও মনে হতে পারে। কিন্তু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একটি সূত্রে যে গ্রথিত একথা ভুলে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে শুভ হবে না।

www.pathagar.com

কায়েদে আজম জিন্নাহ্ সাহেব এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে অচেতনতা বা সজ্ঞান অবহেলা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, আমাদের "গণতান্ত্রিক আন্দোলনের" নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধেও সে কথাগুলো একইরূপে প্রযোজ্য। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম বলতে তাঁরা বুঝেছেন ও বুঝিয়েছেন নির্বাচনের অনুষ্ঠান ও ক্ষমতায় যাওয়া। নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য তাঁরা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আইনের শাসন সম্বন্ধে ভাল ভাল কথা নির্বাচনী প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধেও ভাসা ভাসা অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পরেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিছক ক্ষমতায় যাওয়াই ছিল নির্বাচনের উদ্দেশ্য। এবং সে নির্বাচনে প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের অবিচার অর্থাৎ পশ্চিমা বিদ্বেষই ছিল মুসলিম লীগকে ঘায়েল করার প্রধান অস্ত্র। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হওয়ার পরই শহীদ সাহেব ঘোষণা করেছিলেন যে, করাচীর মারফতে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানকে শাসন করবে (East Pakistan will rule Pakistan through Karachi)। শহীদ সাহেবকে এ ব্যাপারে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। তিনি বরাবরই শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষপাতী ছিলেন। জিন্নাহ সাহেবের ডিক্‌টেটরী মেজাজ সহ্য করতে না পেরে তাঁকে তিনি কিছুটা এড়িয়ে চলায় অবিভক্ত ভারতের একমাত্র প্রাদেশিক সরকারের স্থিতিশীল মুসলিম লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, দেশ বিভাগের সময় অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কায়েদে আজম ও নওয়াবজাদা লিয়াকত আলীর প্রত্যক্ষ সমর্থনেই খাজা নাজিমুদ্দিন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। কেবল তাই নয়, পাকিস্তানের জন্মের পূর্ব মুহূর্ত থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বেলেঘাটা থেকে শুরু করে একটার পর একটা মুসলমান বস্তি বিলীন হয়ে যাওয়ার মুখে এবং মুসলমানদের ধন-প্রাণ যখন বিপন্ন তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেব দুর্গত মুসলমানদের পাশে থেকে সাহস যোগাবার জন্য কলকাতায় থেকে গেলেন। মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোর অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতৃবর্গকে নিজেদের মুসলিম জনতাকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ত

www.pathagar.com

আক্রোশের মধ্যে ফেলে রেখে একেবারে তড়িঘড়ি পাকিস্তানে এসে ক্ষমতার শরিক হওয়ার চেষ্টায় রত হতে দেখা যায়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তা না করায় এবং তাঁর ব্যক্তিত্বকে ভয় করায় তাঁর গণপরিষদের সদস্যপদ বাতিল করা হয় এবং পরে যখন তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন তখন তাঁর উপস্থিতি রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। এসব কথা আজ সুবিধাজনকভাবে অনেকেই ভুলে যাচ্ছেন। এ ঘটনার পরই জনাব সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে চলে আসেন এবং প্রথমে লাহোরেই আইন ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও জনাব সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের ঐক্যে, এমনকি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারেই বিশ্বাসী ছিলেন। নানাবিধ চাপের ফলেই তিনি একুশ দফা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবীর শতকরা আটানব্বই ভাগ অর্জিত হয়েছে।" কথাটা হয়ত রসিকতা ছিল; কিন্তু এতে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তা ঠিক গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠাবাচক নয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর আমাদের সকল দলের নেতৃবর্গের আচরণ, গোলাম মোহাম্মদ, ইস্কান্দার মীর্জার হাতে তাঁদের পুতুল নাচ প্রমাণ করে যে, গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধ দূরে থাকুক সাধারণ রীতিনীতির প্রতিও ন্যূনতম আনুগত্য দেখাবার ব্যাপারে তাঁদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। ক্ষমতার জন্য অশ্লীল আচরণেও তাঁরা পেছপাও হননি। এ সময় থেকেই ষড়যন্ত্রের রাজনীতি পাকিস্তানে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। এবং আমাদের 'গণতান্ত্রিক নেতৃবর্গ' সানন্দে এ ষড়যন্ত্রে শামিল হন। এমনকি বামপন্থী বলে কথিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও ইস্কান্দার মীর্জার যেটুকু গণতন্ত্রের অভিনয় চলছিল তাও শেষ করে দেবার ষড়যন্ত্রে শামিল যে হয় তা আমি প্রত্যক্ষভাবেই জানি।

শেরে বাংলা জনাব ফজলুল হক সাহেব ও জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা আমার কারও চাইতে কম নয়। যে সব লোকেরা জীবিতকালে তাঁদের কুৎসা গেয়ে এখন তাদের গুণ গেয়ে ফায়দা লুটার চেষ্টা করছেন আমি তাঁদের দলে নই। জনাব শহীদ সাহেবকে বহুবার আমি অনুনয় করেছি আমাকে ডিকটেশান

www.pathagar.com

দিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর একটি আত্মজীবনী লেখার জন্য। কিন্তু রাজী হয়েও কাজের চাপে পারেননি। একমাত্র শহীদ সাহেবের আমলেই এদেশের জেলগুলো রাজবন্দী শূন্য ছিল। এ দু'নেতারই একটি মহৎ গুণ ছিল তারা দু'জনের কেউই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন না। মানুষ হিসেবে তারা সত্যি সিংহ হৃদয় ছিলেন। অনগ্রসর মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়নে তাঁদের অবদানও অবিস্মরণীয়। তবু ব্যক্তিপূজা যে কেবল সমাজেরই ক্ষতি করে তা নয়, যাঁদের পূজা করা হয় তাঁদরও মর্যাদার হানি করা হয়। ফজলুল হক সাহেবের চরিত্রের কোন সংজ্ঞা দেওয়াই কঠিন ব্যাপার। বাংলাদেশের মুসলমান এবং হিন্দু জনতার মনে তাঁর যে স্থান রয়েছে তা কেউ টলাতে পারবে না কোনদিন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবও তাঁর বিভাগোত্তরকালের সংগ্রামী জীবনের দ্বারা আমাদের রাজনৈতিক জীবনে স্থায়ীভাবে একটি দুর্লঙ্ঘ্য শ্রদ্ধার আসন স্থায়ীভাবেই করে নিয়েছেন। তাঁদের বিরাট চরিত্রের যেসব অপূর্ণতার কথা উল্লেখ করলাম, সে গুলোর জন্য তারা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নন। ঐতিহাসিক কারণেই এসব অপূর্ণতা আরও তীব্র আকারে গোটা মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই বাসা বেঁধেছে।

আলোচনাটা এ কিস্তিতে আর দীর্ঘ করলে সংবাদ-এর এ পৃষ্ঠায় আর কিছু ছাপা যাবে না। আমার এ লেখা থেকে যদি কেউ মনে করেন যে, আমি গণতন্ত্র বিরোধী, ভুল করবেন। গণতন্ত্র আমার কাছে একটা জীবনধারা, জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার শ্লোগান নয়। জনতারূপ ন্যাড়ারা বারবার বেলতলায় কেন যাচ্ছে, এ হেয়ালিটার জবাব আমি আরও দু'একদিন ধরে দেয়ার চেষ্টা করব।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।

www.pathagar.com

১৮

সকাল-সন্ধ্যা কুয়াশা ঘেরা ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ ঘুরে আসলেই মনটা ভার হয়ে ওঠে, মনে পড়ে যায় আসামের কোহিমার উপকণ্ঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানীদের দ্বারা নিহত ব্রিটিশ সৈন্যদের একটি গণ-সমাধির উপর স্মৃতি ফলকটির উপরে লিখিত একটি লাইনের কথা—"Please remember, for your tomorrow, we gave our today." নামহীন ব্রিটিশ সৈন্যদের সমাধির উপরকার স্মৃতিফলকটির উপরে লিখিত এই কথাগুলোর আবেদন আমার মন থেকে গত ত্রিশ বছরেও মুছে যায়নি। আমি জানতাম গত মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদ যদি জয়ী হতো তবে দুনিয়ায় কি নিশ্ছিদ্র আঁধার রাত্রি বেশ কয়েক যুগের জন্য নেমে আসত। ক্রমে এ কথাগুলোর আবেদন কমে এসেছিল। ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে মিত্রপক্ষের জয় হলেও দুনিয়ার মানুষের ঈপ্সিত সেই শান্তি ও মানবাধিকারের সার্বজনীন স্বীকৃতি মরীচিকাই রয়ে গেল। নতুন নতুন সংঘাত দুনিয়ার মানুষকে আবার পীড়িত করে তুলল। তবু ফ্যাসিবাদ পরাজিত হওয়ার ফলে দুনিয়ার একটি বৃহৎ অঞ্চলের মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আজাদীর আস্বাদ পায়। আণবিক বোমা মানুষকে বিপন্ন করে তোলা সত্ত্বেও মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আজাদীর সংগ্রাম আজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সাম্রাজ্যবাদ এখানে-সেখানে স্বনামে-বেনামে হিংস্র আক্রমণ এখনও করে যাচ্ছে মানুষকে শৃঙ্খলিত রাখার জন্য। তাদের পক্ষপুটাশ্রিত উপনিবেশবাদ ও দেশীয় কায়েমী স্বার্থ সর্বশক্তি নিয়ে এবং অমানুষিক বর্বরতার সঙ্গে নিজ নিজ ক্ষেত্রে জনতাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সাময়িক সাফল্যও অর্জন করছে। কিন্তু সমসাময়িককালের ইতিহাসের গতিধারা একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য যাঁরাই করে গেছে তাঁদের কাছেও একথা পরিষ্কার যে, দুনিয়াটা যদি আণবিক যুদ্ধে উড়ে না যায় তবে এর কোন অঞ্চলেরই গণ-মানুষকে

www.pathagar.com

তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা দেশী-বিদেশী কোন কায়েমী স্বার্থের পক্ষেই আর বেশী দিন সম্ভব নয়। এবং এটা সম্ভব হয়েছে ফ্যাসি বিরোধী সংগ্রামে তিন কোটিরও বেশী মানুষের আত্মবলিদানে। এখানেই "তোমাদের আগামীকালের জন্য আমি আমার আজকে উৎসর্গ দিলাম" কথাটার সার্থকতা।

ঐ নাম না-জানা ব্রিটিশ সৈন্যদের সমাধির স্মৃতিফলকে লেখা এই লাইনটির সার্থকতার কথা আমার ১৯৭১ সালের আগেও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে। কিন্তু ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ থেকে ডিসেম্বরের ষোল তারিখের পর ঐ লাইনটির আবেদন আরও ব্যক্তিগত আরও বেদনাদায়কভাবে অনুভব করি। কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কোহিমা রণাঙ্গনে নিহত ব্রিটিশ সৈন্যগণ আমার ধারে-কাছের লোক ছিলেন না, তাদের সঙ্গে একটা আদর্শগত মিল ছিল। কিন্তু পঁচিশে মার্চ মধ্য-রাত্রির পূর্ব থেকে ১৬ই মার্চ সকাল পর্যন্ত যে পাইকারী নরহত্যা চলে তার শিকার যারা হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আমার অন্ত-রঙ্গভাবে পরিচিত ছিলেন। দু'চার জনের সঙ্গে এমন সম্পর্ক ছিল যা বুঝিয়ে বলা আমার সাধ্যে কুলাবে না। আর যাঁরা ছিলেন একে-বারেই অজানা, যাঁদের লাশ বাংলাদেশের খাল-বিল-নদীর পানিতে দিনের পর দিন ভেসেছে, পড়ে রয়েছে মাঠে-ঘাটে, ঝোপে-ঝাড়ে কিম্বা বাসিন্দাহীন দালান ও পর্ণ কুটিরের কামরায় জমাট বাঁধা রক্তের মধ্যে; তাদের সঙ্গেও আমার রয়েছে বহু শতাব্দীর অবিচ্ছেদ্য রক্তের বন্ধন। সুতরাং ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর—এ সময়ের মধ্যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের সমর্থকদের হাতে যারা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের ব্যাপারে "তোমাদের আগামীকালের জন্য আমি আমার আজকে উৎসর্গ দিলাম"—একথাটির আবেদন স্বাভাবিক-ভাবেই গত পাঁচ বছর ধরে আরও তীব্রভাবে অনুভব করছি।

খবরের কাগজে দেখলাম, গত ৮ই থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এক সপ্তাহ বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডের জন্য শোক পালনের আহবান জানান হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই এটা করে আসা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে আমার মনে প্রথম থেকেই একটা প্রশ্ন রয়েছে। আড়াই যুগব্যাপী আমা-দের স্বাধীনতা সংগ্রামে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অবদানকে বিন্দুমাত্র খাটো না করেও আমি বলব, '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে বা এর পূর্বেও আমাদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে যে অসংখ্য কৃষক,

www.pathagar.com

শ্রমিক, ছা-পোষা মধ্যবিত্ত সন্তান আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের থেকে বুদ্ধিজীবীদের আলাদা করে দেখাটা উচিত নয়। বুদ্ধিজীবীরা এসব আন্দোলনে নৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। একারণেই ২৫শে মার্চের দু'দিন পূর্বে হেলিকপ্টারে ঢাকা পর্যবেক্ষণ করার সময় জল্লাদ জেনারেল টিক্কা খান ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকা সঙ্গের সামরিক অফিসারদের দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "ঐ সাপের বাসাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে।" তাঁর সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছিল। ২৫শে মার্চের ভয়াল রাত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক ফ্লাট ও বাড়ীগুলো এবং ছাত্রাবাসগুলো রক্তে ভেসে গিয়েছিল। ঐ বছরেরই ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরাজয় প্রত্যাসন্ন জেনে পাক বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা বাংলাদেশকে বুদ্ধিজীবীশূন্য করে মন ও চিন্তায় পঙ্গু করে দেয়ার জন্য এক বিরাট তালিকা প্রণয়ন করে এবং সেই তালিকা অনুযায়ী হত্যাকাণ্ড শুরু করে। কিন্তু তালিকাটি শেষ করার পূর্বেই তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়। কিন্তু ঐ পঁচিশে মার্চ তারিখে ঢাকার অন্যান্য স্থানেও শত শত নিরীহ নাগরিক, এমনকি ফুটপাথে নিদ্রিত ভিখারীরা পর্যন্ত পাশবিকভাবে নিহত হল। এটা ত হল শুরু। পরবর্তী নয় মাস ধরে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শহর বন্দর গ্রামে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হল আরও নিষ্ঠুরভাবে। বুদ্ধিজীবীদের রক্ত শ্রমজীবী মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে আমার মতে শুচিশুদ্ধ হল। এর আগে তিন যুগ ধরে এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরই বৃহৎ অংশ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের তাগিদে কায়েমী স্বার্থের পদলেহন করেছে, বারবার জনতাকে কিভাবে বিভ্রান্ত করেছে তা আমি বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করে গেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে এর একটা অংশ মীরজাফরের ভূমিকা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু "পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা" এই প্রাণমাতানো ধ্বনি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিপুল অংশকে আন্দোলনের আবর্তে টেনে নেয় এবং নিজেদের সহজাত ক্ষমতায় এ আন্দোলনের পুরোভাগে তাঁরা এসে যান। অবশ্য এঁদের একটা অংশ বহু পূর্বেই জনতার কাতারে এসে গিয়েছিলেন। শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন এঁদেরই একজন। একাত্তুরের স্বাধীনতা সংগ্রাম বুদ্ধিজীবী ও জনতার মধ্যে রক্তের যে রাখীবন্ধন রচনা করে তার প্রতি সম্মান

www.pathagar.com

প্রদর্শনের জন্যই আমি মনে করি বুদ্ধিজীবীদের জন্য আলাদা করে কোন শোকানুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। এই রাখীবন্ধনের ফলে বুদ্ধিজীবীরা জাতে উঠেছিলেন। নামেননি, একথা বলা একেবারেই বাহুল্য। সকল দেশের সকল যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে লিখে গেছেন,

"বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে আমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার—
সে আমারে কে চিনেছ মর্তকায়ায়?
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।"

১৯৭১-এর বুদ্ধিজীবীরা অসংখ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে শহীদ হয়ে ভাষাহারাদের সাথে যে মিল স্থাপন করেছেন তার পটভূমিকায় তাঁদের জন্য শোক প্রকাশের আয়োজন করা আমার কাছে কেমন যেন ঠেকে। সমাজে এঁদের প্রতিষ্ঠা ছিল বলেই এই বিশেষভাবে চিহ্নিত শোক সপ্তাহের আয়োজন। আমি জানি, এ কথাটা সকলের কানেই অত্যন্ত রূঢ় এমনকি বেয়াদবি বলেও মনে হতে পারে। আমি মাপ চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু যে কৃষকবধূটি তার স্বামীকে মুক্তিযুদ্ধে হারিয়েছে, যে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের বিধবা বৌটি তার একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছে, খবরের কাগজে ঐ শোক সপ্তাহের খবর দেখে তার মনের অবস্থাটা একটু চিন্তা করুন না! একমাত্র শোকেরই বোধ হয় কোন শ্রেণীভেদ নেই। অথচ আমরা তাও করছি। পৃথিবীর অন্য দেশে যুদ্ধে নিহত সকল সৈনিক এবং নাগরিকের একটা সাধারণ স্মৃতিস্তম্ভ করে বছরে একদিন একটা ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান করে নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সারা বছর ধরে দেশের মানুষ সে স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে যায় ও শহীদদের স্মরণ করে। আমাদের এখানে যে শোক সপ্তাহ পালন করা হয় তাতে দেশের সাধারণ মানুষ যাঁরা একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের উল্লেখ ত নেইই, এমনকি ২৫শে মার্চ বা অন্য তারিখে যেসব বুদ্ধিজীবী প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের উল্লেখও নেই।

www.pathagar.com

আমার মনে হয় সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে শহরের যে কোন উপযুক্ত স্থানে স্বাধীনতাযুদ্ধে শ্রেণীনির্বিশেষে সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটা অনাড়ম্বর অথচ মনকে স্পর্শ করে এমন একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করে বছরে একদিন একটা সুশৃঙ্খল শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যবস্থা করা উচিত। আমি আমাদের শোকানুষ্ঠানগুলোর মেকিত্ব সম্বন্ধে একটু অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর হয়ে পড়ছি। শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের স্মৃতিরক্ষার কোন স্থায়ী বন্দোবস্তের ধারেকাছে না যেয়েও এমনকি একটা প্রামাণ্য সুখপাঠ্য জীবনীও না লিখে বছরে একবার করে তাঁদের স্মৃতিসভা করে এমন অনেকে রাজনৈতিক ফায়দা এখন ওঠাবার চেষ্টা করছেন যারা তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের চরিত্রকে জঘন্যভাবে মসীলিপ্ত করেছেন। মওলানা ভাসানীর লাশ দাফন হওয়ার পূর্বেই তাঁকে নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা রুচিহীনভাবে শুরু হয়েছিল, এ ত দু'দিন আগের ঘটনা। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের শোক পালনের ব্যাপারেও আন্তরিকতার ক্রমাবনতি আমাকে পীড়িত করছে। তাছাড়া তাঁদের বেশ কয়েকজনের পরিবারবর্গের প্রতি সমাজ ও আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারের এমন সব কাহিনী জানার দুর্ভাগ্য হয়েছে যে, মাথা হেঁট হয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে রাজশাহীর নীহার বানুর হত্যাকাণ্ডটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি আলাদাভাবে স্মরণ করার বা তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আমি একেবারে বিরোধী নই। তাঁদের প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব, কর্মক্ষেত্রের সহযোগীরা ও অনুরাগীরা নিশ্চয়ই যে যেমনভাবে পারেন তাঁদের মৃত্যুদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করবেন। এ ব্যাপারে নিরুৎসাহ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে এদেশের মেহনতি মানুষের সঙ্গে তাঁদের যে আক্ষরিক অর্থে রক্তের রাখীবন্ধন রচিত হয়েছে একথাটা আমাদের মনে তেমনভাবে নেই, এখানেই আমার আপত্তি। অথচ এঁদেরও অনেকেরই মৃত্যুর তারিখ-ঘন্টা-ক্ষণ এমনকি স্থানও আমাদের জানা নেই। বাংলার অগণিত সাধারণ মানুষের লাশের যেমন হদিস পাওয়া যায়নি, তাঁদের লাশও তেমনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। আমরা শুধু জানি, তাঁরা আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছেন—ঘাতকের দল ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমার কেবল আরজ, শোক প্রকাশ যেন প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত না হয়—যার লক্ষণ আমি দেখতে

www.pathagar.com

পাচ্ছি। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ প্রতিটি মানুষের স্মৃতির প্রতি জাতীয় পর্যায়ে প্রাণঢালা শ্রদ্ধা নিবেদনের একটা ব্যবস্থা হোক। শহীদ বুদ্ধিজীবী এবং শহীদ মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ আত্মবিসর্জনই আমাদের স্বাধীনতাকে সম্ভব করেছে এ মৌলিক সত্যটা যেন আমরা ভুলে না যাই। শহীদ বদ্ধিজীবীদের আত্মা এতে তৃপ্ত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

শহীদ বদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে কারও কারও মনে আজ একটা প্রশ্ন জেগেছে, "তাঁদের আত্মবলিদান কি সার্থক হয়েছে?" স্বাধীনতার বছর দু'য়েক পরেই একজন বুদ্ধিজীবী প্রেসক্লাবে বসে মন্তব্য করেছেন বলে শুনেছি, "ভাগ্যিস ঠিক সময়মত কলকাতায় পালিয়ে যেতে পেরেছিলাম, নতুবা প্রাণটা শহীদুল্লা কায়সারদের মত নিরর্থকই যেত।" বস্তুতঃ এ ধরনের বিকৃতি ও অনাচার আমাদের স্বাধীনতার উষালগ্নকেই গ্লানিময় করে তোলে। নয়টি মাসের অবিরাম রক্তস্রোতের যে ধারা এবার বন্ধ হবে বলে দেশের অবসন্ন-মন মানুষ সমগ্র সত্তা দিয়ে আশা করেছিল তা বন্ধ না হয়ে নতুন এবং এক হিসেবে আরও মর্মান্তিক খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করল। এবং এবার বাঙালীর বুকে বাঙালীই। মুক্তিযুদ্ধে সহযোদ্ধারা একে অপরের বুকে ছুরি হানতে শুরু করল। চারিত্রিক অধঃপতনের সামগ্রিকতায় এবং পৈশাচিকতায় বাঙালী এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করল। রাজনৈতিক কারণে আমরা নারী-পুরুষ-দুগ্ধপোষ্য শিশুসমেত পরিবারকে পরিবার বুলেটের দ্বারা নিশ্চিহ্ন করার ট্রাডিশন সগৌরবে স্থাপন করেছি। আর কত হাজার রাজনৈতিক কর্মী হত্যা ও পাল্টা হত্যার শিকার হয়েছে তা চিন্তা করলেও মাথা ঘুরে যায়। দুর্নীতির ব্যাপারেও আমরা প্রায় বিশ্বজোড়া রেকর্ডই স্থাপন করেছি। আমাদের চোখের সামনে ঢাকার রাজপথে অনাহারে মৃত মানুষের শবদেহের সমাহার দেখেছি। অর্ধ-উলঙ্গ মা-বোনদের দিকে তাকাতে না পেরে আমাদের চোখ বুঁজে থাকতে হয়েছে। এসব সত্যি। এসবই অন্য সকলের ন্যায় আমিও জানি। তবে আমি এর জন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষকে দায়ী করি না।

"ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি?
মাথা কর নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।"

www.pathagar.com

নিরুত্তাপ মনে চিন্তা করলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্রের দুর্বলতা ও স্বাধীনতার পর সবক্ষেত্রেই যে অভাবনীয় সুযোগ আসে তাতে সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে মানবিকতাটাই খুইয়ে এ বিপর্যয় তারা ডেকে এনেছে। তাহলে এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, স্বাধীনতাযুদ্ধে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের সে আত্মদান নিরর্থক হয়েছে? এই কথা থেকে আর এক পা এগুলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে যে, আমাদের স্বাধীনতাই নিরর্থক প্রমাণিত হয়েছে। আমার বুদ্ধি ও সত্তা দিয়ে একথা আমি মানতে পারি না। কঠিন সঙ্কটের মধ্যেও নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়া যুক্তিসম্মত নয়। নৈরাশ্যের কাছে পাকাপাকিভাবে আত্মসমর্পণ করার অপর নাম মনের দিক দিয়ে মৃত্যু। ইতিহাসের গতিধারার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনি স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অবস্থা দেখে একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন যে সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিকায় সৃষ্টি হয়েছে. দানা বেঁধেছে, অগ্রসর হয়ে সফল হয়েছে তাতে স্বাধীনতা-উত্তর যুগের পরিস্থিতি একেবারে অস্বাভাবিক বলা যায় না। এই পরিস্থিতিতে আশাভঙ্গের বেদনা কারও চাইতে আমার মনে কম বাজেনি। কিন্তু তবুও আমি এর মধ্যেই আশাবাদকে জিইয়ে রেখেছি। ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক প্রস্তুতি ছিল বহুদিনের এবং রুশো-ভলটেয়ার-মনেস্কু-ডিডেরোর ন্যায় চমকপ্রদ সব প্রতিভার নেতৃত্বে। এর রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে জেকোবিনদের ন্যায় আদর্শনিষ্ঠ এবং যুদ্ধংদেহিভাবে সৎ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের কোন চিন্তাই তাদের মাথায় ছিল না। তবুও ফরাসী বিপ্লবের পর প্রায় একশ' বছর ধরে ফরাসীরা শান্তির মুখ দেখেনি। অনেক জাতীয় বিপ্লবের পর সে বিপ্লবের সুফল দেশবাসীর জীবনে প্রতিফলিত হতে সময় লেগেছে এবং বিপ্লবের অব্যবহিত পরে জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। খুব কম ক্ষেত্রেই অসাধারণ দূরদর্শী আদর্শনিষ্ঠ নির্লোভ নেতৃত্ব জনসাধারণের কষ্টের শরিক হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের ক্ষেত্রে পরিচালিত করতে পেরেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা জনতা শেষ পর্যন্ত সঠিক নেতৃত্বের উদ্ভবের উপযোগী পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এবং সম্মুখের দিকে এগিয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আফ্রিকা ও এশিয়ার

www.pathagar.com

শতাধিক দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাদের দিকে একবার তাকালেই বুঝা যাবে যে, স্বাধীনতা অর্জন করা অপেক্ষা সেই স্বাধীনতাকে স্থিতিশীল করে তার সুফল সাধারণ মানুষের ঘরে পৌঁছে দেয়া আরও কঠিন কাজ। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তও কম দায়ী নয়। সবদিক বিবেচনা করে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, স্বাধীনতাযুদ্ধে আমাদের শহীদদের আত্মদান মহীয়ানভাবেই শেষ পর্যন্ত সার্থক। কিন্তু এদেশের মানুষের মনে সেদিন অনুচ্চস্বরে গুঞ্জরিত হবে, "স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের বর্তমানকে উৎসর্গ করেছিলেন আমাদের বর্তমানের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য।" তাদের চোখের পাতা হয়তো তখন ভিজে উঠবে। নতুন সংগ্রামে তাদের জীবন সেদিন আবার মুখর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কোন গ্লানি, আশাভঙ্গের কোন বেদনার ছায়া সেদিন তাদের মনের ওপর পড়বে না। আগামীদিনের সংগ্রামী সেই জনতা '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করে তাদের হাতের পতাকা আরো উর্ধ্বে তুলে ধরবে।

১২ ডিসেম্বর ১৯৭৬।

www.pathagar.com

১৯

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজগুলোর পাতা উল্টাচ্ছিলাম। ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় "আজ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ" শিরোনামায় ছোট্ট একটা খবর নজরে পড়ল। ছোট হলেও খবরটি সুলিখিত। অল্প কথায় ১৯৭১-এর পয়লা মার্চে যে নবচেতনার অভ্যুদয়, সাতই মার্চে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহবান ঘোষণা এবং ২৫শে মার্চের নগ্ন হামলার পর স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধের মহান উদ্বোধনের উল্লেখ করে ঐ উন্মাদনাময়ী ক'টি দিনের গৌরব জাতিকে মনে করিয়ে দেয়ার সার্থক চেষ্টা করা হয়েছে। আর কোন সংবাদপত্র দিনটি স্মরণ করার প্রয়োজনবোধ করেনি। আত্মবিস্মৃতি আমাদের জাতির একটি বিশেষ গুণ। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মন কিভাবে গিরগিটির গায়ের রং-এর ন্যায় ঘন ঘন বদলায় সে সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট লিখেছি এবং সুযোগ মত আরও লেখার ইচ্ছা রয়েছে। খবরের কাগজকে দোষ দিব কি, আমার মাথায়ও ৭ই মার্চ ছিল না। আমিও ত মধ্যবিত্ত। তবে পঁচিশে মার্চ ও ২৬শে মার্চে বিদ্রোহী চট্টগ্রাম বেতারের ঘোষণাটা আমার মনে ভালভাবেই আছে।

ইত্তেফাকের খবরটি পড়ে মনটা একাত্তুরের সেই দিন ক'টিতে চলে গেল। পয়লা মার্চ দুপুরের দিকে আমি শিল্প ব্যাঙ্কের এক বন্ধুর মতিঝিলের চারতলার উপরের কামরায় বসে গল্প করছি। টেবিলের ওপর একটা ট্রানজিস্টর। বন্ধু অপেক্ষা করছেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বক্তৃতা শুরু হওয়ার জন্য। আরও দু'তিনজন কামরায় রয়েছেন। সকলের মুখেই একটি অনিশ্চয়তার ভাব। ইয়াহিয়ার ভাষণ শুরু এবং অল্প কথায় শেষ হোল। মোদ্দা কথা, ভুট্টোর একান্ত অগণতান্ত্রিক এবং গর্হিত জেদের নিকট নতি স্বীকার করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পার্লামেন্টের অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করলেন। কামরায় প্রায় এক মিনিট ধরে নীরবতা বিরাজ করল, তারপর একজন মুখ খুললেন,

www.pathagar.com

"এবার কি হবে ?" বললাম, "আমি ত জানুয়ারী মাসেই করাচী থেকে ফিরে এসে বলেছিলাম যে, প্রয়োজন হলে দু'লাখ লোক মারা হবে, তবু নির্বাচনের রায় মানা হবে না; ছ' দফাকে বিবেচনাই করা হবে না, এটিই সামরিক বাহিনীর অনেক জেনারেলের অভিমত। এখন ত মনে হচ্ছে পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে সেদিকে যাচ্ছে।" ছাড়া ছাড়া-ভাবে মিনিট পনের বিশেক আলোচনার পর হঠাৎ কানে মিছিলের শ্লোগানের আওয়াজ শোনা গেল। সকলে দৌড়ে জানালার দিকে গেলাম, প্রায় হাজারখানেক লোকের এক দারুণ জঙ্গী মিছিল। ঘন ঘন ধ্বনি উঠছে, "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"। তারপর আসতে লাগল একটার পর একটা ফেস্টুনসহ মিছিল। স্পষ্ট মনে আছে ইয়াহিয়ার ঘোষণার এই ত্বরিত প্রতিক্রিয়া। মনে হলো কেবল আবেগের বান নয়, কিছুটা সংগঠনও আছে। তবু আমি উপরোক্ত দু'লাখ লোক মারার শোনা কথাটা মনে করে চিন্তিত হচ্ছিলাম। চরম আঘাত আসলে তা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় শক্ত সংগঠন গড়ে তোলা যাবে কিনা। আশঙ্কার কথাটা উল্লেখও করেছিলাম, তবুও ইয়াহিয়ার ভাষণের জঙ্গী প্রতিক্রিয়ায় কামরার সকলের মুখের চেহা-রাটা বদলে গেল লক্ষ্য করলাম। এর মধ্যে একজন এসে খবর দিল রাস্তার ধারের কয়েকটি কাঁচা দোকানে জনতা অগ্নিসংযোগ করেছে, সমস্ত স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে। শিল্প ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে কামরুন্নেসা স্কুল থেকে সহধর্মিনীকে নিয়ে বাসায় ফিরলাম সারা পথ গাড়ীতে শম্বুকগতিতে জনতার ভিড় ঠেলে ঠেলে। মনে হল সারা ঢাকা শহর রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। এক মুহূর্তে ছ'দফা বাতিল হয়ে এক দফায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। অবশ্য ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের সময়েও "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলা-দেশ স্বাধীন কর" ধ্বনিটি জনতার কন্ঠে শোনা গিয়েছিল। তবুও তখনও অধিকাংশ মানুষের মনে আশা ছিল ছ'দফার ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, কিছুটা দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে হয়ত একটা আপোষ-রফা হলেও হতে পারে। কিন্তু ভুট্টো কেন্দ্রীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের ১৯৭১ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকার না করে শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের বক্তব্যের স্বীকৃতির ব্যবস্থা আগেই নিশ্চিত করার শর্ত আরোপ করায় এদেশের মানুষের মনে আগুন ধরে গেল। বাসা থেকে বিকেলে আবার ভিড় ঠেলে

www.pathagar.com

অফিসে যেয়ে শুনলাম, ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা হবে ও সেখানেই কর্মপন্থা ঘোষিত হবে। দেশের সর্বত্র থেকে তুমুল বিক্ষোভের খবর আসছে। গভীর রাতে বাড়ী ফেরার সময়েও দেখলাম লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে। দু' তারিখেও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকল। ফার্মগেটের ওখানে গুলীতে একজন নিহত হলো। সন্ধ্যায় আমাদের তলব করা হলো শেরেবাংলা নগরে মার্শাল ল' হেড কোয়ার্টারে। মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটর লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব আমাদের পরিস্থিতি আলোচনা করে জনতাকে শান্ত রাখার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে বল্লেন। সম্পাদকদের অনেকে অনেক কথা বল্লেন। আমি চুপ করে বসে আছি। সাহেবজাদা আমাকে বাংলাতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি চুপ কেন। আপনি কিছু বলুন না।" আমি বল্লাম, "আমার কেমন জানি লাগছে। মনে হচ্ছে, সংঘাতিক কিছু আসছে।" সাহেবজাদার মুখটা কালো হয়ে গেল। অতি অমায়িক ভদ্রলোক। বল্লেন, "আপনার মত লোক ভয় পেলে চলবে কেন? অনেক সঙ্কট আমরা পার হয়েছি। এটাও ইনশাল্লাহ আমরা পার হব।" "না, এ সঙ্কট অন্য সব সঙ্কটের মত নয়। এটা একটা চূড়ান্ত ব্যাপার হবে।" সভা থেকে বেরিয়ে শুনলাম, রাত ন'টা থেকে কারফিউ। বাড়ি ফেরার পথে দেখি পথের জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড। খবরের কাগজের লোক বলে তিন চারটা ব্যারিকেড সরিয়ে বাসায় এলাম। দু'দিন পর শুনলাম, সাহেবজাদা চলে যাচ্ছেন, টিক্কা খান আসছেন। টিক্কা খান সম্বন্ধে এর পরের দিনই গওহর আইয়ুবের শ্বশুর জেনারেল হাবিবুল্লাহর কাছে যা শুনলাম তাতে রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার কথা। উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল টিক্কা খানের খবর শুনে। সকলে উর্ধ্বশ্বাসে অপেক্ষা করছিল ৭ই মার্চ কি কর্মসূচী দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের লাঠি কাঁধে ট্রেনিং শুরু হয়ে গেছে এবং তার ছবি কাগজে ছাপা হচ্ছে। মনে কিন্তু আমার খটকাটা রয়ে গেছে। পারব ত, আঘাত আসলে সহ্য করতে, প্রতি-আঘাত হানতে? না সব প্রতিরোধ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে? অর্থাৎ মনে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। দু'লাখ লোক মারার কথা বলেছিলেন তিন জেনারেল—হামিদ, ওমর ও গুল হাসান এক পার্টিতে। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে পার্টিতে ছিলেন।

www.pathagar.com

৭ই মার্চ এল। সে জনসভার এবং ঐ বক্তৃতার বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করব না। "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" এই ব্যানারহেডটা "সংবাদ" পরের দিনের কাগজে দিয়েছিল। শহীদুল্লা যখন টেলিফোনে শিরোনামটা আমাকে বলেছিলেন তখন আমি বলেছিলাম, "মামা, একটু ভেবে দেখেন। এখনও আলাপ-আলোচনার দরোজা একেবারে বন্ধ হয়নি।" শহীদুল্লা জবাব দিয়েছিলেন, "না মামা। ওরা আলাপ-আলোচনার ধাপ্পা দিয়ে রোজ নতুন সৈন্য আনছে। লোকে এখন স্বাধীনতা চায়।" শহীদুল্লা মামার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল বলে ইতিহাস প্রমাণ করেছে। সাংগঠনিক প্রস্তুতি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ থেকে গেলেও ৭ই মার্চের পর আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না, দেশের জনতার মন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এমন সামগ্রিকভাবে প্রস্তুত যে, চরম আঘাতও মানসিক প্রতিরোধের নিকট ব্যর্থ হতে বাধ্য। আঘাত এলে জনসাধারণ নিজেরাই সংগঠন গড়ে তুলবে। ৭ই মার্চের পর শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। এ আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্যে এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো। এল পঁচিশের কালরাত্রি। বাঙালীর চোখে পানির বদলে জ্বলে উঠল আগুন। বার ঘন্টা না যেতেই ২৬শে'র সকালে চট্টগ্রাম রেডিও থেকে শুনলাম জেনারেল (তখন মেজর) জিয়ার কণ্ঠে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা। এরপর সৃষ্টি হলো নয় মাসের নয়া ইতিহাস।

সত্যিই আমরা মার্চের ঐ দিনগুলো কি ভুলে গেছি? আসলে আমাদের সকলের মনের গভীরে ঐদিনগুলো এখনও জ্বলজ্বল করছে। স্বাধীনতার পরের কয়েক বছরের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় সে গৌরবদীপ্ত দিনগুলোর স্মৃতি চাপা পড়ে গেছে মাত্র। এ স্মৃতি নষ্ট হবার নয়। একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে—স্বাধীনতার মর্মবাণীর ওপর যেভাবে কতগুলো বিশেষ মহল থেকে ঢালাও আক্রমণ চলছে তার প্রতিক্রিয়ায় সে স্মৃতি আবার মানুষের মনকে দোলা দিচ্ছে। গোষ্ঠীবিশেষের পথভ্রষ্টতায় মানুষের মন বিষিয়ে যেতে পারে; কিন্তু ইত্তেফাকের ভাষায়, "দিনপঞ্জীর আবর্তনে বর্ষপঞ্জীর পরিক্রমায় এই দিন আসে প্রতি বৎসরই, আসে ইতিহাসে যে সত্য অধিকার উহাকে প্রতিষ্ঠিত করার অমোঘ দাবী লইয়া, আসে প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতার আলোকোজ্জ্বল মর্মবাণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া।"

৯ মার্চ ১৯৭৭।

www.pathagar.com

২০

গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শিক্ষা প্রকল্পন ও উন্নয়ন গবেষণা ফাউণ্ডেশনের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক আবুল ফজল সাহেব বলেন, "কর্ম সংস্থানের ওপর লক্ষ্য রেখে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি চালু করতে হবে।" কথাটির পেছনের যুক্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু কথাটি নতুন নয়। গত চল্লিশ বছর ধরে অনেক সরকারী-বেসরকারী নেতার মুখে কথাটি শুনে আসছি এবং পত্র-পত্রিকায় এ সম্বন্ধে বেশুমার গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ ছাপা হতে দেখেছি। ইংরেজ আমলেই খবরের কাগজে প্রায় 'বেকার সমিতি'র সভার নোটিশ ও বিবরণ ছাপা হতে দেখতাম, চাকরি যোগাড় করতে না পেরে শিক্ষিত বেকার যুবকের আত্মহত্যারও খবর সে সময়ে মাঝে মাঝে পড়েছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অজস্র চাকরি সৃষ্টি হওয়ায় বেকার সমস্যা কিছুটা সহজ হয়েছিল। যুদ্ধ অবসানের তিন বছরের মধ্যে পাকিস্তান হল এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুরা দলে দলে দেশত্যাগ করায় তাদের শূন্যস্থানে মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চাকরি সংস্থানের সুযোগ পেল, অনেকে সি, এস, পিও হতে লাগলেন। এর ফলে বেকার সমস্যা থাকলেও তেমন প্রকট ছিল না। এ পরিস্থিতি বেশী দিন থাকতে পারে না তা তদানীন্তন সরকারের বুঝা উচিত ছিল, কর্তব্য ছিল শিক্ষাব্যবস্থাকে কেবল কেরানী ও অফিসার সৃষ্টির প্রয়োজনের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া এবং সেই সঙ্গে দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের ব্যবস্থা করে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিতদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু প্রথম থেকেই কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাবে আমাদের একটা জগাখিচুড়ি শিক্ষাব্যবস্থাই আরও পাকাপোক্ত হয়। দেশে কয়েকটি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করা হয়, ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা কিছুটা সম্প্রসারিত করা হয়। কয়েকটা মেডিক্যাল কলেজও প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থাও সম্প্রসারিত করা হয়। আমাদের ছাত্রজীবনে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান, ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং-এর দিকে খুব কম যেত। পাকিস্তান হওয়ার পর সে মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন ঘটল। উপরে যে ব্যবস্থাগুলোর উল্লেখ করেছি, সেগুলো এ পরিবর্তনের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ছিল। একের পর এক শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়, কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা পশ্চাদমুখী হবে না বর্তমান দুনিয়ার জীবনের স্পন্দনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী হবে, সে সম্বন্ধে মন স্থির করতে না পারায় সবগুলো কমিশনের রিপোর্টই হ য ব র ল গোছের হয়েছে। আরও মজার ব্যাপার এই, রিপোর্টগুলোর একটিকেও পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয়নি, হলে হয়ত অভিজ্ঞতা থেকে শেখা যেত। একটা কমিশনের রিপোর্ট সুদীর্ঘকাল ধরে নানা তর্ক-বিতর্কের পর শেষ হয়ে কার্যকরী করা শুরু হতে না হতে সরকার বদলের পর নতুন সরকার এসে সে রিপোর্ট বাতিল করে আর একটি কমিশন বসিয়েছেন। এ খেলা প্রায় তিন যুগ ধরেই চলতে দেখলাম।

দেশের শিক্ষাজীবনের ভিত্ দুর্বল হয়ে পড়ছে পাকিস্তান আমলের গোড়া থেকে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুণ, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় ধসে পড়েছে। ইংরেজ আমলে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই কৃষক প্রজা পার্টি, মুসলিম লীগের প্রোগ্রামে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। সে যুগের নেতৃবৃন্দ সকলেই অন্ততঃ মুখে বলতেন যে, প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হওয়া উচিত। কারণ, জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করা না গেলে, তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না ঘটলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি কোন দিনই হবে না, কেবল মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করার অর্থ হচ্ছে শিক্ষাকে মধ্য ও উচ্চবিত্তের মধ্যে সীমিত রাখা। 'ছোটলোকেরা" ছেলে-পেলেদের লেখাপড়া শেখালে তাদের দুনিয়া সম্বন্ধে চোখ খুলে যাবে, "ছোটলোকেরা" বেয়াড়া হয়ে ভদ্রলোকদের মানবে না--এমন কথাও কোন কোন মহলে শুনবার দুর্ভাগ্য হয়েছে, তবে তা প্রকাশ্য কোন সভা-সমিতিতে নয়। পাকিস্তান হওয়ার পর দু'চার বছর উপরোক্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা শোনা গেছে। তারপর আস্তে আস্তে

www.pathagar.com

কথাটি দেশের রাজনৈতিক নেতাদের মুখ থেকে উধাও হয়ে গেল, "শিক্ষাবিদরাও" এ সম্বন্ধে নীরব হয়ে গেলেন। ইংরাজ আমলেই কিছুটা সম্পন্ন কৃষকরা তাদের ছেলেদের স্কুল-কলেজে শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। তার ফলে ক্রমে ছাত্রদের বেশ একটা অংশ কৃষক পরিবার থেকে আসতে থাকে। শিক্ষালাভ করে এরা মধ্যবিত্তে পরিণত হয়ে বংশমর্যাদা অর্জনে ব্যস্ত হয়ে নিজের শ্রেণী-চরিত্রকে গোপন রাখারই চেষ্টা করে। ফলে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তারে তাদের কোন তাগিদ ছিল না। পাকিস্তান আমলের শেষের দিকেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে সংকট ঘনীভূত হয়ে আসে, তার ফলে মাঝারি কৃষক সন্তানদেরও স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়ার হার কমে আসে। শিক্ষাঙ্গন ক্রমশঃ মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ও সম্পন্ন কৃষক সন্তানদের প্রায় একচেটিয়া হয়ে পড়ে। সুতরাং কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির হার বজায় থাকে। পাকিস্তান আমলে মধ্যবিত্তের শ্রীবৃদ্ধি বজায় ছিল। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা ও দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতির কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা না থাকায় কলেজ ও ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সীমিতই থাকে। বেকার সমস্যা ক্রমে বাড়তে থাকে।

এদেশের সকল দুর্গতির জন্য আমাদের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীকে দায়ী করেন। তাদের শাসনের ঔপনিবেশিক রূপ প্রথম থেকেই পরিষ্কার ছিল। কিন্তু আমাদের নেতৃবৃন্দের কারও মাথায় এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নতির কোন পরিষ্কার রূপরেখা ছিল না। বাংলাদেশের ওপর কেন্দ্রের অর্থনৈতিক অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে তখনও এ আন্দোলনের নেতৃবর্গ ক্ষমতা পেলে কিভাবে দেশের সমস্যাগুলোর সমাধান করবেন সে বিষয়ে চিন্তার ব্যাপারে দেউলিয়াত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদগণ এ আন্দোলনে সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৪ সালের পর থেকে সংবাদপত্রে অনেক তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশ ও পুস্তিকা রচনা করেন। কিন্তু এঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড ইত্যাদি ইউনিভার্সিটি ফেরত এবং কারুরই দেশের মাটির সঙ্গে, কৃষক-শ্রমিকদের জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে কোন যোগা-

www.pathagar.com

যোগ ছিল না। রাজনীতিক, আর্থনীতিক, শৈক্ষিক "এক্সপার্ট" সকলেরই মনোভাব ছিল প্রধানতঃ নেতিবাচক। সর্বোপরি, তাঁদের সকলেই ছিলেন মধ্যবিত্ত। জন্মের প্রায় প্রাথমিক যুগ থেকেই বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের মাথায় একটা চিন্তাই বিরাজ করেছে—কিভাবে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করব, বিত্তবানে পরিণত হব। সকল প্রকার নীতি-বোধ এই চিন্তার তোড়ে ক্রমশঃ ভেসে যেতে আমরা চোখের সামনেই তিন যুগ ধরে দেখতে পেয়েছি। এখন অবস্থাটা চরমে উঠেছে মাত্র।

বাংলাদেশ হওয়ার পর আশা করা অন্যায় ছিল না যে, পশ্চিমা শাসন অবসানের পর এবার দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেগুলো বাস্তবায়নের কাজে অবিলম্বে হাত দেয়া হবে। কিন্তু কি হয়েছে তা সকলেরই জানা এবং আমি অতীতে এ সম্বন্ধে বেশ কয়েকবার লিখেছি। উপরোক্ত সভায় অধ্যাপক আবুল ফজল সাহেব আরও বলেন, "জীবিকার চেয়ে মানুষের বড় প্রয়োজন আর কিছু নেই। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত যুবক কায়িক পরিশ্রম করতে চায় না। কায়িক পরিশ্রমকে অসম্মানের চোখে দেখে শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না।" আবুল ফজল সাহেবের প্রথম বক্তব্যের ব্যাপারে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। পাকিস্তান হওয়ার পর মধ্যবিত্তের একটা অংশ চাকরিতে ও ব্যবসায়ে অচিন্ত্যনীয় সুযোগ পেয়েছিল এবং সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিল। বাংলাদেশ হওয়ার পরও তাই হয়। কিন্তু গত ত্রিশ বছরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে অনেকগুণ বেড়ে যাওয়ায় চাকরি-বাকরির বাজারে আজ সংকট তীব্র হয়ে আছে। একটি বড় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেকটরের সঙ্গে আলাপে জানতে পারলাম আড়াইশ' কেরানীর জন্য তাঁরা দরখাস্ত পেয়েছেন সাড়ে বাইশ হাজার এবং সেগুলো বাছাই করে ইন্টারভিউর জন্য প্রার্থী ডাকার ব্যাপারে তাঁরা ছয় মাস ধরে হিমশিম খাচ্ছেন। 'শিক্ষিত যুবকেরা কায়িক পরিশ্রম করতে চায় না' আবুল ফজল সাহেবের এ মন্তব্য এক/দেড় যুগ আগে ষোল আনা সত্যি ছিল। কিন্তু আজ আর বোধ হয় এ কথাটা পুরো ঠিক নয়। তিন বছর আগেই আমার কাছে এক অতি সুদর্শন ছেলে বাসার কাজের জন্য তাকে রাখার অনুরোধ করে। তার বাবা উত্তরবঙ্গের একটি শহরে ছোট-খাট ব্যবসায়ী ছিল এবং সে ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে

www.pathagar.com

আই, এস-সিতে ভর্তি হয়ে ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, এমন সময় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। তার বাবা মারা যান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার বড় ভাই পিতার ব্যবসা পরিচালনাভার গ্রহণ করে এবং ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচ বহন করতে অস্বীকার করে চাকায় গিয়ে নিজের পথ খুঁজে নিতে বলে। আমি ছেলেটির ইংরেজী বাংলা জ্ঞান পরীক্ষা করে তার কাহিনীটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। আমার বাসায় কাজের লোকের প্রয়োজন না থাকায় এবং একেবারে অচেনা ছেলেকে এ জামানায় বাসায় স্থান দিতে সাহস না করে তার অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করব বলে বিদায় দিই। সে কিছুদিন ঘুরেছিল, কিছুই করতে পারিনি। গ্রাজুয়েট ছেলেও অফিসে পিয়নের চাকরি করছে এমন দু'একটা দৃষ্টান্ত আমি জানি। দেড় যুগ পূর্বে বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে এটা অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল।

৬ এপ্রিল ১৯৭৭।

www.pathagar.com

২১

ফেব্রুয়ারী মাস আবার আমাদের জীবনে ফিরে এসেছে। খবরের কাগজে দেখছি 'অমর একুশে' উদযাপনের তোড়জোড় চলছে। শহীদ মিনারেও নতুন রঙের ছোপ পড়েছে। ১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারীর পর প্রায় বিশ বছর ধরে প্রতি বছরই দেখেছি এই মাসটি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মানুষের মনে তিন সপ্তাহের জন্য কেমন একটা পরিবর্তনের স্রোত বয়ে যেতে, যেটা চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করত একুশের প্রভাত-সূর্য ওঠার আগেই। এ পরিবর্তনের সঠিক বর্ণনা দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। ভাবগম্ভীর শোক, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং দীপ্ত যৌবনের উচ্ছলতা-উদ্দামতা--সব কিছু মিলিয়ে একটা শুদ্ধতা, একটা শুচি-শুভ্র পবিত্রতার পরিবেশ সারা দেশে সৃষ্টি হতে দেখেছি, যাকে মনে হত বাঙালী জাতীয়তাবোধের গভীরতম অনুভূতির অভিব্যক্তি। অবশ্য ঐ দু' যুগেও কিছু লোক এদেশে ছিল এবং এখনও রয়েছে যারা এ জাতীয়তাবোধের মধ্যে "হিন্দুয়ানী" ও "ভারতের গোপন হস্ত' ১৯৪৮-এর ১১ই মার্চ থেকেই দেখে এসেছেন ও আসছেন। এঁদের কথা স্বতন্ত্র। ইরানী ও আফগানরা "আর্য" বলে গর্ববোধ করলে এঁদের আপত্তি নেই। ইরানের বর্তমান শাহান শাহ "আর্য মেহের" (আর্য গৌরব) উপাধি গ্রহণ করলে বা ইরানী রাজতন্ত্রের দু'হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষে সাইরাস ও দারিয়ুসকে স্মরণ করলে কোন মন্তব্য এঁরা করেন না। মহাকবি ফেরদৌসীর "শাহনামা" এঁদের কাছে ফার্সী সাহিত্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন; কিন্তু "শাহনামার" সোহরাব-রুস্তম এবং অন্যান্য চরিত্ররা যে মুসলমান নন সে কথা তাঁরা মনে রাখেন না। কিন্তু আমাদের "জাতীয় সঙ্গীত" রবীন্দ্রনাথের রচিত হওয়াতে এটাকে বদলাবার দাবী এঁরা করছেন। অথচ এই "জাতীয় সঙ্গীত" মুক্তি-সংগ্রামে প্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস ছিল। মিসরিয়রা পিরামিড ও স্ফিংস নিয়ে গর্ববোধ করে।

www.pathagar.com

ইন্দোনেশীয়রা রামায়ণকে নিজস্ব ক্লাসিক বলে মনে করে আর তাদের রাষ্ট্রীয় এয়ার লাইনের নাম হল "গরুড় এয়ারলাইন্স"। ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশের চাইতেও বেশী মুসলমানের বাস। মালয়েশিয়ার বিপুলাংশ অধিবাসী মুসলমান। সেখানকার ধর্মপ্রাণ অনেক মুসলমান যখন নামের আগে শ্রী ব্যবহার করেন তখন কাউকে ছিঃ ছিঃ করতে দেখি না। আফগানিস্তানের জাতীয় এয়ার লাইনের নাম হল "এরিয়ানা এয়ারওয়েজ"। এসব দেশের মুসলমানদের ঈমানের কমজোরি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে কখনও শুনিনি। অথচ পাকিস্তানের পঁচিশটা বছর ধরে বাঙালী মুসলমানদের ঈমানের কমজোরি, মুসলমানিত্বের খাঁটিত্ব সম্বন্ধে যে কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর কটাক্ষই আমাদের শুনতে হয়েছে তা নয়, এক শ্রেণীর বাঙালী মুসলমানকেও এ অহেতুক এবং বেয়াদবী সন্দেহ প্রকাশ করতে দেখার দুর্ভাগ্যও আমাদের হয়েছে। বাংলাকে উর্দু হরফে লেখাবার চেষ্টা করতে কেবল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব ফজলী আহমদ করিমকেই আমরা দেখিনি, কিছু সংখ্যক বাঙালী মুসলমানও সে সময়ে এই হরফ বদলানোর প্রচেষ্টাকে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের তাগিদে উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই চলেছিল বাংলাভাষাকে 'মুসলমানীকরণের' অর্থাৎ একেবারে বেমানানভাবে আরবী, ফার্সী, উর্দু শব্দ সংযোজনের দ্বারা একটা অস্বাভাবিক দো-আঁশলা ভাষায় পরিণত করার। দুনিয়ার যেকোন ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে মানানসইভাবে প্রয়োগের দ্বারা বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করার বিরোধী বাংলাভাষার অনুরাগী কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হতে পারে না, কিন্তু সে মানানসই প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন প্রতিভাধর সাহিত্যিক, কবির। আধুনিক বাংলা কাব্যে আরবী, ফার্সী শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারে পথিকৃৎ ছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদার। নজরুলের প্রচুর আরবী, ফার্সী শব্দের ব্যবহারে রচিত কবিতাগুলোর ব্যাপারে গোঁড়া সংস্কৃত বাংলা লেখার পক্ষপাতী মহলেও আপত্তি উঠেছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু পাকিস্তানের সৃষ্টির পূর্বে ও পরে মানান-বেমানান সেদিকে লক্ষ্য না রেখে কয়েকজন লেখক ও কবি বাংলাভাষার চরিত্রকেই বদলে দেবার যে প্রচেষ্টা শুরু করেন তারই প্রতিক্রিয়ার উল্টো স্রোত বইতে শুরু করে। অর্থাৎ প্রায় অবচেতন মনেই

www.pathagar.com

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা আরবী, ফার্সী, উর্দু এমনকি ইংরেজী শব্দও এড়িয়ে চলার ভাব এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা দেয়। উপরোক্ত দু'টি প্রচেষ্টার কোনটিকেই আমি সুস্থ বুদ্ধি বা বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রতি সত্যিকার অনুরাগ বলে মেনে নেইনি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পশ্চাতে যে মনোভাব সক্রিয় ছিল, দ্রুত বিবর্তনে সেটা যখন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করল ১৯৭১-এর মুক্তিসংগ্রামে ও বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে, তখন আশা করা অন্যায় ছিল না যে, বাংলাভাষা ও আমাদের জাতীয়তাবোধের ব্যাপারে সকল বিতর্কের এবার অবসান হবে। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর বাঙালী মুসলমান এ জাতীয়তাবোধকে এখনো সুস্থ মনে মেনে নিতে না পারাতেই আজও বাংলাদেশেই বাংলাভাষা তার পূর্ণ মর্যাদা পাচ্ছে না। এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে একেবারে অহেতুক বিতর্কের সৃষ্টি করা হচ্ছে। অফিস-আদালতে সর্বত্র বাংলাভাষার প্রচলন এবং প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার প্রতি স্তরে প্রতি বিষয়ে বাংলাকে শিক্ষার বাহন হিসেবে কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে, বাঙালী জাতীয়তাবাদের অতি দ্রুত জাগরণের যুগেই। বাংলাদেশের জন্মের পর এ সিদ্ধান্ত পুনরায় ঘোষিত হয়। কিন্তু সত্যি বলতে কি এ সম্বন্ধে অগ্রগতি এ পর্যন্ত যা হয়েছে তাকে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। বরং কিছুদিন যাবৎ স্রোতের ধারাটা যেন একটু উল্টো দিকেই বইতে শুরু করেছে। অফিস-আদালতে স্বাধীনতালাভের পর বাংলাতেই নথিপত্র লেখা ও মন্তব্য করা শুরু হয়েছিল। সন্দেহ ছিল এটা প্রথম দিকে সহজ হবে না। অল্পদিনের মধ্যেই এই সন্দেহ দূরীভূত হয়। কিন্তু কিছু দিন ধরে দেখা যাচ্ছে যে, আবার ইংরেজীতে নথিপত্র লেখার ও তার ওপর মন্তব্য করা শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা কিসের লক্ষণ?

কয়েকদিন আগের করাচীর "ডন" পত্রিকায় সম্প্রতি মুলতানে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের বৈজ্ঞানিকদের এক সম্মেলনের বিবরণ পড়লাম। উক্ত সম্মেলনে পাঁচশ' বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান থেকে শুরু করে রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পাকিস্তানের প্রবীণ ও তরুণ বিজ্ঞানীরা গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যের

www.pathagar.com

যে নিদর্শন উক্ত সম্মেলনে পেশ করেন তাতে আমি বেশ একটু চমৎকৃতই হয়েছি। উন্নততর মানের ধান, গম ও তুলা উৎপাদনের ব্যাপারে পাকিস্তানী উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্যই অর্জন করেছেন। পাকিস্তানের রসায়নবিদরা কয়েক প্রকার ক্যানসার রোগ নিরাময় করতে সক্ষম, এমন ওষুধও আবিষ্কার করেছেন বলে দাবী করছেন। পাকিস্তানী বিজ্ঞানীদের সাফল্যের কাহিনী আমার আলোচ্য বিষয় নয়। উক্ত পাঁচ দিনব্যাপী সম্মেলনে বহুসংখ্যক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পঠিত হয়। 'ডন'এর রিপোর্টার উল্লেখ করেন যে, এর প্রত্যেকটিই উর্দুতে লেখা ছিল। পাকিস্তানের কোন প্রদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষাই উর্দু নয়। কেবলমাত্র সেখানকার কিছুসংখ্যক মোহাজেরদের মাতৃভাষাই উর্দু। তাছাড়া উর্দু যে বাংলাভাষার চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ এ কথা বলা চলে না। সুতরাং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে উর্দুতে এতগুলো প্রবন্ধ রচনা যদি সম্ভব হয় তবে বাংলাতে তা সম্ভব হবে না কেন? উপরোক্ত রিপোর্ট থেকে আমার ধারণা হয় যে, শিক্ষার গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সর্বত্র উর্দু প্রচলনের কাজ পাকিস্তানে শেষ হয়ে না গেলেও হওয়ার কাছাকাছি। এরপর একদিন হয়ত দেখা যাবে যে, পশ্তু, বেলুচী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী এই চারটি ভাষাও সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলোতে শিক্ষা ও অফিস-আদালতের কাজের বাহন হয়ে গেছে। আর ভাষার জন্য প্রাণদানের একটা বিরল ঐতিহ্যের সৃষ্টি আমরা করলেও বাংলাদেশে বাংলাকে তার প্রয়োজনীয় আসন দেওয়ার ব্যাপারে আমরা উদাসীন। এ ব্যাপারে আমি আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের "বিদগ্ধজন"কেই বেশী দায়ী করব।

এই আলোচনার প্রথমেই আমি ২১শে ফেব্রুয়ারীর শুচি-শুভ্র যে পরিবেশের উল্লেখ করেছি তার ব্যতিক্রম স্বাধীনতার পর থেকেই লক্ষ্য করেছি। ১৯৭২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রভাতেই যে কতকগুলো বিসদৃশ, এমনকি ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে সেগুলো সম্বন্ধে লেখার দুর্ভাগ্য আমার আগেই হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারীর মূল আবেদনের উপরোক্ত অপমান আমাদের জাতীয়তাবোধের অসম্পূর্ণতারই লক্ষণ বলে আমার কাছে তখনই মনে হয়েছে। তার পরের ২১শে ফেব্রুয়ারীগুলোকেও আমি নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হতে দেখে এসেছি। অথচ আমাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে ধসিয়ে দেয়ার চেষ্টার কি অবসান হয়েছে?

www.pathagar.com

১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারীর মর্মবাণী ছিল ভাষার জন্য জাতীয়তা-বোধের উন্মেষের জন্য নিঃশেষে আত্মবলিদানের। এ দেশে যতগুলো আন্দোলন হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দালনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতার মনে কোন লাভ-লোকসানের খতিয়ানের, আরও পরিষ্কার করে বলা যাক, ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার কোন প্রশ্ন ছিল না। সেদিন যে আদর্শের জন্য এদেশের ছাত্র-জনতা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তা কি মুছে গেছে? আমার সমগ্র সত্তা বলছে, না।

১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮।

www.pathagar.com

২২

গত শনিবার ২২শে এপ্রিল তারিখের 'সংবাদ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় "নারী নির্যাতন-বিরোধী কমিটির ৭-দফা" শীর্ষক একটা খবর 'বক্স' করে ছাপা হয়েছে। খবরটি রাজধানী ঢাকা, বন্দর নগরী চাটগাঁর নয়, দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার পীরগঞ্জ থানাধীন বিরহলী গ্রামে বেগম সুফিয়া খাতুনের সভানেত্রীত্বে ৭০ জন মহিলার এক জনসভার। সভাটি কোন জাতীয় নারী সংগঠনের শাখা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়নি এবং মনে হয়, সেখানে কোনও বিদূষী জাতীয় নারীনেত্রী উপস্থিত থেকে সভার গৌরব বৃদ্ধি করেননি। সভার বিবরণে দেখা যায়, উক্ত সভায় কোন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা হয়নি এবং দেশ গঠনে নারীসমাজকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবানও জানানো হয়নি। গৃহবধূদের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে সাদামাটা সাতটি দাবীসম্বলিত একটি প্রস্তাবই আলোচনার পর পাস করা হয়। দাবী সাতটি হুবহু তুলে দিচ্ছি--(১) স্ত্রীদের সঙ্গে স্বামীদের মধুর ব্যবহার করতে হবে, (২) শারীরিক নির্যাতন ও মারধর বন্ধ করতে হবে, (৩) কথায় কথায় চোখ রাঙানো চলবে না, (৪) বহু বিবাহ চলবে না, (৫) হাঁস-মুরগী-ছাগল ইত্যাদি পালন থেকে জমা স্ত্রীর নিজস্ব তহবিলে স্বামীরা হাত দিতে পারবে না, (৬) প্রত্যেক স্বামীর সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীদের চিকিৎসা করাতে হবে, (৭) সংসার পরিচালনার ব্যাপারে স্ত্রীদের মতামত শুনতে হবে, (৮) ছেলেমেয়েদের বিয়ে-শাদী-তেও স্ত্রীর মতামতের মূল্য দিতে হবে, এবং (৯) ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে রেখে স্বামীরা বাইরে চলে যায়, তারা ফেরিওয়ালাদের কাছে কিছু ক্রয় করতে চাইলে স্বামীর অবস্থানুযায়ী টাকা-পয়সা দিতে হবে।

শিরোনামায় ছিল সাতটি দাবী, গুণে নয়টি হয়ে গেল। কিন্তু এতে বক্তব্যের কিছু হেরফের হয়নি বরং মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের

www.pathagar.com

দুর্ভোগ আরো পরিষ্কার করে ফুটে উঠেছে। আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত দাবীর কয়েকটিকে হাল্কা এমনকি হাস্যকরও মনে হবে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারের ঘরনীদের জন্য এগুলো কঠোর বাস্তব সমস্যা। বস্তুতঃ নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে অবিভক্ত ভারতের কাল থেকে বহু নারী সংগঠনের গালভরা বহু প্রস্তাব পড়েছি, কিন্তু বাংলাদেশের সুদূর এক অখ্যাত গ্রামের মহিলাদের সভায় উপরোক্ত যে দাবীগুলো করা হয়েছে এগুলোর ন্যায় নারীদের সমস্যার এরূপ চিত্রায়ন আমার নজরে পড়েনি। বোধ হয় বেশী বিদূষী না হওয়াতেই তারা এরূপ সহজ-সরলভাবে নিজেদের অসহায়ত্ব তুলে ধরতে পেরেছেন। এ দাবীতে কেবল বিবাহিত নারীদের সমস্যাগুলোই চিত্রায়িত হয়েছে। কিন্তু আমাদের কুমারী ও স্বামীহারা মেয়েদের সমস্যাও কম নয়। আসলে আমাদের নারীসমাজ সামগ্রিকভাবেই মৌলিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। অবশ্য একথা বলছি না যে, পুরুষরা মৌলিক মানবিক অধিকারগুলো পুরোপুরি ভোগ করে। কিন্তু অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, এ মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের অবস্থা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী শোচনীয়। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে নারীমুক্তির (Women's lib movement) যে আন্দোলন চলছে সে সম্বন্ধে যেসব দাবীর বিবরণ কাগজে পড়ি তার তুলনায় উপরোক্ত সাতটি দাবী একেবারে প্রাগৈতিহাসিক। তবুও আমাদের দেশে যে মুষ্টিমেয় মেয়ে কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ে অত্যন্ত সীমিত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিজেরা উপার্জনের চেষ্টা করেন, আমাদের প্রগতিশীল পুরুষরাও তাঁদের সম্বন্ধে সহজ হতে পারেন না। আর পুরুষদের রক্ষণশীল মহল তো এই একেবারে উপর-ছোঁয়া নারী প্রগতিকে পিষে মেরে পুনরায় মেয়েদের অবরোধবাসিনী করতে সচেষ্ট আছেন। তাদের যুক্তি—নারী প্রগতির ফলে লাম্পট্য বাড়ছে, আর সমাজ রসাতলে যাচ্ছে। লাম্পট্য বৃদ্ধির এ অভিযোগকে তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেয়াও যায়, তবে তার দায়িত্ব কি কেবল নারীদের? লাম্পট্য দমন করার জন্য পুরুষকে অবরোধবাসী করলেই ঈপ্সিত ফলাফল পাওয়া যেতে পারে, পুরুষের সৃষ্ট দুনিয়াময় যুদ্ধ-বিগ্রহ, আণবিক অস্ত্রের বিভীষিকা ও নানা সামাজিক অপরাধের হাত থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। পুরুষরা

www.pathagar.com

যেসব কাজ করে দেশকে চালায়, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়, মেয়েরা সেসব কাজই যে সমান দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে, অগ্রসর দেশগুলোতে তা ভালভাবেই প্রমাণ হয়ে গেছে। পুরুষকে অবরোধবাসী করার প্রস্তাবটা হঠাৎ আমার মাথায় গজায়নি। অর্ধ শতাব্দীরও আগে প্রাতঃস্মরণীয়া বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন তাঁর "Sultana's Dream" (সুলতানার স্বপ্ন) নামক বইয়ে বাইরের সব কাজ নারী করছে আর পুরুষ অন্তঃপরে বন্দী থেকে ছেলেমেয়ে পালন থেকে শুরু করে রান্না-বান্না করছে, এমন একটা সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যদি বেগম রোকেয়ার ঐ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতো তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে আজকের আণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা পর্যন্ত সব কিছুই এড়ানো যেত। আমার বাল্যে বেগম রোকেয়াকে আমি কলকাতার "সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে" দেখেছি। তাঁর লেখা 'অবরোধবাসিনী', 'পদ্মরাগ', 'মতিচুর' 'Sultana's Dream' অন্যান্য বই ও 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলামের', 'নিখিল ভারত নারী সম্মেলনে' বিভিন্ন বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁকে আমি খালাম্মা বলেই ডাকতাম। আজও তাঁর লম্বা ব্লাউজ পরা ও মাথায় কাপড় দেয়া ছবিটি মনে পড়লে মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে। রোকেয়া হলের মেয়েরা সেদিন মারামারি করে যে 'ইতিহাস' সৃষ্টি করলেন তাঁরা কি তাঁদের ছাত্রীনিবাস যে পুণ্যশ্লোক মহিলার নামে নামকরণ হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন? তাঁরা জানেন না মুসলমান মেয়েদের স্কুলে যাবার অধিকার আদায়ের জন্য এই পর্দানশীন মহিলা তাঁর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করেছিলেন। তাঁরা সচেতন নন তাঁদের ভার্সিটিতে পড়ার সযোগ সৃষ্টির জন্য স্বামীর সঞ্চিত পঁচিশ হাজার টাকার শেষ কপর্দকটিও তিনি 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে'র জন্য ব্যয় করেছেন। তাঁরা যদি বেগম রোকেয়ার ভূমিকা সম্বন্ধে এতটুকু সচেতন থাকতেন, তবে তাঁর স্মৃতির এ অপমান তাঁরা করতেন না। কথায় কথায় মূল আলোচ্য বিষয় থেকে অনেক দূর চলে গিয়েছি। মেয়েদের পুনরায় অবরোধবাসিনী করার যে চেষ্টা আজ চলছে সে সম্বন্ধে একটা প্রশ্নই যথেষ্ট। যে যুগে মেয়েরা অবরোধবাসিনী ছিল সে যুগে লাম্পট্য ও অনাচার কি কিছু কম ছিল? আরব্য উপন্যাস ও হেরেমগুলোর কাহিনী তা বলে না। আমাদের দেশেও ঘোমটার নীচে খেমটার কাহিনীর ব্যাপার সর্বজনবিদিত ছিল। এখনও যেসব দেশে

www.pathagar.com

অবরোধ প্রথা রয়েছে সেসব দেশে ব্যভিচারের সব বিবরণ বিদেশী পত্র-পত্রিকায় যথেষ্টই পাওয়া যায়।

আবার বিরহলী গ্রামের মহিলাদের সভার নয়টি দাবীতে ফিরে আসা যাক। উপরোক্ত দাবীগুলোর প্রথম চারটিই মৌলিক মানবিক অধিকার সম্পর্কিত। স্ত্রীদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করতে হবে, শারীরিক নির্যাতন ও মারধর চলবে না, কথায় কথায় চোখ রাঙানো চলবে না, বহু বিবাহ চলবে না--এ চারটি দাবীর মধ্যে আমাদের মেয়েদের যে অবস্থা পরিস্ফুট হয়েছে তা প্রমাণ করে যে, শত প্রলেপ সত্ত্বেও আসলে তাদের মর্যাদা শ্রমিক ও বাসার কাজের লোকের চেয়েও খারাপ। বর্তমানে কোন শ্রমিক ও গৃহভৃত্যের সঙ্গেও অশালীন আচরণ করা, কথায় কথায় চোখ রাঙানো সাধারণতঃ চলে না, দৈহিক নির্যাতন ত দূরের কথা। সেদিন যে রিক্সাওয়ালার গায়ে মালিক পিন ফুটিয়ে ও মারধর করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে সেটা সচরাচর ব্যাপার নয়। এবং তার খেসারত পরদিন ঢাকার রিক্সা ব্যবহারকারী লাখ লাখ মানুষকে দিতে হয়েছে। বাসার কাজের লোকের সঙ্গেও আজকাল মোটামুটি মধুর ব্যবহারই করতে হয়, নতুবা সব কাজ নিজেকেই করতে হয়। কল-কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে চাকা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু স্ত্রীদের সঙ্গে স্বামীদের মধুর ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক নয়। রূঢ় ব্যবহার করলে, শারীরিক নির্যাতন অর্থাৎ মারধর করলেও স্ত্রী বাপের বাড়ী চলে যাওয়ার অসম্মানের ঝুঁকি নিতে পারে না কিম্বা গৃহভৃত্য বা শ্রমিকরা যেমন অন্যত্র যেয়ে চাকরি নিতে পারে তত সহজে তারা অন্যের সঙ্গে সংসার পাততে পারে না। একটা আশ্চর্য যোগাযোগ বলতে হবে যে, সংবাদ-এ যেদিন বিরহলী গ্রামের উক্ত মহিলা সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়, তার দু'দিন আগে ধনীর দুলালী এবারেরই ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থিনী সালেহার স্বামী-গৃহে অমানুষিকভাবে খুন হওয়ার খবর বেরোয়। খবরের যেসব বিবরণ খবরের কাগজে বের হয়েছে তাতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক হবে না যে, দুর্ভাগিনী সালেহার মেডিক্যাল ছাত্র স্বামীই তাঁর হত্যার নায়ক। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রথম ময়না তদন্তের রিপোর্টে এটাকে আত্মহত্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। তিন ইঞ্চি গভীর ও ছয় ইঞ্চি লম্বা করে ব্লেডের দ্বারা নিজের গলা কেটে কোন পুরুষও যে আত্মহত্যা করতে পারে না, মেয়েতো দূরের

www.pathagar.com

কথা, এ সাধারণ সত্যটি সাধারণ মানুষও জানে, আর একজন ডাক্তার 'আত্মহত্যা' বলে অভিমত দিলেন কি করে? দ্বিতীয় ময়না তদন্তে ধরা পড়েছে যে, 'সাত ভাই চম্পার একটিমাত্র বোন পারুল' সালেহাকে খুনই করা হয়েছে। সালেহার হত্যাটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, বাংলাদেশে এরকম ঘটনা হরহামেশাই হচ্ছে। বৎসরাধিককাল পূর্বে ঢাকারই দয়াগঞ্জ এলাকায় নিজের দুটি শিশুসন্তানসহ আর এক-জন গৃহবধূ পুড়ে মরেন এবং তাঁর স্বামী পলাতক হয়। 'সংবাদ' এ ঘটনাকে বহুদিন অনুসরণ করে এবং সংবাদ-এর রিপোর্টার, বার্তা সম্পাদক তার ফলে হুমকিরও সম্মুখীন হন। কিন্তু পলাতক স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়নি এবং ময়না তদন্তও হয়নি। শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি চাপাই পড়ে। এদেশে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন হয়ে আসছে কিম্বা স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেবরের অত্যাচারে অসহায় গৃহবধূ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে আবহমানকাল থেকেই। অবশ্য মধ্যবিত্তের হাতে অসাধু অর্থ দেদারভাবে আসতে শুরু করার পর এ ধরনের ঘটনা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। সারাদেশে এ ধরনের খুনের খবর পত্রিকা-গুলো ছেপে কূল পায় না। তাছাড়া খুব কম খবরই পারিবারিক সম্মানের কারণে পুলিশ বা খবরের কাগজ পর্যন্ত পৌঁছায়। চাষী-দের মধ্যেও সামান্য কারণে স্ত্রী হত্যা অনবরতই হয়। যেসব খুন পুলিশ ও খবরের কাগজের নজরে আনা হয়, সেগুলোরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন কিনারা হয় না। কারণ, আমাদের পুলিশকে অতি সহজে তুষ্ট করার ট্রাডিশান বহুদিনের। মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূদের খুন হওয়ার দায়িত্ব কেবল স্বামী ও তার পরিবারের নয়, হতভাগিনী বধূর পিতারও। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কন্যার বিত্তশালী পিতা সুযোগ্য পাত্র অর্থাৎ সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত কিম্বা ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার বা অন্য কোন ভাল চাকুরে ছোকরা পেলে তার অন্য কিছু খোঁজখবর না নিয়ে সুপাত্রটি ক্রয় করেন। এর ফলে একটার পর একটা মেয়ের জীবন রীতিমত দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভুরি ভুরি খবর আমি জানি। সালেহার হত্যাও এ কারণে। তার পিতা কেন সাত লাখ টাকা খরচ করে এই লোচ্চা হবু ডাক্তার ছোকরার কাছে মেয়ে বিয়ে দিলেন? ঠাকুরগাঁর বিরহলী গ্রামের মহিলারা যে দাবী করেছেন ছেলেমেয়েদের বিয়ে-শাদীতেও স্ত্রীদের মতামতের মূল্য দিতে হবে, তার বাস্তব কারণ নেই কি? পিতা বা মাতা কারও একতরফা

www.pathagar.com

মতে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিলে ট্রাজেডীর আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়। অবশ্য বিয়ের ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের মত্‌ই একমাত্র ধর্তব্য ব্যাপার, এ প্রথাই এখন দুনিয়ার অগ্রসর দেশগুলোতে চালু, কিন্তু এরপরও স্বামীর হাতে স্ত্রীর নির্যাতন ও হত্যা অনবরতই চলছে। আসল কথা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এখনও পুরুষের আধিপত্য পুরোমাত্রায়ই রয়েছে।

স্ত্রীহত্যাটা পুরুষের জুলুমের চরম প্রকাশ মাত্র। কিন্তু আমার জানাশোনার মধ্যে অল্প সংসারই রয়েছে, যেখানে স্ত্রী বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারে। ভ্রূকুটি, চোখ রাঙানো তো সামান্য ব্যাপার, একটা চামচ হারিয়ে ফেলার জন্য স্ত্রীকে প্রফেসর স্বামী চোরের মার মারায় তাঁর করুণ কান্না রাত এগারটায় স্বকর্ণে শোনার অভিজ্ঞতা আজিমপুর কলোনীতে আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগেই হয়েছে। অতি প্রগতিশীল 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' প্রফেসর নিজের স্ত্রীকে ঘরে রেখেই অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কাহিনীও আমি জানি। আর উচ্চপদস্থ অফিসারদের কথা! তাঁদের অনেকে নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পরস্ত্রীকে আত্মবৎ জ্ঞান করা একটা চাকরির অধিকারের অঙ্গ বলেই মনে করেন। সত্যি কিনা জানি না, আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব সম্প্রতি তাঁদের এ ব্যাপারে কড়া হুঁশিয়ার করেছেন বলে শুনেছি। এ ব্যাপারটা শুরু হয়েছে পাকিস্তান আমলেই, যখন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ শিক্ষিত ছেলেরাও গণ্ডায় গণ্ডায় সি, এস, পি হওয়া শুরু করেন। জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার একজন এম, এ পাস জজ-কন্যাকে বিয়ে করে উত্তরবঙ্গের এক মহকুমার প্রশাসক নিযুক্ত হয়ে সেখানে জনৈক ব্যক্তির আই,এ, পড়া মেয়েকে বিয়ে করেন। তারপর করাচী বদলী হলে দ্বিতীয়া স্ত্রী ও তাঁর ক্লাস নাইনে পড়া বোনকেসহ করাচী যান। তারপর দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হওয়ার পূর্বেই শ্যালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। পরে আবার প্রথমা স্ত্রীকে ঘরে এনে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করায় তিনি চীফ সেক্রেটারীর নিকট অভিযোগপত্র দেন। চীফ সেক্রেটারী এস, এম আজফার আমাকে ডেকে গোটা ফাইলটি দেখিয়ে বলেন, "আমি যদি এ নরপশুর চাকরিটা খাই, আপনারাতো বাঙালী অফিসারকে বরখাস্ত করায় আমার পিছনে লাগবেন।" আমি বলেছিলাম, এ ধরনের ব্যাপারে এখানকার কোন কাগজ কোন প্রশ্ন তুলবে না, এ গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।

www.pathagar.com

ঐ অফিসারের চাকরি গিয়েছিল। এ রকম ঘটনা বর্ণনা করতে গেলে কাহিনী আর শেষ হবে না। দিনাজপুরের বিরহলী গ্রামের মহিলা-দের সভায় গৃহীত দাবীগুলো আলোচনা করতে যেয়ে সালেহার হত্যা ও 'সংবাদ'-এর ঐ দিনের সংখ্যাতেই গাইবান্ধার কোন একটি স্কুলের ছাত্রী রীনার ফুটফুটে চেহারার ছবিসহ তার অমানুষিক হত্যার কাহিনী পড়ে আমি একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছি। এগুলো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এ আলোচনা আগামী দিনও চলবে।

২৬ এপ্রিল ১৯৭৮।

www.pathagar.com

২৩

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে "রাষ্ট্রদ্রোহী", "সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী" এ দুটি শব্দের অস্তিত্ব এদেশে কেন, গোটা উপমহাদেশটির কোন অঞ্চলেই শোনা যেত না।

অবশ্য "রাজদ্রোহ" (সিডিশান) কথাটি প্রচলিত ছিল। সিপাহী বিদ্রোহ, মোপলা বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ ইংরেজ দমন করেছে পাইকারী নরহত্যা, নারীধর্ষণ এবং নানাবিধ উৎপীড়নের মাধ্যমে। এই "রাজদ্রোহ" এবং "রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার" (Waging war against the king) দায়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বাংলার তদানীন্তন ক্রিকেট লাট বাহাদুর, বিখ্যাত খেলোয়াড় স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন "যে জেলা সূর্য সেন ও অনন্ত সিং-এর ন্যায় লোক জন্ম দেয় তাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না" (The district which can produce men like Surjya Sen and Ananta Singh cannot be ignored) এই টেলিগ্রামটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রেরণ করে গুর্খা ও ইংরেজ সৈন্য পাঠিয়ে একাধারে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের ভদ্রতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ততার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। "উপেক্ষা করা যায় না" কথাটির অর্থ ছিল হিংস্র নিপীড়ন করা এবং জালালাবাদের যুদ্ধে নিহত কিশোর টেগরার মৃতদেহকে "লাস্ট-পোস্ট" বিউগল বাজিয়ে এক রাউণ্ড গুলী শূন্যে বর্ষণের দ্বারা সম্মান প্রদর্শনের পর আত্মীয়স্বজনের নিকট সমর্পণ করা। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের এ "ভদ্রতা" পাকিস্তানের পর লোপ পায়।

আজ মনে হয়, এ আনুষ্ঠানিক "ভদ্রতার"ও একটা দাম ছিল। ইংরেজ আমলে "রাষ্ট্রদ্রোহী", "সার্বভৌমত্বের দুশমন" বিশেষণ দুটির অস্তিত্ব না থাকার কারণ ছিল, সে সময়ে আমাদের রাষ্ট্র ছিল না, ছিলাম না আমরা সার্বভৌম। ১৯৪৭ সালের পর আমরা পাকিস্তান নামক একটা রাষ্ট্র পেলাম এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বভৌম

www.pathagar.com

হলাম। কিন্তু মস্তিষ্কটা একটু বাঁকা হওয়ায় ঐ সার্বভৌমত্বের নির্ভেজালত্ব সম্বন্ধে ১৯৪৯ সালের পর থেকেই মনে নিদারুণ সন্দেহ জাগ্রত হয় এবং সে সন্দেহ "পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) অবজার্ভার" পত্রিকায় কাজ করার সময়েই প্রকাশ করেছি। এক উত্তেজিত মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব একদিন এই ঢাকাতেই "প্রেসিডেন্ট হাউসে" (বর্তমানে উপ-রাষ্ট্রপতি জাস্টিস এ, সাত্তারের দফতর) একজন সম্পাদক সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে তাঁকে নসিহত করার চেষ্টা করাতে তিনি গর্জন করে ওঠেন, "তোমরা তোমাদের ব্লাডি বদনকে বড় বেশী ব্লাডি ব্যাদান কর। সার্বভৌমত্ব! পৃথিবীতে মাত্র তিনটি ব্লাডি দেশকে সত্যিকার অর্থে সার্বভৌম বলা যায়; আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীনকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পার। তোমাদের মত ব্লাডি লোকেরা সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে ব্লাডি বড় বড় কথা বল। তোমরা জাননা ঐ ব্লাডি বড় শক্তিগুলো কিভাবে আমাদের বলে, যদি তোমরা এটা না কর তাহলে তোমাদের ভাগ্যে এটা ঘটবে। কিংবা যদি ওটা কর তবে এই ঘটবে"। ("You bloody people open your bloody mouths too bloody wide. Sovereignty! There are three bloody countries which are really Sovereign America, Russia and you may now include China also. You bloody people talk bloody big about Sovereignty. You don't know how the bloody big powers tell us what will happen to us if you do this or if don't do that.") আইয়ুবের এই বাক্যবাণে আমি পরম পুলকিত হয়েছিলাম, কারণ, তাঁর কথাগুলোর মধ্যে সারবত্তা ছিল। ব্লাডি কথাটায় ক্ষুব্ধ হইনি। সামরিক বাহিনীগুলোতে এটা পেয়ারের শব্দ। পাকিস্তান আমলের প্রথম থেকেই দেখেছি সার্বভৌমত্বের প্রতি আসল-মেকী সম্বন্ধে সচেতন না থেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে এমনকি যার চেহারা পছন্দ হয় না তাকেও ক্ষমতাসীনরা রাষ্ট্রদ্রোহী, ভারতের চর, সার্বভৌমত্বের দুশমন আখ্যা দিত; অথচ পৃথিবীর কোন সত্যিকার গণতান্ত্রিক দেশে এসব মারাত্মক অভিযোগ এমন ঢালাও ও বেপরোয়াভাবে করা কল্পনাতীত ব্যাপার। সে সব দেশে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য বিশেষ সব দফতর রয়েছে। কোন ব্যক্তি বিদেশী রাষ্ট্রের চর

www.pathagar.com

হিসাবে সে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে ঐ সব বিশেষ দফতরের লোকেরা আদালতে প্রমাণ করা যায় এমন সব সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের পর তাকে আদালতে বিচার করে শাস্তি দেয়া হয়। সরকার ও রাষ্ট্রকে এক বস্তু হিসেবে দেখা সত্যিকার গণতন্ত্রে কোন-মতেই সম্ভব নয়, কারণ, সরকারের বিরোধিতা করার স্বাধীনতা গণ-তন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ।

পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সরকার-বিরোধিতাকে রাষ্ট্র-দ্রোহিতা বলে পরিগণিত করার নীতি গৃহীত হয়। এ নীতি অনু-যায়ীই শেরে বাংলা ফজলুল হক, জনাব সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসা-নীকে রাষ্ট্রদ্রোহী, ভারতের চর আখ্যা দেয়া হয়। এমন হাস্যকর-ভাবে এ নীতি প্রয়োগ করা হয় যে, একবার বরিশালে জনৈক চাষী তার হৃষ্টপুষ্ট কিন্তু শ্লথগতি বলদের লেজ বহুবার মোচড়াইয়াও তাকে চাঙ্গাভাবে চলতে বাধ্য করতে না পেরে বিরক্তিতে বলে, "বেটা অমুকের মত (জনৈক পেট-সর্বস্ব মুসলিম লীগ নেতা) চলতাছিস ক্যান?" দুর্ভাগ্যক্রমে একজন আনসার তার কাছেই ছিল। সুতরাং নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়ে সে জেলে প্রেরিত হয়। খবরটি একটি সাপ্তা-হিকে বের হলে আমি তদানীন্তন ডেপুটি সেক্রেটারী ডেভিড খালেদ পাওয়ার সাহেবকে এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার সম্ভব হল কি করে জানতে চাইলে জবাব পেলাম, "জহুর, আমাদের জাতীয় নেতাদের প্রতি জন-সাধারণের শ্রদ্ধা অটুট রাখতে না পারলে পাকিস্তান টিকবে কি করে? তুমি কি জান না যে, আমরা শত্রু পরিবেষ্টিত। এ অবস্থায় দেশে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের প্রকাশ অঙ্কুরেই বিনষ্ট না করলে পাকিস্তান টিকবে না। ঢাকায় কায়েদে আজমের বক্তৃতা তুমি শোন নি?" বললাম, "শুনেছি। শুনে প্রমাদ গুণেছি। তোমার জন্মভূমি ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সাহেবের স্ফীত উদর নিয়ে কেউ পরিহাস, করলে কি তাকে জেলে পোরা হবে?" জবাব পেলাম, "এটা পাকিস্তান, ব্রিটেন নয়। ব্রিটেন কয়েকশ' বছর ধরে সংগ্রাম, একটা রাজার মুণ্ডপাতের পরও বহু তেল-খড় পুড়িয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে। ব্রিটেনের সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনা করাটা একান্ত অবাস্তব এবং ব্রিটে-নের অনুকরণ করার চেষ্টা করাটা অবাস্তব হবে। তুমি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং দেশপ্রেমিক। এসব কুচিন্তা ছাড়।" নাছোড়বান্দার মত বললাম, "এদেশ ত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এখনও

www.pathagar.com

শাসিত হচ্ছে। ব্রিটিশ শাসকদের প্রদত্ত সে শাসনতন্ত্রে ত কোন বিশিষ্ট সরকারী ব্যক্তিকে বলদের সঙ্গে তুলনা করলে জেলে পোরার বিধান নেই। তাছাড়া আমেরিকায় যে সামাজিক পরিস্থিতিতে ১৭৭৭ সালে যে শাসনতন্ত্রটি রচিত হয়েছে আমরা তার তুলনায় অগ্রসর। আমাদের জনতাকে নাবালক মনে করা, তাদের দেশপ্রেমকে নারীর সতীত্বের মত নাজুক মনে করার অধিকার লীগ নেতৃবৃন্দও তোমাদেরকে দিয়েছে? বাজে তর্ক করো না। এভাবে জুজুর ভয় ক্রমাগত দেখালেই পাকিস্তানের মত একটা রাষ্ট্র টিকে থাকবে না।" এবার পাওয়ার সাহেব একটু পাওয়ার দেখিয়ে বললেন, "যা বলেছ আর কোথাও বলো না। স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হবে না।" বলাবাহুল্য, কথা-বার্তা ইংরেজীতেই হচ্ছিল। প্রায় সাতাশ বছর পূর্বেকার একটা আলোচনাকে এভাবে উল্লেখ করায় কেউ কেউ নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছেন। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করতে যেয়ে কি বাজে বকছি। আমি বার বার বলেছি, অন্ততঃ আমাদের গত চল্লিশ বছরের রাজনীতির পটভূমিকার অভিজ্ঞতা স্বচ্ছ মনে পরিষ্কারভাবে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ না করলে বর্তমানকে বুঝা অসম্ভব। কেবল আওয়ামী-বাকশালীদেরই বর্তমান সকল দুর্দশার জন্য দায়ী করলে সহজের পথই বেছে নেয়া হয় এবং তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরমত অসহিষ্ণুতা, প্রতি ঝোপে রাষ্ট্রদ্রোহী দেখতে পাওয়া এবং জনতাকে লুণ্ঠন করে একটা বিশেষ শ্রেণী ও গোষ্ঠীকে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হতে দেয়াতেই পাকিস্তানে পঁচিশ বছর ধরে একটানা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সঙ্কটের পর রাষ্ট্রটা টুকরো হয়ে যায়। অবশ্য যে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে পাকিস্তানের জন্ম তাতে এর পতন একরূপ অনিবার্যই ছিল। কিন্তু যদি মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেন তবে হয়ত পাকিস্তান টিকে যেত, অন্ততঃ এত অল্প সময়ের মধ্যে এর বিভক্তি ঘটত না। ডি, কে, পাওয়ার সাহেবের মুখে সাতাশ বছর আগে যে আহাম্মকি অসহিষ্ণু মনোভাব ব্যক্ত হয়, অবিভক্ত পাকিস্তানের পঁচিশটি বছর তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে এবং ক্রমে তা তীব্রতর হয়ে ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। সুবিধাশিকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বুরোক্র্যাসি বেসামরিক ও সামরিক বাহিনীর কুচক্রী অফিসাররা মিলেই

www.pathagar.com

পাকিস্তানের বিপর্যয় ঘটায়।

বাংলাদেশ হওয়ার পর আশা করার কারণ ছিল যে, পাকিস্তানের সে সর্বনাশা ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে চলার সচেতন চেষ্টা হবে। মুসলিম লীগের পরমত অসহিষ্ণুতার প্রধান শিকার ছিল আওয়ামী লীগ। মুসলিম লীগ দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের অস্বীকৃতির ফলেই পাকিস্তান আন্দোলনের সম্মুখের সারির নেতৃদ্বয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী এবং তরুণ নেতা শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যরা বেরিয়ে গিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পরে আওয়ামী লীগ সংগঠন করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে আওয়ামী লীগের অবস্থা ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের ন্যায়ই ছিল। আওয়ামী লীগারদের পঁচিশ বছর ধরে যথেষ্ট নিপীড়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। যেটা মুসলিম লীগারদের করতে হয়নি। কিন্তু নিপীড়নের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আওয়ামী নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগেরই পদাঙ্কানুসরণ করেন। মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যজনক পরিণতির পর ন্যাপ (মো) ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে তল্পিবরদার হিসাবে নিয়ে দেশপ্রেমের 'সোল এজেন্সী'র দাবীদার হন, যেমন হয়েছিলেন ১৯৪৭ সালের পর মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ। পাকিস্তান আন্দোলনে যেমন জিন্নাহ্ সাহেবের ব্যক্তিপূজার বান ডেকেছিল, ছয়দফা আন্দোলনের পর শেখ সাহেবের ভাবমূর্তি একইভাবে তৈরী করার চেষ্টা শুরু হয়। এর অর্থ এ নয় যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ব্যাপারে শেখ সাহেবের অবদান বিন্দুমাত্র খাটো করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অকম্পিত নেতৃত্বকে অস্বীকার করে যাঁরা বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাস থেকে বহিষ্কৃত" তাঁদের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, তাঁদের নাম ত ইতিহাসের ধারে-কাছেই নেই। কোন ব্যক্তি এককভাবে কোন আন্দোলনের বা দেশের জন্ম দেন না। পরিবেশ ও পরিস্থিতিই একটা আন্দোলনের জন্ম দেয়, একটা জাতির মনকে বারুদাগারে পরিণত করে। নেতার অভ্যুদয় হয় ঐ পরিস্থিতির প্রয়োজনে, সে নেতা ঐ বারুদাগারে অগ্নি-সংযোগে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। উপরোক্ত পরিস্থিতির সুযোগ যে দল ও নেতা নিতে পারেন সে নেতা ও দল তখন সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্গবন্ধুর ও আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। সুতরাং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ব্যাপারে

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের ভূমিকাকে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টাকে আমাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিমূলে আঘাত বলে ধরে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর রয়েছে কি? তবে এ চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বাংলাদেশ পাকিস্তানের ন্যায় একটা জগাখিচুড়ি দেশ নয়। পাকিস্তানের জন্মের ভিত্তি ছিল একমাত্র ধর্ম। কেবল ধর্মই যে জাতি সৃষ্টি করতে পারে না তার জন্য অতীত ইতিহাসে যাওয়া প্রয়োজন করে না, বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের দিকে তাকালেই তা বুঝা যাবে। বাংলাদেশ একটি সংহত দেশ। নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষার দিক দিয়ে আমরা এক সূত্রে গ্রথিত। সুতরাং পাকিস্তানের মত ভেঙ্গে যাওয়া বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সম্ভবই নয়। তবে অসহিষ্ণু রাজনীতির ফলে আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সঙ্কট ও অনিশ্চয়তা যে ঘনাতে পারে সেটা উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে কি?

ব্যক্তিপূজার দ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করার পরিবর্তে এর দ্বারা তাঁর চরম ক্ষতিই যে করা হচ্ছে এটা তিনি যে বুঝেননি এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। "এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ"—এ শ্লোগান যখন দেয়া শুরু হয় তখনই আমার কানে ঠেকেছে যে, এটা গণতান্ত্রিক শ্লোগান নয়, একেবারে হিটলারের নাৎসী জার্মানীর শ্লোগান। বাঙালীর চরিত্র যে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিপূজা ও রেজিমেন্টেশানের অনুকূল নয়, পাকিস্তান ও জিন্নাহ সাহেবের নামের জজবা পাকিস্তান হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে কর্পূরের মত উবে যেতে শুরু করার ফলেই তা প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দণ্ডায়মান হয় তাতে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তাও একইভাবে দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। এ দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ আওয়ামী নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা এবং সাধারণভাবে আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্রহীনতার জন্য, যে চারিত্রিক অধঃপতন শুরু হয় পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে গত মহাযুদ্ধকালীন সৃষ্ট অসাধু উপায়ে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার সুযোগ পরমানন্দে গ্রহণ করার ফলে।

বর্তমানে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে ভারতে সম্পদ পাচারের অভিযোগ যখন করা হচ্ছে তখন অতি সুবিধাজনকভাবে ভুলে যাওয়া হয় পাকিস্তান আমলে সব সময়েই ভারতে চোরাচালান অব্যাহত গতিতে চলেছে। ১৯৫০-৫১ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের সময়ে

www.pathagar.com

পাট রফতানীর দ্বারা অর্জিত শ' শ' কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা শিল্পায়নে ব্যয় না করে বিভিন্ন বিলাসদ্রব্য অবাধ আমদানী লাইসেন্সের দ্বারা আমদানী করে যে বাজার ভরিয়ে ফেলা হয়েছিল তার অধিকাংশ যে ভারতে চোরাচালান হয়েছিল তার প্রমাণ কলকাতার পথেঘাটেই সে সময়ে দেখা গিয়েছে। স্বাধীনতার পর আন্তর্জাতিক রেডক্রসের প্রেরিত সাহায্যদ্রব্য ঢাকার নিউ মার্কেটে ও কলকাতার ফুটপাতে বিক্রি হয়েছে, ঠিক তেমনি পঞ্চাশ দশকের পর পর ভয়াল বন্যার সময়ে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের প্রেরিত দ্রব্যাদি পাটুয়াটুলীর দোকানগুলোতে এবং কলকাতার চৌরঙ্গী-ধর্মতলার ফুটপাতে বিক্রি হওয়ার কথা অজানা নয়। এদেশের কোন একটি জেলার নিখিল পাকিস্তানী নেতার চোরাচালানের ব্যাপারে দক্ষতা সকলেরই জানা কথা। পাকিস্তানী আমল, এমনকি আইয়ুবের মার্শাল ল'র আমলেও এদেশের পাট দিয়েই কলকাতার মিলগুলো অনেক সময়ে চালু থেকেছে। মাঝে মাঝে দু'-তিন শিফ্‌ট্‌ও কাজ করেছে। অথচ বর্তমানে যে ধরনের প্রচার চলেছে তাতে মনে হয়, এ দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার একমাত্র বাংলাদেশ হওয়ার পরই শুরু হয়েছে, পাচারকারী ও দুর্নীতিবাজ একমাত্র আওয়ামী লীগপন্থীরাই। এর অর্থ যদি করা হয় যে, প্রকারান্তরে আওয়ামী লীগের দুর্নীতিকে সমর্থন করা হচ্ছে, তবে আমি অপারগ। দুর্নীতি দুর্নীতিই—তা সে যে দল বা ব্যক্তিই করুক না কেন। দুর্নীতিবাজদের কোন দল নেই, দেশ নেই, ধর্ম নেই। তারা নিজেরা একটা সম্পূর্ণ আলাদা শ্রেণী। অর্থই—তা যে উপায়েই অর্জিত হোক না কেন—তাদের উপাস্য। দুর্নীতির চেয়ে রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতাকে আমি বেশী বিপজ্জনক মনে করি। এ অসহিষ্ণুতা কেবল রাজনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করে না, দুর্নীতিরও শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক। কারণ, একটা অসহিষ্ণু রাজনৈতিক পরিবেশে মানুষ দুর্নীতি সম্বন্ধে খোলাখুলি বলতে পারে না, লিখতে পারে না। অসহিষ্ণু রাজনীতি অনিবার্যরূপে রাজনৈতিক সঙ্কট চূড়ান্ত করে তোলে, সেটা কি বলার অপেক্ষা করে? এবং সঙ্কটের এ চূড়ান্ত রূপের ফলে শেষ পর্যন্ত দুর্নীতি চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ার অভিজ্ঞতা আমাদের একাধিকবার হয়েছে। আওয়ামী লীগের আমলে যে দুর্নীতির স্রোত বয়ে গিয়েছিল, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আজ যাঁরা দুর্নীতির জন্য আওয়ামী লীগের দিবারাত শ্রাদ্ধ করছেন তাঁরা কি সব মোহান্ত? বর্তমানে দেশ থেকে কি দুর্নীতি

www.pathagar.com

উপড়ে ফেলা হয়েছে ? আওয়ামী লীগ তার দোষ-ত্রুটি-ব্যর্থতার জন্য কি অনুচিত চরম মূল্য দেয়নি ?

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দু'কন্যা ছাড়া পরিবারের আর সকলকে নির্মমভাবে দুনিয়া থেকে অপসারিত করা হয়েছে। একই-ভাবে নিহত হয়েছেন আরও কয়েকজন আওয়ামী নেতা। আওয়ামী লীগ সংগঠনের অস্তিত্ব লোপ পেলেও বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নাম ইতিহাসের পাতায় ভাস্বর হয়ে থাকবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। প্রেসিডেন্ট জিয়ার নাম থাকবে স্বাধীনতার ঘোষক এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেনানী হিসাবে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ও জাগদল আঁতুড় ঘরে থেকেই ক্ষমতা ভোগ করলেও তারা আঁতুড় ঘরের বাইরে যেয়ে দেশের জীবনে কিছু ছাপ রাখতে পারবেন কি ? অতীতের অসহিষ্ণু রাজনীতির জের গত প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে যেভাবে তাঁরা টেনেছেন এবং এখনও টেনে চলেছেন তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে আঁতুড় ঘরে থাকা-কালীনও তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে গজ-কচ্ছপের লড়াই লেগে গেছে। এসবের ফল দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সহায়ক হচ্ছে কি ?

৯ আগস্ট ১৯৭৮।

www.pathagar.com

২৪

হাতে আজকের 'ইত্তেফাক'টা। একটা ছবি প্রথম পৃষ্ঠার উপরের দিকেই তিন কলাম জুড়ে অবস্থান করছে। ছবিটা জুড়ে কেবল পানি, আর কিছুই নেই। দূরে গাছপালা। ছবিটার দিকে বিশেষ নজর না দিয়েই দৃষ্টি অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল। গত সপ্তাহাধিককাল ধরে বন্যায় মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার আভাসমাখা অনেকগুলো ছবি বিভিন্ন কাগজে দেখেছি। এটাতে ত পানির একটা আস্তরণ ছাড়া আর কিছুই নেই। হঠাৎ ছবিটির নীচে ছোট অক্ষরের লেখাটা নজরে পড়ল— "একদা যেখানে পানির জন্য দাবী উঠিয়াছিল।" একসংগে অনেক কথা মনে পড়ে গেল। এ পানি নিয়ে এ দেশে একেবারে বিপরীতমুখী রাজনীতি দেখার দুর্ভাগ্য আমাদের গত পঁচিশ বছর ধরে হয়েছে। অল্প কথায় স্মৃতিচারণটা করার আগে ইত্তেফাক-এর সংবাদদাতা আলমগীর হোসেনের ডেসপ্যাচের ক'টা লাইন তুলে দেই। "এই কানসাটে দাঁড়াইয়াই ১৯৭৬ সনে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী এদেশের মানুষের মরা-বাঁচার প্রশ্নে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিসসার জন্য দাবী তুলিয়াছিলেন। আজ সেই কানসাট পানিতে পানিতে ভরিয়া গিয়াছে। এ পানি জনগণকে বাঁচানোর জন্য নয়, ইহা মানুষের জন্য মরণ পানি। -------- এলাকার একজন কৃষক এই বন্যার পিছনে কাহারও হাত রহিয়াছে বলিয়া মনে করেন। মধ্যবয়সী এই কৃষক তাহার বয়সে অনেকবারই বন্যা দেখিয়াছেন। কিন্তু এভাবে রাতারাতি পানি বৃদ্ধি পাইয়া জনবসতিকে জনশূন্য করা তিনি কখনও দেখেন নাই।" এই "কাহারও হাত" সম্বন্ধে অন্য পত্রিকাগুলোতেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ধোঁয়াটে-ভাবে খবর ছাপা হয়েছে। ব্যাপারটা কি? কথা নেই বার্তা নেই এমন একটা অকালবন্যা এসে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভাসিয়ে নিয়ে আউশ, আমন, পাট, আখ সব নষ্ট করে দিল, বেশ কিছু মানুষকেও ডুবিয়ে মারল আর তার কারণ সম্বন্ধে সরকার থেকে শুরু করে গলাবাজ

www.pathagar.com

বিপ্লবী নেতারাও পরিষ্কার কিছু বলছেন না। এত সঙ্কোচ এক-সঙ্গে সকলের জিহবাকে আড়ষ্ট করে দিল কেন, রহস্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না। গোটা ব্যাপারটা একেবারে জলবৎ তরলং—এ দু'য়ের কোন্‌টা বলব, নিদারুণ সমস্যায় পড়ে গেছি। সবচেয়ে তাজ্জব লাগছে আমাদের পানি মন্ত্রী জনাব বি, এম, আব্বাসকে (এ,টি) এ ব্যাপারে একটি কথাও বলতে না দেখে। আব্বাস সাহেব যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পানি-বিশারদ সে বিষয়ে অন্ততঃ আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। এদেশে একটার পর একটা আমল এসেছে আর গেছে, কিন্তু সকলেই আব্বাস সাহেবের কদর ক্রমবর্ধমান হারে এ কারণেই বিনা-দ্বিধায় করে গেছেন।

ফারাক্কা বাঁধের আগে আমাদের খরার সমস্যা ছিল না, ছিল অতিরিক্ত পানি বা বন্যার সমস্যা। বস্তুতঃ সমস্যা দুটো বরাবরই ছিল। কিন্তু পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে পর পর কয়েকটা ভয়াল বন্যার পর আমাদের সকল দলের রাজনীতিবিদদেরই মনোযোগ একান্তভাবে নিবিষ্ট হয় বন্যার ওপরই। সমস্যাটা যে আসলে নেপালে ও তিব্বতে-উৎস যে দু'টি বিশাল নদী (ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা) এ উপমহা-দেশের পূর্বাঞ্চলের তিনটি রাষ্ট্রের জনগণের জীবনকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে সে দু'টিকে বশ করা, এই সত্যটি পরিষ্কার হলেও রাজনীতির টানাপোড়নে কিছু করা যায়নি। তবু এদেশের মানুষের দাবীতে ক্রুগ মিশন এসে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে একটা রিপোর্ট পেশ করে। পাকিস্তান সরকার ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ করেও সিন্ধু নদের পানি নিয়ে ভারতের সঙ্গে বিবাদটা ১৯৬০ সালে মিটিয়ে ফেলে নির্বিঘ্নেই। কিন্তু ক্রুগ মিশন রিপোর্টটা কেবল পেশ করাই সার হলো। এ সম্বন্ধে পাকিস্তান সরকারের ভারতের সাথে আলোচনা করার কোন খবর দেখেছি বলে স্মরণ হয় না, যদিও এদেশের তদানীন্তন সব সরকার-বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দই ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের দাবীতে বছরের পর বছর মুখর ছিলেন। এরপর ভারত হঠাৎ কল-কাতা বন্দরকে বাঁচানোর অজুহাতে ফারাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা গ্রহণ করল। পর পর ক'বছর ব্যাপক বন্যা না হওয়ায় আমরা তখন মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হলাম। এদেশে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ শুরু হল। কিন্তু সব ব্যাপারের ন্যায় এদেশের এ জীবন-মরণ সমস্যার ব্যাপারে 'পিণ্ডির চিমে-তেতালা নীতি অব্যাহত

www.pathagar.com

রইল। একের পর এক ফারাক্কা আলোচনা দু' রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে হতে লাগল। কিন্তু ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণকাজ চালিয়ে যেতেই লাগল। এসব আলোচনার একটিতে পাকিস্তানের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব সঈদ জাফরী পাকিস্তান ডেলিগেশনের নেতৃত্ব করেন। এর পরপরই 'পিণ্ডি যেয়ে জনৈক বাঙালী অফিসারের সংগে দেখা হলে আমি ক্ষোভ প্রকাশ করে বললাম, "ব্যাটারা পূর্ব বাংলাকে তাচ্ছিল্য কি রকম করে দেখেছেন। আব্বাস সাহেবের মত পানি-বিশারদ থাকতে ডেলিগেশনের নেতা হিসেবে কিনা পাঠালো সঈদ জাফরীর মত 'মাউড়ারে', যে কোনদিন পূর্ব বাংলায় এক মাসও থাকেনি।" জবাব পেলাম, "আর ওয়াপদার পানি-বিশারদদের কথা বলবেন না। এরা কোন তথ্যই নিয়ে যায়নি। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারেনি। জাফরী সাহেব কোন রকমে গোলমাল করে মুখটা বাঁচিয়েছেন।" খটকা লাগায় জাফরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। জাফরী সাহেবের সঙ্গে সম্পর্কটা ভাল ছিল। প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতেই খাস লক্ষ্ণৌইয়া জবানে তিনি খুবই অশালীন সব বিশুদ্ধ উর্দু আলফাজ (শব্দ নিচয়) আমাদের পানি-বিশারদদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করে যা বললেন, তার মর্মার্থ হলো, আব্বাস সাহেব সমেত আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা কোন তথ্যাদি যোগাড় না করে ঐ আলোচনায় যোগ দিতে যাওয়াতে ডেলিগেশনের নেতা হিসেবে তিনি বিষম অসুবিধায় পড়েছিলেন। "এক্সপার্ট একদম আনপড়্ হ্যায়।" আমি স্বভাবতঃই ক্ষুণ্ণ ও রুষ্ট হয়ে ভেবেছিলাম যে, "বেটা 'মাউড়া'! আমাদের এত বড় পানি-বিশারদের মগজের কদর বুঝলে ত।" পুরোন কাসুন্দি আর ঘেঁটে কি হবে।

ভারত ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশ হওয়ার আগেই শেষ করে ফেলে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আমরা বুঝলাম ভারত আমাদের মরুভূমিতে পরিণত করার জন্য বদ্ধপরিকর। আওয়াজ তুললাম, 'ফারাক্কা বাঁধ মরণফাঁদ ; উড়িয়ে দাও, উড়িয়ে দাও।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সরকারের সঙ্গে ইন্দিরা সরকারের এ ব্যাপারে একটি চুক্তি হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে সাব্যস্ত হয়ে গেছে, "শেখ মুজিবুর রহমান ভারতীয় দালাল" এবং ঐ চুক্তিটা একেবারে বাংলাদেশকে বেচে দেয়ার সামিল। বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন। তার আগেই শুনেছিলাম যে, আমাদের গর্ব ভয়াল কীর্তিনাশা পদ্মার বারোটা বেজে গিয়েছে,

www.pathagar.com

সে বালুচরে ডুবে নিখোঁজ হয়ে গেছে। ব্যাটা 'মালাউনরা' আমাদের শুকিয়ে মারার যোগাড় করেছে। পানি-বিশারদ আব্বাস সাহেব ছিলেন পাকিস্তান সরকারের পানি উপদেষ্টা, শেখ সাহেবের আমলে তাই এবং তাঁর মৃত্যুর পরও তাই। এবার তিনি "মালাউনরা আমাদের এক বদনা পানি দিচ্ছে না" বলে মাঠে নেমে পড়লেন। কে জানি সে সময়ে বলেছিল যে, ব্যাটা ইণ্ডিয়ানরা বলছে যে, ওয়াপদার পানি-বিশারদরা আমাদের কাছে পানি সম্বন্ধে যে তথ্য পাঠাবার কথা ছিল তা বারবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও না পাঠানোয় তারা ফারাক্কা প্রকল্প চালু করে দিয়েছে। শুনেই আমি লাফিয়ে উঠে বলেছিলাম যে, ব্যাটা 'মাউড়াদের' মতই ব্যাটা 'মালাউনরা' আমাদের জাতীয় গৌরব পানি-বিশারদের কুৎসা করা শুরু করেছে। সব ব্যাটারা আমাদের পানি-বিশারদের প্রতিভার হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরে যাচ্ছে। তার কিছুদিন আগেই আমাদের এত পানি দরকার কেন বিবিসি প্রতিনিধি এ প্রশ্ন করায় জনাব আব্বাস এ ধরনের জবাব দিয়েছিলেন, "কেন? আমরা পানি দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করি (হুইস্কী দিয়ে নয়) পানি দিয়ে গোসল ও অন্যান্য জরুরী কার্যাদি সম্পন্ন করি, কাপড় ধুই, চাষবাস করি।" জনাব আব্বাসের এ জবাবের পর তাঁর সম্বন্ধে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আরও গাঢ় হয়।

তারপর '৭৬ সালের সেই ঐতিহাসিক ফারাক্কা অভিযান (ইত্তেফাক সংবাদদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত)। মওলানা ভাসানী ডাক্তারদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে কয়েক ক্রোশ পায়ে হেঁটে জনতাসহ অগ্রসর হয়ে সীমান্তের কয়েক মাইল দূরে হল্ট (halt) করে একটা গরম বক্তৃতা দিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। প্রথমে একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে পরে জ্ঞানোদয় হয়েছিল যে, মওলানার ঐতিহাসিক অভিযানের ভয়েই 'মালাউনরা' ফারাক্কার পানি নিয়ে গোলমাল করার সকল দুরভিসন্ধি তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে। নিশ্চিন্ত হলাম। এরপর ফারাক্কা সম্বন্ধে আর কোন কথা এতদিন সত্যি শুনিনি।

এবার হঠাৎ বন্যায় প্রথমে ভেবেছিলাম, এটা আল্লাহতালারই গজব। তারপর ভাবলাম তাইবা হয় কি করে? এখন ত 'ইসলামদ্রোহী' আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় নেই। আল্লাহ্ বেহুদা আমাদের ওপর নারাজ হবেন কেন? তারপর কানাঘুষা শুনতে লাগলাম ভারত নিজের পানির ঠেলা সামলাতে না পেরে ফারাক্কা বাঁধের উপর

www.pathagar.com

নীচ সর্বদিক দিয়ে পানি ছেড়ে দেয়াতেই এ চকিত বন্যা। স্পষ্টভাষী অতি ঘুরিয়ে এ কথাটাই কিছুদিন আগে অতি তাজিমের সাথে আরজ করেছেন। ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এ তাজিমের সঙ্গে ইঙ্গিতের কারণ বোঝা গেল না। যা হোক পরম সুহৃদ স্পষ্টভাষী তবু কথাটা পেড়েছেন।

বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার এবং ইন্দিরা পরাজিত হয়ে জনতা পার্টি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ভারত সরকার এখন প্রতিবেশীদের ব্যাপারে একেবারে পরম বৈষ্ণবনীতি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এ বন্যার কারণ নিয়ে গোলমালেই রয়ে গেলাম। আমাদের পানি মন্ত্রী আব্বাস সাহেব কয়েকদিন আগে দিল্লী গিয়েছেন কাগজে দেখেছি। সেখানে তিনি এ বন্যার প্রশ্নটা আলোচনা করেছেন কিনা এবং করলে তার ফলাফল কি, জানতে পারলে এ ব্যাপারে সকল খটকার অবসান হত।

নদীর পানি নিয়ে রাজনীতির পানি ঘোলা করার পক্ষপাতী আমি কোন সময়ে ছিলাম না, এখনও নই। পঁচিশ বছর পূর্বেকার বন্যার সময়েই শুনেছিলাম যে, ভারত, পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ), নেপাল, চীন—এ চারটি রাষ্ট্রের সহযোগিতা ছাড়া গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রকে বশে আনা যাবে না এবং এ অঞ্চলটাকে বন্যা ও খরার কবল থেকে মুক্ত করার বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকরী করা সম্ভব না। রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে এতদিন তা করা যায়নি। বর্তমানে এ উদ্যোগ গ্রহণের একটা মোটামুটি ভিত্তি রয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় উদ্যোগ নেয়া সম্ভব কি?

বন্যাদুর্গতদের জন্য শুকনো সহানুভূতি দেখানো ছাড়া কি আর করতে পারি। রিলিফের ব্যাপারে সেই ট্রাডিশান সমানে চলেছে।

৩০ আগস্ট ১৯৭৮।

www.pathagar.com

২৫

ঘটনাটি একটু আকস্মিকভাবেই ঘটলো। রোববার রাতে বাতি নেভাবার আগে শুনলাম যে, ত্রিশ মাইল বেল্টনী রচনা করে মুক্তি-বাহিনী নমপেনকে ঘিরে ফেলেছে। ভিয়েতনাম বাহিনী আর এক-বার নমপেনের ত্রিশ মাইলের কাছাকাছি পৌঁছে ফেরত আসে। সতরাং বিশেষ গা করলাম না। তবে কাম্পুচীয়-ভিয়েতনাম বাক ও বুলেট যুদ্ধে গত ক'দিন ধরে প্রথম প্রথম 'মুক্তি বাহিনী' শব্দ দু'টির উল্লেখ দেখে একটু খট্‌কা লেগেছিল। ভোরে উঠে খবরের কাগজে দেখি, "কাম্পুচীয় জাতীয় মুক্তি বাহিনীর হাতে নমপেনের পতন হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী ও পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল পল পট্, উপ-প্রধানমন্ত্রী ইয়াং সেরি, রাষ্ট্রপ্রধান খিউ সাম্পান ও কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য নেতারা চীনা বিমানযোগে দেশত্যাগ করেছেন।" রীতিমত হকচকিয়ে গেলাম। ভিয়েতনাম-সমর্থিত এই মুক্তি বাহিনীর অস্তিত্বের কথা জানতে পাই মাত্র সেদিন—দু' সপ্তাহও হয়নি। যে খেমার রুজ বাহিনী মার্কিন কর্তৃক ঢালাওভাবে সমর্থিত লন নল বাহিনীকে উৎখাত করে ১৯৭৫ সালের ১৭ই এপ্রিল নমপেন দখল করে, সেই দুর্ধর্ষ বাহিনীর প্রতি-রোধ এরূপ তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল কি করে? কাম্পুচীয় জাতীয় মুক্তি বাহিনী ভিয়েতনাম-সমর্থিত নয়, আসলে ভিয়েতনামী-রাই কাম্পুচীয় সেজে আগ্রাসী অভিযান চালাচ্ছে এবং ভিয়েতনাম রাশিয়ারই 'লাঠিয়াল'--এসব অভিযোগ যদি সত্যিও হয়, তবু ডিসে-ম্বরের ২৫ তারিখ থেকে যে অভিযানের শুরু, সে অভিযান ৭ই জানু-য়ারী নমপেন দখলে এনে একেবারে অন্য লাল পতাকা উড়িয়ে দিল, ব্যাপারটা কি? একটু কেমন ঠেকে না কি? দোহাই আল্লার, পাঠক-পাঠিকারা মনে করবেন না যে, আমি সবজান্তার পোজ করছি। যখন থেকে কাম্পুচিয়া ও ভিয়েতনামের মধ্যে বাক ও বুলেটের সংঘর্ষ শুরু হয়, অর্থাৎ বছরাধিক কাল পূর্ব থেকেই আমি এমনকিছু একটা ঘটবে ধারণা করে আসছি।

www.pathagar.com

আমার ধারণাটা ভিয়েতনামের প্রতি সহানুভূতির কারণে বা উভয় রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির তুলনামূলক বিচারপ্রসূত নয়। খেমার রুজ বাহিনীর নমপেন প্রবেশের বিবরণ কিছুটা জানতে পেরেই আমার ধারণা হয় খিউ সাম্পানের সরকার টিকবে না। এ কারণেই আমি খেমার রুজ কর্তৃক ক্ষমতা দখল সম্বন্ধে এযাবৎ কোন মন্তব্যই করিনি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার নামে অনেক সময়ে মানবতাবাদ-বিরোধী কার্যকলাপও সমর্থন করতে বন্ধু-বান্ধবদের সেই স্টালিনের আমল থেকে দেখে আসছি। যদি "সাম্যবাদ" মানবতাবাদ-বিরোধী হয় তবে সে "সাম্যবাদ" একটা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে যে পরিণত হয় তা দেখেছি। আবার ভুয়া "মানবতাবাদের" ধুয়া সাম্রাজ্যবাদের প্যালা হিসেবে যে কাজ করে তাও দেখেছি। খেমার রুজ বাহিনী নমপেনে ঢুকে যেভাবে বন্দুক, পিস্তল, অটোমেটিকের নলের আগায় নারী, বৃদ্ধ, শিশু, যুবা, অশক্ত প্রায় প্রত্যেকটি শহরবাসীকে গ্রামের পথে রওনা হতে বাধ্য করে তার বিবরণ বিভিন্ন কাগজে পড়ে আমি আঁৎকে উঠি। কেবল নমপেনে নয়, প্রায় প্রত্যেকটি শহরেই এমন করা হয় জঙ্গল পরিষ্কার করা ও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির অজুহাতে। খেমার রুজ প্রধানতঃ চাষীদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং শহরবাসীদের তারা অপ্রয়োজনীয় এবং শোষকশ্রেণীর মানুষ বলে ঢালাওভাবে দেখে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার যে, খিউ সাম্পান নিজে ফ্রান্সের সোর্বোন (Sorbonne) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কিন্তু সব ধরনের গোঁড়ামির চেহারা-চরিত্র শেষ পর্যালোচনায় একই। কেবল শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও খেমার রুজ সরকার সামান্যতম অসহযোগিতার বিরুদ্ধে যে অমানুষিক নৃশংস নীতি গ্রহণ করে তার দুর্বিষহ বিবরণ ও চিত্র গত সাড়ে তিন বছর ধরে আমি মার্কিন পত্র-পত্রিকা—টাইম, নিউজউইক-এ দেখে বার বার শিউরে উঠেছি। মার্কিন পত্র-পত্রিকা হলেই সেগুলোর রিপোর্ট অবিশ্বাস করা আর কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকার ভাষ্যকে বেদবাক্য মনে করার মানসিকতাকে কোনদিনই যুক্তিসঙ্গত মনে করিনি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কীর্তিকাহিনী মার্কিন পত্রিকাগুলোতেই উদ্‌ঘাটিত হয়, আর কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকায় তথ্য কম থাকে, গালাগালিটাই বেশী। এক চীনের সঙ্গে ছাড়া পলপট সরকার দুনিয়ার আর কোন দেশের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখেনি। চীন ও মার্কিনের সম্পর্কের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাম্পুচিয়ার বর্তমান সরকার সম্বন্ধে মার্কিন মনোভাব একটু

www.pathagar.com

উষ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু কাম্পুচিয়ার জনসাধারণ যে এ সরকার সম্বন্ধে বিশেষ প্রীত থাকতে পারে না সেটা উপরোক্ত সব বিবরণ থেকেই আন্দাজ করতে পারছিলাম। ৯০ লাখ লোকের দেশ কাম্পুচিয়া। লন নলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হয় প্রায় এক লাখ লোক। কিন্তু খেমার রুজ সরকারের চণ্ডনীতির ফলে দশ লাখেরও বেশী লোক নিহত হয়েছে গত সাড়ে তিন বছরে। এসব সংখ্যা আমি পেয়েছি নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ১৯৭৮ সালের "বিশ্ব আলম্যানাকে" (The World Almanac & Book of Facts 1978)। সংখ্যাগুলো পাওয়া গিয়েছে খেমার রুজ সরকারের নিপীড়নে লাখ লাখ দেশত্যাগী যেসব কাম্পুচীয় থাইল্যাণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে তাদের কাছ থেকে। প্রচুর সংখ্যক কাম্পুচীয় ভিয়েতনামেও আশ্রয় গ্রহণ যে করেছে এ তথ্যও কারো অজানা নয়। এসবের ফলেই আমার ধারণা হয় যে, কাম্পুচিয়ার নতুন সরকার বেশীদিন টিকতে পারে না।

এই এলাকার পরিস্থিতিই রুশ-চীন সম্পর্কের অবনতির প্রেক্ষিতে জট পাকিয়ে গেছে এবং বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠেছে। ভিয়েতনামীরা ফরাসী ও আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ত্রিশ বছর ধরে প্রধানতঃ নিজেদের জনতার জঙ্গী সংগঠনের মাধ্যমেই। তারা চীন ও রাশিয়া উভয়ের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে সত্যি; কিন্তু হো চি মিনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সহনশীলতা, নগুয়েন ভো গিয়াপের ও আরও কয়েকজন ভিয়েতনামী জেনারেলের অসাধারণ রণকৌশল এবং সর্বোপরি ভিয়েতনামী জনতার অবিস্মরণীয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম ফরাসী ও মার্কিন—এ দু'টি শক্তিরই বিপর্যয় ঘটায়। ফরাসীরা ১৯৪৯ সালে কাম্পুচিয়াকে ফরাসী ইউনিয়নের ভেতর "স্বাধীনতা প্রদান" করে। ১৯৫৩ সালে যখন ফরাসী বাহিনী দিয়েন বিয়েন ফু'তে ভিয়েতনামী জেনারেল গিয়াপের সেনাবাহিনীর দ্বারা ঘেরাও হয়ে আত্মসমর্পণের যোগাড় করছে, তখন রাজা সিহানুক কাম্পুচিয়াকে সামরিক দিক দিয়েও স্বাধীন করেন। উল্লেখ করা যায় যে, সিহানুককে ১৯৪১ সালে জাপানীরাই রাজা করেন। ১৯৫৫ সালে পিতাকে "রাজা" করে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হন। ভিয়েতকংরাই কাম্পুচিয়ার খেমার চাষীদের সামরিকভাবে সংগঠিত করতে শুরু করলে সিহানুক মার্কিন সাহায্যপ্রার্থী হন; কিন্তু তিনি কিছুদিন ভিয়েতকংদের সঙ্গে ফ্লার্ট করায় আমেরিকানদের বিশেষ আস্থাভাজন হতে

www.pathagar.com

পারেননি শেষ পর্যন্ত। ভিয়েতকং ও খেমার রুজ বাহিনী একযোগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-সমর্থিত নমপেন ও সায়গন সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। মার্কিন বোমারু বিমান কাম্পুচিয়ার ভিয়েতকং বাহিনীর ওপর বোমা বর্ষণ করে এবং এক পর্যায়ে মার্কিন সেনাবাহিনীও কাম্পুচিয়ায় প্রবেশ করে। এসবও সিহানুক সমর্থন করেন। ১৯৭০ সালে সিহানুক বিদেশে থাকাকালীন মার্কিনী খাস তাঁবেদার লন নল ক্ষমতা দখল করে ও সিহানুক চীনে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে খেমার রুজ ক্ষমতা দখল করলে আশা করা গিয়েছিল, ভিয়েতনামী ও কাম্পুচীয় জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে। কিন্তু হলো ঠিক বিপরীত। কাম্পুচিয়া ও ভিয়েতনামের মধ্যে বহুরাধিক কাল ধরে সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছিল। ভিয়েতনাম সরকার বারবার উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু নমপেন তা অবজ্ঞার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। নমপেনকে সমর্থন দিতে থাকে চীন।

ভিয়েতনামীরা যে কাম্পুচীয় শরণার্থীদের দ্বারা একটা বাহিনী গড়ে তুলেছে সেটা ২৫শে ডিসেম্বরের অভিযানের আগে অন্ততঃ আমি জানতাম না। এখন দেখা যাচ্ছে, একজন কাম্পুচীয় জেনারেলই এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। একটা কথা পরিষ্কার, পল পট ও খিউ সাম্পানের সরকারের পেছনে জনসমর্থন থাকলে এত শিগগির নমপেনের পতন হত না। এ লেখার সময়েই বি, বি, সি-তে শুনলাম, সাম্পান সরকারের অধিকাংশই জাতীয় মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে। বিচিত্র ব্যাপার নয় আমার কাছে।

সিহানুক নমপেনের পতনের কয়েকদিন আগে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে জাতিসংঘে নালিশ করার জন্য নিউইয়র্কের পথে পিকিং-এ থেমে ৬ ঘন্টাব্যাপী এক প্রেস কনফারেন্সে বারবার হাসি-কান্নার মধ্যে কাম্পুচিয়াকে "ভিয়েতনামী আগ্রাসন" থেকে বাঁচাবার জন্য জাতিসংঘ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানান। তিনি বলেন, "আমি পল পটকে পছন্দ করি না। তবে ভিয়েতনামী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমি তাঁর সরকারকে সমর্থন করি।" পল পট ও তাঁর সাথীরা কোথায় আছেন তা সিহানুক জানেন না, তবে তিনি আন্দাজ করেন যে, তাঁরা গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে প্রতিরোধ সংগঠিত করছেন।

www.pathagar.com

জাতিসংঘে মার্কিন দূত মিঃ এ্যাণ্ড্রু ইয়ং বলেছেন যে, আমেরিকা নতুন সরকারকে স্বীকৃতি না দিলেও যে সরকার (পল পট) নিজেদের দেশের জনগণকে নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতন করেছেন তাদের কেউ সমর্থন দিতে পারে না। নিউইয়র্ক পৌঁছাবার পর প্রিন্স সিহানুক ঘোষণা করেছেন, থাই সীমান্তের দু'টি শহর বাদে সমগ্র কাম্পুচিয়া ভিয়েতনামীদের দখলে। চীন "ভিয়েতনামী আগ্রাসনের" তীব্র নিন্দা করলেও তার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কেউ এখনো দেখছে না। সিহানুক নিজেই বলেছেন, আমরা চীনা সৈন্য চাই না, অস্ত্র চাই।

আমরা বাঙালীরা চাই, এই তিন যুগের অশান্ত ও রক্তসিঞ্চিত এলাকায় শান্তি ও শুভবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হোক।

১০ জানয়ারী ১৯৭৯।

www.pathagar.com

২৬

এ লেখা বেরুবে পঁচিশে মার্চ। অন্ততঃ আমাদের জেনারেশনের কারও মন থেকে এ দিনটির ভয়াবহতার স্মৃতি মৃত্যু পর্যন্ত মুছে যাবে না। অবশ্য যারা পাকিস্তানী জল্লাদদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল এবং এখনও যাদের মানসিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা হয়ত পঁচিশে মার্চকে একদিন উৎসবের দিন হিসেবে এদেশে পালন করার দিবাস্বপ্ন দেখছে। কিন্তু যতদিন বাঙালী জাতির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন প্রতিটি বাঙালী সন্তান এ দিনটি একাধারে প্রিয়জন হত্যার অসহনীয় বেদনা ও দাঁতে দাঁত চেপে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মরণপণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার সঙ্কল্প গ্রহণ করার দিন হিসেবে স্মরণ করবে। কোন আনুষ্ঠানিকতা, কোন বক্তৃতা-গলাবাজি এ শোক-বেদনা, এ সঙ্কল্পের অভিব্যক্তি দিতে পারে না। এটা অনুভূতি-উপলব্ধির ব্যাপার। প্রতি বছর এই দিনে একটা মুহূর্তের জন্যও যদি আমাদের মনে পড়ে আজ পঁচিশে মার্চ তাহলেই নিশ্চিতভাবেই মনে করা যাবে জাতি হিসেবে আমরা অমর--কোন চক্রান্ত আমাদের জাতিসত্তাকে বিলুপ্ত করতে পারে না। বাঙালী চরিত্রের, বিশেষ করে বাঙালী মধ্যবিত্তের চরিত্রের কঠোরতম মনের জ্বালা মিটাতে যেয়ে অনেক সময়ে বেহিসেবী সমালোচক হয়েও আমি নিশ্চিত যে, উপরোক্ত উপলব্ধি এ জাতির মন থেকে শত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেও কোনদিন মুছে যাবে না। বস্তুতঃ পঁচিশে মার্চের উপলব্ধির উৎপত্তি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বর হামলার ফলেই হয়নি ; পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সামগ্রিক অভিযান চালিয়েছিল আমাদের জাতিসত্তাকে সমূলে উৎখাত করার জন্য, নিদেন-পক্ষে চিরকালের জন্য দাবিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু তার বহু আগে থাকতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় এক পরি-কল্পিত প্রচেষ্টা আমাদের জাতীয় সত্তাকে পিষে মারার জন্য। ১৯৪৮

www.pathagar.com

সালের মার্চ মাসে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে মিঃ জিন্নাহ্ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে নসিহত করেন যে, অতঃপর বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচী এসব ভুলে যেয়ে সকলকে নিছক পাকিস্তানী বনে যেতে হবে এবং উর্দু কেবলমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। একটি জাতিসত্তা যে এভাবে হুকুমের দ্বারা গড়ে ওঠে না তা জিন্নাহ্ সাহেব উপলব্ধি করলেন না। একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্র-ভাষা করলে আমাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বলে যে কিছু থাকবে না--এটা প্রথম উবপলব্ধি করে আমাদের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সমাজ। ১১ই মার্চের সূচিত ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ। জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ অবশ্য আমাদের বহু শতাব্দীর। একমাত্র ইংরেজ আমলেই কলকাতার গুরুত্ব অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে এ স্বাতন্ত্র্যবোধ কিছুটা চাপা পড়েছিল। পাকিস্তানের কুহকে পড়ে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হলেও যখন বাঙালী মুসলমান দেখল যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের নামে আসলে উর্দুভাষী উত্তর ভারতীয় মুসলিম শাসক ও শোষকশ্রেণী এদেশকে একটা পাক্কা কলোনী হিসেবে গড়ে তুলতে চাচ্ছে এবং এটা করার জন্য আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে বন্ধ্যা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে চরমভাবে বঞ্চিত রাখতে বদ্ধপরিকর, তখন তাদের মোহভঙ্গ হতে দেরী হল না। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী বন্দুকের গুলীর ঝলকে বাঙালী মুসলমান নিজের সত্তাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের উৎখাতের মাধ্যমে তারা সেই সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে অনেক দূর অগ্রসর হলো। তারপরের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করার প্রয়োজন এ নিবন্ধে নেই। পাকিস্তানী শাসকচক্র ১৯৫৪-এর নির্বাচনের সন্দেহাতীত রায়কে গভর্নরের শাসনের মাধ্যমে নস্যাৎ করে দিয়ে এবং পরে বাঙালী নেতৃ-বৃন্দের মধ্যে ছলে-বলে-কৌশলে বিভেদের সৃষ্টি করে দিয়ে আমাদের জাতীয়তাবাদের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সামরিক শাসনের চরম দাওয়াই প্রয়োগ করল। তারপর তারা মৌলিক গণতন্ত্রের মারফত এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও উন্নয়নের নামে নির্লজ্জ দুর্নীতির মাধ্যমে একটা তাদের তল্পিবাহক মহলের সৃষ্টি করার প্রাণপণ প্রয়াস পায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। পাকি-স্তানী শাসকগোষ্ঠীর সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তকে সবল পদাঘাতে অগ্রাহ্য

www.pathagar.com

করে আমাদের জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি অব্যাহত রইল।

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের পতনের পরই পাকিস্তানী শাসকচক্র স্থির করে এদেশবাসীর মাজা ভেঙ্গে দিতে হবে, এদের এমন মার দিতে হবে যে, তারা যেন আর জন্মেও মাথা তুলতে না পারে। তাদের পরিকল্পনাটি ছিল অতি সরল। প্রথমে তারা চেষ্টা করবে একটা সাধারণ নির্বাচন দিতে। ঢালাওভাবে অর্থ ব্যয় করে যদি তারা তাদের পদলেহী যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য পার্লামেন্টে নির্বাচিত করতে পারে, তবে তারা বিভেদ সৃষ্টি কর ও শাসন কর (divide and rule) নীতি চালাবে আর তা না হলে পাইকারী গণহত্যা। এ শয়তানী পরিকল্পনার কথা পাকিস্তানী জেনারেল ফজল মুকিম খাঁর বইতেই বর্ণিত হয়েছে। তবে এ পরিকল্পনার আসল অংশটি প্রকাশিত হয়নি। পাকিস্তানী রাজনীতির অলিগলির সন্ধান রাখতাম বলে আমি এটা জানতাম এবং এ সম্বন্ধে আগে আমি উল্লেখও করেছি। পাকিস্তানী শাসকরা ভেবেছিল হিন্দুদের হত্যা করতে শুরু করলেই তারা দলে দলে ভারতে চলে যেয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবে, যার ফলে অবাঙালী মুসলমানেরা লাখে লাখে এদেশে হিজরত করবে। ইতিমধ্যে বাঙালী মুসলমান যত পারা যায় মেরে তাদের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা হবে। এদেশে নতুন করে যদি আর পঞ্চাশ লাখ অবাঙালী মুসলমান ভারত থেকে আমদানী করে হিন্দুদের জায়গায় বসানো যায়, তবে বাঙালী মুসলমানরা জীবনে কোনদিন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না—এটা ছিল উপরোক্ত পরিকল্পনার মূল কথা। এই দানবীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যবস্থা চলতে থাকে প্রায় সারা ১৯৭০ সাল ধরে, যখন ইয়াহিয়া খান গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি অহরহ দিয়ে যাচ্ছেন। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী অসংখ্য অফিসার ও জোয়ানদের যে বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে তা আমি হঠাৎ পিণ্ডিতে টের পেয়ে যাই ১৯৭০-এর মাঝামাঝি। সে সময়ে অনেককে এ সম্বন্ধে আমি বলেছি। কেউ গুরুত্ব দেননি।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব একতরফা জয়লাভ উপরোক্ত পরিকল্পনার গণহত্যা কার্যক্রম অনিবার্য করে তুলে। আজ পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ এর দায়িত্ব একা ভুট্টোর ওপরই চাপাচ্ছেন। ভুট্টো যে এ পরিকল্পনার একজন প্রধান হোতা ছিলেন

www.pathagar.com

সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি একা দোষী নন। এ লেখা যখন বেরুবে তখন ভুট্টোর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। কিন্তু এ পরিকল্পনার অন্যসব অংশীদার এখনও পাকিস্তানে বহাল তবিয়তে রয়েছেন এবং তারা ক্ষমতায় আসীন এবং তাদের প্রসাদ-ভোগী বাঙালী মীরজাফররা আজ এদেশে সক্রিয়। উপরোক্ত দানবীয় পরিকল্পনার নৈতিক যুক্তি দেখানো হয়েছিল ইসলাম ও পাকিস্তানের হেফাজত করা। ইসলামের নামে এ নারকীয় কাণ্ড আল্লাহ্-তায়ালার মনঃপূত না হওয়াতেই পাকিস্তানীদের এ শয়তানী পরি-কল্পনা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। উদ্দীপ্ত-ক্রুদ্ধ বাঙালী জাতীয়তা-বাদের লেলিহান অগ্নিশিখায় পাকিস্তানী শাসক-শোষকচক্রের বাঙালীকে গোলাম বানাবার স্বপ্ন নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কেবল তাই নয়, পাকিস্তানের মৃত্যুঘন্টা যে বেজে উঠেছে সেটাকে অস্বীকার করতে পারে যারা বাস্তবতার দিকে ইচ্ছে করে চোখ বুজে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু বাংলাদেশ অমর। আমাদের মধ্যে শত বাদ-বিসম্বাদ থাকতে পারে; বহু ব্যর্থতার, বহু মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আমাদের মনকে অনেক সময়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবার উপক্রম করতে পারে; কিন্তু পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াল রাতের এবং তার পরবর্তী নয় মাসের উন্মা-দনাময় দিনগুলোর স্মৃতি কেবল আমাদের জেনারেশনের নয়, আমা-দের সন্তান-সন্ততির জন্য রক্ষাকবচের কাজ করবে। যতদিন এ জাতির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এর সন্তান ভুলবে না যে, ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দুনিয়ার বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও সমবেদনা আমরা পেয়েছি। এ কারণেই ২৫শে মার্চে আমাদের এক চোখে অশ্রু ও অপর চোখে আগুন—আমাদের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল চক্রান্তকে প্রতি-হত করার দীপ্ত অঙ্গীকার।

২৫ মার্চ ১৯৭৯।

www.pathagar.com

২৭

এ লেখা বেরুবে পয়লা বৈশাখ। পয়লা বৈশাখ এখন আমাদের জাতীয় উৎসবের দিন হিসেবে সরকারীভাবেই স্বীকৃত। বিশ বছর আগে এমন ছিল না। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র ব্যবসায়ী-রাই পয়লা বৈশাখ উদযাপন করত হালখাতা খোলার দিন হিসেবে। মধ্যবিত্তদের দু'চারজনই সচেতন ছিল পয়লা বৈশাখের আবেদন সম্বন্ধে। হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে কিছু বেশী লোক বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানালেও আরও অনেক বেশী সংখ্যক পয়লা জানুয়ারীতেই "হ্যাপি নিউ ইয়ার" পরস্পরকে জানিয়ে তৃপ্তি পেত। ইঙ্গ-বঙ্গ মুসলমানরাও তাই করত। পাকিস্তান হওয়ার পরই বাঙালী মুসলমানেরা নিজে-দের জাতীয় সত্তা সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করল পাকিস্তানী রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণকারী উর্দুভাষী অবাঙালী মুসলমানদের দৌরাত্ম্যে। এ সচেতনতা প্রথমে শুরু হয় মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই; যারা ছিল মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধের ধারক-বাহক এবং যারা এগিয়ে এসে পাকিস্তান আন্দোলনের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ না করলে এ রাষ্ট্রটির জন্মই হত না। কিন্তু ইতিহাসের পরিহাসে পাকিস্তানই বাঙালী মুসলমানের সুপ্ত জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করল আপন মহিমায়। এ সুপ্তিভঙ্গের প্রথম প্রকাশ ঘটে বাংলাকে রাষ্ট্র-ভাষা করার দাবীতে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ছাত্র ধর্মঘটে। পাকি-স্তানের শাসক শ্রেণী ভাষা আন্দোলনের বিপদ উপলব্ধি করতে দেরী করেনি। বলপ্রয়োগের যে নীতি তারা গ্রহণ করে তা উক্ত জাতীয়-তাবাদের দ্রুত ব্যাপ্তিরই সহায়ক হয়।

১৯৫১ সালে ওয়ারীর সাত নং হেয়ার স্ট্রীটে কয়েকজন লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, অধ্যাপক মিলে "লেখক-শিল্পী মজলিস" নামে একটি সংগঠন করে রেলওয়ের মাহবুব আলী ইন্সটিটিউটে এদেশে প্রথম পয়লা বৈশাখ সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

গ্রহণ করেন। সেদিন সন্ধ্যায় সে অনুষ্ঠানে যে লোকসমাগম হয়েছিল তা উদ্যোক্তাদের রীতিমত হকচকিয়ে দেয়। বুঝা গেল ইতিহাস সকলের অলক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আয়োজন তেমন কিছুই ছিল না। মঞ্চসজ্জা যা ছিল তা দেখলে আজকের যে কোন পাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মীরাও নাক সিঁটকাবেন। অনুষ্ঠানের জন্য রসিদ বই ছাপিয়ে দু'টাকা, এক টাকা, সর্বোচ্চ পাঁচ টাকা করে আমার যতদূর স্মরণ হয় সাত-আটশ' টাকা উঠেছিল। তখনকার দিনের প্রেক্ষিতে কম টাকা নয়। আমার মনে আছে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডাইরেক্টর অব পাবলিসিটি মরহুম মাহমুদ হোসেন ভাইয়ের কাছ থেকে অনুষ্ঠানের আগে যখন পাঁচ টাকা চাঁদা নিচ্ছিলাম তখন তাঁর কামরায় এক্সাইজ কমিশনার ওয়াজির আলী শেখ উপস্থিত ছিলেন। ভদ্রলোক অবিভক্ত ভারতেই আই, সি, এস হয়েছিলেন এবং পাঞ্জাবের একেবারে প্রথম কাতারের পরিবারের লোক। তাঁর কাছেও চাঁদা চাইলে অত্যন্ত নফরতের সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন, "বৈশাখী ত শিখলোগ (শিখেরা) করতা হায়।" জবাব দিয়েছিলাম, "এটা আমাদের নববর্ষ। বৈশাখী শিখেরা করে কিনা সে খোঁজে আমার দরকার নেই। বাংলা বছর প্রবর্তিত হয়েছিল মোগলদের দ্বারাই ফসলের সূত্র ধরে।" ওয়াজির আলী শেখ সাহেব এ কথায় সন্তুষ্ট হননি, বন্ধ হয়নি সেদিনের শাসকদের বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশকে পিষে মারার প্রচেষ্টা। পরের বছরই একুশে ফেব্রুয়ারী বাঙালী জাতীয়তাবাদের কাফেলা অভিষিক্ত হল রক্তের রাজটিকায়। এদেশে পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল, অনিবার্য হয়ে উঠল বাঙালীর স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। ১৯৫১ সালের পয়লা বৈশাখ যেন পটভূমিকা রচনা করে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীর। এই পয়লা বৈশাখ আমাদের প্রথম আন্দাজ ও আত্মবিশ্বাস দেয় আমাদের অভিযাত্রী জাতীয় চেতনার গভীরতা সম্বন্ধে। সেদিনের পয়লা বৈশাখে মাহবব আলী ইন্সটিটিউটের মঞ্চটি আমার চোখের সামনে এখনও জ্বলজ্বল করে ভাসছে। মঞ্চের উপর উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ও অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। মঞ্চের উপর উপস্থিত অনেকের মধ্যে এ তিনটি নামের কেন উল্লেখ করলাম তা বলার প্রয়োজন নেই, তবুও বলছি, এ তিনজনের একজনও রাজনীতি করতেন না। তাঁরা

www.pathagar.com

বিরাজ করতেন পুরোপুরি মানস ও মননের জগতে। তবে সে মানস ও মনন একান্তভাবেই নিয়োজিত ছিল বাঙালীর জাতীয় চেতনার মহান জাগৃতির জন্য। কোন রকম প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের সযত্নে দূরে রাখলেও ১৯৭১-এ পাকিস্তানী সেনারা ও তাদের সহায়তাকারীরা এ তিনজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে নিছক সৎ বাঙালী হওয়ার অপরাধে। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে এরা হত্যা করে ২৫শে মার্চের সেই কাল রাতেই, আর অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে তারা নিয়ে যায় ১৪ই ডিসেম্বর রাতে। বিশেষ করে পয়লা বৈশাখের সূত্রে এঁদের কথা আমার আর একবার মনে পড়ে।

১৯৫১-এর পয়লা বৈশাখ সম্বন্ধে আমি আগেও প্রায় একই কথা লিখেছি। তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন পাঠকেরা হয়ত একই কথার পুনরাবৃত্তিতে বিরক্তি বোধ করতে পারেন। কিন্তু পুনরাবৃত্তি আমি সচেতনভাবেই অতীতের অর্থবহ কোন কোন তারিখের ব্যাপারে করি। ব্যক্তি হিসেবে কারো কারো স্মরণশক্তি আমার ঈর্ষারই কারণ। কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা যে আত্মবিস্মৃতিতে ভুগি সে সম্বন্ধে বোধ হয় কোন বিতর্ক হবে না। ১৯৫১-এর পর বছর থেকেই দেশের আনাচে-কানাচেও উৎসাহের সঙ্গেই ১লা বৈশাখ উদযাপিত হয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের ক'জনের মনে আছে ১৯৫১-এর ১লা বৈশাখের কথা? লেখক-শিল্পী মজলিশের অস্তিত্ব বোধ হয় দু'বছরের মধ্যেই লোপ পায়। আজ এ প্রতিষ্ঠানটি যে এদেশে প্রথম পয়লা বৈশাখ ও পঁচিশে বৈশাখ উদযাপনের আয়োজন করেছিল একথা উক্ত মজলিসের কর্ম-কর্তাদেরও কারো মনে পড়ে বলে মনে হয় না। ১৯৫১-এ পয়লা বৈশাখ ও পঁচিশে বৈশাখ উদযাপনের ব্যাপারে প্রতিরোধ এসেছিল সঙ্গে সঙ্গেই। পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে একটি বছর ছয়েকের বাচ্চা-মেয়ে নাচ পরিবেশন করেছিল। জনৈক গিরগিটি চরিত্র সাহিত্যিক-সাংবাদিক এই বাচ্চা মেয়ের নাচ উপলক্ষেই সেদিন একটি পত্রিকায় উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের অশ্লীল ভাষায় যে আক্রমণ করেছিলেন এ কথা আজকের "থিয়েটার" বা "নাগরিক" গোষ্ঠীর কেউ জানেন কি? ১৯৫১-এর কথা দূরে থাক ১৯৭১-এর কথাই আমাদের চেত-নায় কতটুকু রয়েছে? একদিক দিয়ে এ আত্মবিস্মৃতি অস্বাভাবিক বা বিপজ্জনক ব্যাপার নয়। ক'জন ইংরেজের গত মহাযুদ্ধের সময়ে

www.pathagar.com

১৯৪০-৪১-এ তাদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের (Battle of Britain) বা ক'জন আমেরিকানের পার্ল হার্বারের গ্লানিকর পরাজয় ও আমেরিকার বিপজ্জনক অবস্থার কথা মনে আছে? অতীতের স্মৃতির ভার নিশিদিন বহন করা মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়, উচিতও নয়—একথা অত্যন্ত সত্য। কিন্তু আমাদের জাতীয়তাবাদের যাত্রাপথের কাহিনী একটু ভিন্ন প্রকৃতির। ১৯৫১-৫২ সালে আমাদের জাতীয়তাবাদের অগ্রগতিকে যারা স্তব্ধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে এদেশে জন্মগ্রহণ করেও তাদের অনেকে আজও সে জাতীয়তাবাদের প্রতি বৈরিতা অন্তর থেকে বিসর্জন দিতে পারেনি। ১৯৫১ থেকে '৭১—এই কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যাঁরা ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন, যাঁরা ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের অনেকে ১৯৭১-এ আমাদের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধতা করেছেন। যে স্বল্প ক'জন নেতা এ সময়ের মধ্যে নিজেদের জাতীয় সত্তার ব্যাপারে কোনরূপ আপোষের মধ্যে যাননি তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রধানতম। ১৯৭২-এর পর তাঁর সরকারের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সমালোচনামুখর হয়েও আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বকে ধামাচাপা দেয়ার কোন প্রচেষ্টা ইতিহাসের ধোপে টিকবে না—একথাটা যাঁরা বুঝেন না, দুর্ভাগ্য তাঁদের। 'আজাদ'-এর বহুদর্শী প্রধান সম্পাদক জনাব মুজিবুর রহমান খাঁ সম্প্রতি তাঁর কলামে (বুজর-চে-মেহের) মন্তব্য করেছেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শারীরিকভাবে না থাকলেও মানসিকভাবে তাঁর অস্তিত্ব যে পুরোমাত্রায় রয়েছে তার বাস্তব প্রমাণ পার্লামেন্টে তাঁর প্রতিকৃতি বুকে এঁটে উনচল্লিশ জন সদস্যের উপস্থিতি।

ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না—এটা একটা সর্বকালের আন্তর্জাতিক সত্য। তবুও আমাদের দেশে গত ত্রিশ-বত্রিশ বছরে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করা, ইতিহাসকে ক্ষমতাসীনদের নিজেদের খেয়ালখুশীমত ঢেলে সাজাবার চেষ্টা যতবার হয়েছে তার নজির কোন দেশে রয়েছে কিনা খুঁজে পাওয়া ভার হবে। প্রতিটি চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে, তবুও এ চেষ্টা থামেনি। জাতীয় চেতনা, সংস্কৃতিবোধ, সাহিত্য, শিল্প—এসব যে কারো হুকুম অনুযায়ী চলতে পারে না, এ সহজ অথচ ধ্রুব সত্যটি গত বত্রিশ বছরে বারবার উপেক্ষিত হতে দেখেছি এবং প্রতিবারই অঘটন ঘটেছে। ফেরদৌসী গজনীর

www.pathagar.com

দিগ্বিজয়ী প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান মাহমুদের উদ্দেশে লিখেছিলেন, "হে সুলতান, তুমি আমাকে মত্ত হস্তীর পদতলে পিষে মারার ভয় দেখিয়েছ। তুমি জান না যে, কবির অন্তর কত শত মত্ত হস্তীর বল ধরে।" মনে হয়, ১৯৪৭ সালেই ফেরদৌসীর এ বহুল প্রচারিত কথাটি আমাদের মাথা থেকে বেমালুম উবে গিয়েছে। আমাদের বলতে গত বত্রিশ বছরে যে দলই ক্ষমতায় গেছেন তাঁদেরই বখানো হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার পরও এ ঐতিহ্য ছেদহীনভাবেই চলতে থাকে। বর্তমানে একান্ত অবান্তরভাবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের পাল্টা হিসেবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নামে এক বস্তুকে দাঁড় করাবার চেষ্টা হচ্ছে। এ চেষ্টার ফলে বাঙালী জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে সচেতনতা আরও তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাবে, একথা আমি বলি একটি সাপ্তাহিকের একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় ছোট একটি লেখায়। কথাটি সত্য প্রমাণিত হচ্ছে কিনা, সে বিচার আমার করার কথা নয়। বিতর্কটি ক্রমে তিক্ততার দিকে যাচ্ছে। এখনও কি শুভবুদ্ধির উদয় হবে না? এ বিতর্কের কোন প্রয়োজন ছিল কি এবং রয়েছে কি?

এবারের পয়লা বৈশাখ মনে হবে একটু বেশী ব্যাপক আকারেই অনুষ্ঠিত হবে। রমনার বটমূলে ছায়ানট গত বেশ কয়েক বছর যাবৎই সকালে অনুষ্ঠান করে আসছে। শুনলাম এবার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পয়লা বৈশাখের আগমন মুহূর্তেই অর্থাৎ রাত ১২টা ১ মিনিটের সময় থেকেই ঐ বটমূলেই আড়ম্বরের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরুর মাধ্যমে নববর্ষকে আহবান জানাবে। আইডিয়াটা মন্দ নয়। সারা পশ্চিমা দুনিয়া ৩১শে ডিসেম্বরের রাত বারটার ঘন্টাধ্বনি শুরু হওয়ামাত্র হল্লোড়ের মাধ্যমে নববর্ষকে অভিনন্দন জানাতে শুরু করে। প্রচণ্ড শীতেও তাদের উৎসাহে এতটুকু ঘাটতি কখনও হয় না। সুতরাং আমরাও যদি তাই করি তবে মন্দ কি? কিন্তু কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন যে, সকালে ছায়ানটের অনুষ্ঠানের আগে যদি জাতীয়তাবাদী দলের অনুষ্ঠান শেষ না হয় তবে বটতলার অধিকার নিয়ে একটা সংঘাত লেগে যেতে পারে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারের পাদদেশ দলীয় সংঘাত ও উচ্ছৃঙ্খলতায় একটি জাতীয় শোক দিবস কলঙ্কিত হতে দেখার দুর্ভাগ্য আমাদের হয়েছে। এবারও একুশে ফেব্রুয়ারী সংঘাতমুক্ত

www.pathagar.com

থাকতে পারেনি। সুতরাং এবারের পয়লা বৈশাখ নিরুপদ্রবে কেটে গেলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস নেব। তবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলও যে ১লা বৈশাখ উদযাপনের তাগিদ অনুভব করছে এটাকে আমি এক হিসেবে বাঙালী জাতীয় চেতনারই স্বীকৃতি বলে মনে করছি। ১৯৫১ সালে যখন আমরা ১লা বৈশাখ উদযাপন করি তখন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কথা আমাদের মাথায় ছিল না ; ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতির দাবী। বাঙালী জাতীয়তাবাদকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টার ফলেই বাংলাদেশের অভ্যুদয়। আজকের বাংলাদেশের জন্মের পর বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে মনে করাটা কেমন কথা ?

নতুন বছর আমাদের জাতীয় জীবনকে সার্থকতায় ভরে তোলার সহায়ক হোক—এই দুরাশা করেই আজ ক্ষান্ত হই।

১৫ এপ্রিল ১৯৭৯।

www.pathagar.com

২৮

মনে হয় পাকিস্তানের পাপের ভরা পূর্ণ হয়ে আসছে। সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক তাঁরই প্রতিশ্রুত আগামী ১৭ই নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনকে হয় অর্থহীন করে তোলা নতুবা আবার বাতিল করার 'যুক্তি' দাঁড় করাবার বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলেছেন। জেনারেল হকের জারি করা বিধি অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে দলের নাম রেজিস্ট্রি করতে পিপল্‌স্ পার্টি; পি, এন,এ; এন, ডি, পি; পি, এন, পি প্রভৃতি প্রধান রাজনৈতিক দল অস্বীকার করায় তাদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র নির্বাচন কমিশন বাতিল করে দিয়েছেন। একমাত্র পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টিরই প্রায় ছ'শ' পঞ্চাশ জন প্রার্থীকে আগামী ১৭ই নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। পিপল্‌স্ পার্টি যে সামগ্রিক হিসাবে বর্তমানে পাকিস্তানে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এন, ডি, পি-তে ওয়ালী খান ও বেগম ওয়ালী খান থাকাতে এ দল যে পাঠান এলাকায় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী তা স্বতঃসিদ্ধভাবেই ধরে নেয়া যায়। এ ছাড়াও এ দলে এমন সব অপেক্ষাকৃত তরুণ রাজনৈতিক নেতার সমাবেশ হয়েছে যার ফলে পাঞ্জাবে ও করাচীতে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রভাব একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। পাকিস্তান ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতৃত্ব দিচ্ছেন গউস বক্স বেজেঞ্জো, সর্দার আতাউল্লাহ খান মেঙ্গল, সর্দার খায়ের বক্স মারী প্রমুখ প্রায় তিন দশক ধরেই বেলুচ জাতির স্বাধিকার দাবীতে উৎসর্গিতপ্রাণ নেতৃবৃন্দ। ১৯৭৭ সালে ভুট্টোর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল পাকিস্তান ন্যাশনাল এ্যালায়েন্স। পি, এন, এ, সে সময়ে প্রায় সবগুলো বিরোধী দলেরই ঐক্যজোট ছিল। ভুট্টোর পতনের পর এয়ার মার্শাল আসগর খানের তেহরিক-ই-ইশতেকলাল সর্বপ্রথম পি, এন, এ থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর বেগম ওয়ালী খান, ওয়ালী খান,

www.pathagar.com

মজহারী প্রমুখ ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গঠন করে নিজেদের ভিন্ন মত ও পথ বেছে নেন। তারপর বেজেঞ্জো, মারী, মেঙ্গল আলাদা পার্টি করেন। তাঁরা জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান ও পি, এন, এ'র সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। তবুও মুফতী মাহমুদের জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জামাতে ইসলামী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, পীর পাগারোর মুসলিম লীগ, খাকসার প্রভৃতি দলের ঐক্যজোট হিসাবে পি, এন, এ'র রাজনৈতিক শক্তি মোটেই অবহেলার যোগ্য ছিল না। উপরোক্ত সবগুলো রাজনৈতিক দলই প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের রেজিস্ট্রি করার প্রস্তাবকে অবমাননাকর মনে করে রেজিস্ট্রি করতে অস্বীকার করায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পাকিস্তানে ইতিমধ্যেই চরম ঘোলাটে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে রূপ পরিগ্রহ করল তার সম্ভাব্য পরিণতি এই রাষ্ট্রটির পক্ষে মারাত্মক হবে বললেও কম বলা হবে। অবশ্য একেবারে শেষ মুহূর্তে পি, এন, এ'র অঙ্গদল জামাতে ইসলামী রেজিস্ট্রি করে দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল করাতে পি, এন, এ কিছুটা দুর্বল হল বলে আপাততঃ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জেনারেল জিয়াউল হক আজ পাকিস্তানকে যে পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তাতে উপরোক্ত নির্বাচন হলেও বাঁচোয়া নেই, না হলেও বাঁচোয়া নেই। জামাতে ইসলামীর মত পাল্টানো পরিস্থিতির ইতরবিশেষ করবে না।

ভুট্টোর পতনের পর জেনারেল জিয়াউল হক পি, এন, এ'র সক্রিয় এবং আনুষ্ঠানিক সমর্থন পেয়েছিলেন। এমন কি ওয়ালী খান পর্যন্ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, আগে ভুট্টো ও তাঁর অনুসারীদের কৃতকর্মের শাস্তি হোক, তারপরে নির্বাচন করা যাবে। ওয়ালী খান, আসগর খান প্রমুখের ভুট্টো ও পিপলস পার্টির বিরুদ্ধে তিক্ত হওয়ার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল, একথা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েও সে সময়েই এ কলামে বলা হয়েছিল যে, ওয়ালী খান ও অন্যেরা ভুল করলেন। রাজনৈতিক নেতাদের সকল কাজের জবাবদিহি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মারফত জনগণের আদালতে হওয়া উচিত। অবশ্য আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধগুলো যেমন খুন, জুলুম-জবরদস্তি, সরকারী তহবিল তছরুফ বা অপব্যবহার ইত্যাদি ধরনের অপরাধের বিচার শেষ পর্যন্ত আদালতেই হবে, কিন্তু এ বিচারের ব্যবস্থা করবে জনপ্রতিনিধি-

www.pathagar.com

দের সরকার। একটি ডিকটেটরী সরকারের উৎখাত জনগণ জঙ্গী সংগ্রাম-আন্দোলনের মারফত যে করতে পারে এ উদাহরণ সমসাময়িককালের ইতিহাসেও যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু জনতার অভ্যুত্থানের সুযোগে যদি সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে তবে জনতা তার ঈপ্সিত রাজনৈতিক দুষ্কর্মের কৈফিয়ত পাওয়ার বদলে ফুটন্ত কড়াই থেকে খোদ আগুনেই পড়ে।

আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়ার আমলের তাজা অভিজ্ঞতার পরও ওয়ালী খান, আসগর খান, মুফতী মাহমুদ প্রমুখ নেতা ভুট্টোকে শায়েস্তা করার জন্য জেনারেল জিয়াউল হককে সমর্থন করে গণতান্ত্রিক রাজনীতির মৌলিক নীতির যে বরখেলাফ করেন আজ তার পুরো মাশুল দিতে হচ্ছে। ক্ষমতা দখলের সময়ে জিয়াউল হক ঘোষণা করেছিলেন ৬০ দিনের মধ্যে পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করে তিনি ব্যারাকে ফিরে যাবেন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের আগে ভুট্টোর ও তাঁর অনুসারীদের শাস্তি ও পরে নির্বাচন এবং নেজামে মোস্তফা প্রতিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণ করে জিয়াউল হক সামরিক আইন প্রশাসক, চীফ অব স্টাফ এবং ফজলে এলাহীর পদত্যাগের পর প্রেসিডেন্টও হয়ে বসে দু'মাসের পরিবর্তে দু'বছর পাকিস্তানের সর্বময় এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী শাসক হয়ে বসে রয়েছেন। কিছুদিন পর মুফতী মাহমুদ ও অন্যান্য সহযোগিতাকারী রাজনৈতিক নেতা জিয়াউল হকের সরকার থেকে সরে যান। ওয়ালী খাঁ'র ন্যায় যাঁরা সরকারে যোগ না দিয়ে মোটামুটি সমর্থন জিয়াউল হককে দিচ্ছিলেন তাঁরাও দূরত্ব রক্ষার নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু উপরোক্ত রাজনৈতিক নেতাদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে একদিকে জেনারেল জিয়াউল হক সুযোগ ও সময় পেলেন নিজের খুশীমত পৃথক নির্বাচন প্রথা, ভোটের আনুপাতিক ভিত্তিতে আসনের বন্টন, পাকিস্তানের আদর্শ অর্থাৎ ইসলামী সমাজব্যবস্থায় তাঁরই ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিশ্বাস এবং নিজেদের পার্টির হিসাব দাখিলের দ্বারা সরকারের নিকট রেজিস্ট্রি করা প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের জন্য বাধ্যতামূলক করে সমগ্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিজের বুটের তলায় নিয়ে আসতে। অপরদিকে জেনারেল জিয়াউল হকের আমলে পাকিস্তানের জনসাধারণের জীবনে অর্থনৈতিক সঙ্কট দ্রুত ঘনীভূত হওয়ায় জনমনে যে

www.pathagar.com

বিক্ষোভ জমা হচ্ছিল তার ফায়দা জিয়াউল হকের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ এককালীন সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলো স্বভাবতঃই পেল না, পেল ভুট্টোর পিপল্‌স্ পার্টি সরকার বিরোধিতার কারণে। ভুট্টোর বিচারের প্রহসনে ও তাঁর অপ্রত্যাশিত ফাঁসির ফলে পিপল্‌স্ পার্টি তার হারানো জনপ্রিয়তা দ্রুত ফিরে পেতে লাগল এবং অন্যদিকে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল জিয়াউল হকের মতলব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠায় জেনারেল হকের প্রত্যক্ষ এবং সামগ্রিক সমর্থনকারী রইলেন একমাত্র খান আব্দুল কাইয়ুম খান--যিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই চর সাদ্দায় মসজিদের ভেতরেও পাঠানদের ওপর মেসিনগানের গুলী চালিয়ে ও ট্যাংক চালিয়ে একজন জালেম হিসেবে নাম কেনেন। অথচ পাকিস্তান হওয়ার অল্প কিছুদিন আগ পর্যন্ত অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে তিনি ছিলেন কংগ্রেস পরিষদ দলের ডেপুটি লীডার। তাছাড়া লিয়াকত হত্যার ব্যাপারে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকাও পাকিস্তানে প্রায় সর্বজনবিদিত। কাইয়ুম খাঁ'র সমর্থন ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়ে পাঠান এলাকায় এবং পাকিস্তানের অন্য সব এলাকায় দেখা গেছে একেবারে নগণ্য। পাঠান মুল্লুকে ঐ সময়ে প্রভাব ছিল প্রধানতঃ ওয়ালীর নেতৃত্বে ন্যাপের এবং মুফতী মাহমুদের জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের। ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর যে সব রাজনৈতিক ঝড় পাকিস্তানের ওপর দিয়ে বয়ে যায় সেগুলোর মধ্যে কাইয়ুম খাঁ'র বিশেষ কোন ভূমিকা যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পর ভুট্টোই পাকিস্তানের সর্বেসর্বা হয়ে বসেন। তাঁর পতনের ব্যাপারেও কাইয়ুম খাঁ'র নাম শোনা যায়নি। ভুট্টোর পতনের পর পাকিস্তানে আর যারই হোক কাইয়ুমের পশ্চাতে রাজনৈতিক সমর্থন উল্লেখযোগ্যভাবে যে বেড়েছে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। ভুট্টোর ফাঁসির পর চেহলাম উপলক্ষে লারকানায় সাত লাখ লোকের জমায়েত প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পর ভুট্টোর অতীত দুষ্কার্য লোকে যে ভুলে গিয়েছে কেবল তা নয়, বিলাতী ভুট্টো-বিরোধী পত্র-পত্রিকাগুলোর মতে ভুট্টো একজন কিংবদন্তীর নায়ক, রূপকথার রাজপুত্রে পরিণত হয়েছেন। জেনারেল জিয়াউল হকের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার মতলব, পাকা-পাকিভাবে রাজনৈতিক জীবনে প্রত্যক্ষভাবে সেনাবাহিনীর ভূমিকা রাখার পরিকল্পনা এবং প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন না দিয়ে প্রেসিডেন্ট, চীফ

www.pathagar.com

অব স্টাফ ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি—এ ত্রয়ীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে ও আইন পরিষদকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখার ব্লু-প্রিন্ট যত পরিষ্কার হয়ে উঠতে থাকে ততই জিয়াউল হকের প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের বৈরিতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শরিয়াতি শাসন কায়েমের যে ধরনের প্রচেষ্টা জিয়াউল হক শুরু করেন সেটা পাকিস্তানের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিপুল অংশের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে। তারপর জিয়া ইসলামী শাসন ও সমাজব্যবস্থা কায়েম করে ইসলামী রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর হাতে ক্ষমতা না দিয়ে যদি নিজের হাতেই ক্ষমতা রাখেন তাতে ইসলামী দলগুলোর তুষ্ট হবার কোন যৌক্তিকতাই থাকে না। কারণ, এই উপমহাদেশের তিনটি রাষ্ট্রেই দেখা গেছে বিনা ব্যতিক্রমে সব মতের রাজনৈতিক দলগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতায় আসা। ইস-লামী রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, অবাধ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, হিন্দু রাষ্ট্র সবকিছুই নিরর্থক হয়ে যায় যদি একান্তভাবে নিজে-দের কোটারী, দল বা উপদলের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা না থাকে। জনগণের নাম ব্যবহার করা হয় কেবল নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থ এবং শেষ বিচারে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের প্রয়োজনে। এই উপমহাদেশের তিনটি রাষ্ট্রের উৎপত্তির পরের বত্রিশ, চব্বিশ ও আট বছরের ইতি-হাস এ সত্যটিই নির্ভুলভাবে প্রমাণ করেছে। এ কারণেই এতগুলো "গণতন্ত্রী", "সমাজতন্ত্রী", "ইসলামী" ও "হিন্দু" দলের অস্তিত্ব। সুতরাং জিয়াউল হকের "শরিয়তি শাসনের" প্রবর্তন পাকিস্তানের তিনটি উগ্র ইসলামী দল, তিন চারটি মুসলিম লীগ দলকে আসলে সন্তুষ্ট করেনি, কারণ জিয়াউল হক শাসনতন্ত্রের ও নির্বাচনী আইনের যেসব সংশোধন একেবারে কোনরূপ জনমতের অনুমোদন না নিয়ে কেবল বন্দুকের জোরে করেছেন তার ফলে সব ক্ষমতা তাঁর নিজের ও তাঁরই সমর্থক সামরিক জান্তার হাতে একচেটিয়াভাবে থাকবে, এ সত্যটি সবগুলো ইসলামপন্থী দল হৃদয়ঙ্গম করেছেন। একথাটি যেসব দল জিয়াউল হকের বিধি অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করেছে তাদের ক্ষেত্রেও খাটে। কাইয়ুম খাঁ'র নিঃশর্ত সমর্থনও যে আসলে পিচ্ছিল প্রকৃতির তা তাঁর অতীত স্মরণে রাখলে হৃদয়ঙ্গম না করার কোন কারণ নেই। মোট কথা রাজনৈতিক দিক দিয়ে জেনারেল হক বর্ত-মানে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। জিয়াউল হকের দু'বছরের শাসনামলে পাকি-

www.pathagar.com

স্তানের জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্গতি যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে তথাকথিত ইসলামী শাসনের কোন প্রলেপই তাদের অসন্তোষ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যাওয়া রোধ করতে পারে না। তারপর বেলুচ, পাঠান, সিন্ধী জাতিগুলোর স্বায়ত্তশাসনের দাবী পিষে মারার যে উদ্যোগ নতুন করে জেনারেল জিয়াউল হক নিচ্ছেন তাতে এ জাতিগুলো বাঙালীর পন্থা অনুসরণের কথা আরও সক্রিয় ও তীব্রভাবেই চিন্তা করছে এ তথ্যটি আর গোপন নেই। যেসব দল নির্বাচন কমিশনের নিকট নাম রেজিস্ট্রি করাবার বেইজ্জতি বরদাশ্‌ত্‌ করতে রাজী না হওয়ায় তাদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র খারিজ করে দেয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে পর্যালোচনা করতে যেয়ে বি,বি, সি'র দু'জন ভাষ্যকার মন্তব্য করেছেন যে, বর্তমান অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে পাকিস্তান টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আর না হলেও তাই হবে। যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক বি,বি, সি'র সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত না হয়ে পারবেন না।

কয়েকদিন আগে জেনারেল টিক্‌কা খান তাঁর এককালীন অধীনস্থ অফিসার জেনারেল জিয়াউল হককে বেসামরিক জনগণের সঙ্গে সংঘর্ষে না যাবার জন্য আহবান জানিয়েছেন। বেলুচিস্তান ও বাংলাদেশের কসাই (কাতিল) টিক্‌কা খাঁ'র এ উপদেশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ, এই জল্লাদ জেনারেল বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়েই এ উপদেশামৃত বর্ষণ করছেন। কিন্তু জেনারেল জিয়াউল হক টিক্‌কার এ ধর্ম-কথা শুনবেন কি? না।

৭ অক্টোবর ১৯৭৯।

www.pathagar.com

২৯

কয়েকদিন আগে একটি ছাত্র সংগঠনের সভায় ব্যাঙ্ক-বীমাসহ জাতীয়করণ করা সকল কলকারখানা ব্যক্তি-মালিকানায় ফেরত দেবার জন্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি আহবান জানানো হয়। এ দাবীটা এই প্রথম উত্থাপন করা হলো না। গত চার-পাঁচ বছর ধরেই বিভিন্ন শক্তিশালী মহল থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত সকল সম্পত্তি ব্যক্তি-মালিকানায় দিয়ে দেবার জন্য জোর তদ্বির চলছে। একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ও দল, সদ্য ধানক্ষেত থেকে উঠে আসা মধ্যবিত্ত—যারা পারমিটবাজি ও কালোবাজারি করে পুঁজি বানিয়েছেন, এমনকি কিছু সাংবাদিক-কলামনিস্ট—যাঁরা এসব নব্য পুঁজিপতিদের উচ্ছিষ্ট-ভোগী—প্রভৃতি প্রচারের রীতিমত ঝটিকা অভিযান চালিয়েছেন যে, দেশের সকল অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য দায়ী 'পাবলিক সেক্টর' এবং এটাকে তুলে দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানাগুলো ব্যক্তি-মালিকানায় দিয়ে দিলে আমাদের নির্ঘাত অর্থনৈতিক মোক্ষ লাভ হবে অর্থাৎ সারা-দেশে দুগ্ধ এবং ক্ষীরের নহর একেবারে তরতর করে বইতে শুরু করবে। প্রত্যেকটি চেম্বার অব কমার্স নিয়মিতভাবে সমস্ত শিল্পকে তাদের সদস্যদের হাতে ছেড়ে দেবার জন্য সরকারকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছে। এখন ছাত্রদের একটা দলও এ দাবীর পশ্চাতে সামিল হলো। অবশ্য এ ছাত্র সংস্থাটি বি, এন, পি'রই অঙ্গদল—'জাতীয়তা-বাদী ছাত্রদল।' যতদূর জানা যায়, বাণিজ্যমন্ত্রী সইফুর রহমান সাহেব রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানাগুলো ব্যক্তি-মালিকানায় দিয়ে দেয়া নৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে করেন না। অর্থমন্ত্রী ডক্টর নূরুল হুদাও এ ব্যাপারে উৎসাহী নন। তিনি মনে করেন, প্রশ্নটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আমরা জানি যে, এ প্রশ্নে বাজাদল বিভক্ত। মন্ত্রিসভায় এমন লোকও আছেন যাঁরা পাবলিক সেক্টরের নাম শুনতে পারেন না। এ ব্যাপারে তাঁরা

www.pathagar.com

একা নন। সমাজতন্ত্রের বুলির খই যেসব তথাকথিত বামপন্থী দলের মুখে ফোটে সেসব দলের নেতা ও কর্মীরাও পাবলিক সেক্টরের সমালোচনায় পঞ্চমুখ। অবশ্য সমালোচনার পরও তাঁরা চান যে, পাবলিক সেক্টর থাকুক। এদেশে সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং এ অবস্থার আশু পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা যখন নেই, প্রেসিডেন্ট জিয়ার ঘন ঘন বিঘোষিত 'বিপ্লবের' ধ্বনি সত্ত্বেও, তখন সমাজতন্ত্রের কথা যাঁরা বলেন তাঁরা কোন্ আক্কেলে যে বলেন, তা তাঁরাই জানেন। বামপন্থী দলগুলোরও শ্রেণীচরিত্র যা দেখা যায় তাতে তাঁরা ভবিষ্যতেও কোনদিন সমাজতন্ত্র আনবেন একথা বিশ্বাস করা আর তৈমুর লঙ মাউন্ট এভারেস্ট ডিঙিয়েছিলেন—একথা বলা একই ব্যাপার।

সমাজতন্ত্রের গুণাগুণ বা সম্ভাবনা এ নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। পাবলিক সেক্টরে ঘুষ-দুর্নীতি-গাফিলতি-লোকসান সম্বন্ধে যেসব অভিযোগ, বিনাবাক্যে ব্যয়ে তা মেনে নেয়া যেতে পারে। সরকারী-বেসরকারী সব পত্রিকাতেই এমন দিন যায় না, যেদিন কোন না কোন কর্পোরেশনের অকর্মণ্যতা বা পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতির কেচ্ছা না বের হয়। প্রায় সবগুলো কর্পোরেশনের মধ্যে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা সত্যই পরম দুর্ভাগ্যজনক। এর ফলে জনসাধারণের ভোগান্তি যে বাড়ছে এটাও অনস্বীকার্য; কিন্তু এসবের প্রতিকার কি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলো ব্যক্তি-মালিকের হাতে তুলে দেয়া? জনতার অর্থে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সেগুলোকে ব্যক্তি-মালিকদের রীতিমত উপহার দেয়ার অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের কি হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। কর্ণফুলী পেপার মিল পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সরকারী অর্থাৎ জনতার অর্থে। মিলটি ভাল চলছে না—এ অজুহাতে এটাকে অত্যন্ত গর্হিতভাবে নামমাত্র মূল্যে মিট্টু শেঠ অর্থাৎ দাউদকে দিয়ে দেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে দাউদরা কাগজের দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে দেদার মুনাফা লুটতে শুরু করে। এরকম আরও উদাহরণ দেখানো যায়। দেশের বাণিজ্য ধরতে গেলে পুরোপুরিই ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে। ব্যবসায়ীদের আকাশচুম্বী মুনাফার লোভ কি ১৯৫০-এর মন্বন্তরে ৪০ লাখ মানুষের করুণ মৃত্যু ঘটায়নি? ১৯৭৪-এর আকাল কি পাবলিক সেক্টর ঘটিয়েছে? বর্তমানে শাক-সব্জি, ডাল, পিঁয়াজ, মাছ, ডিম থেকে শুরু করে ওষুধপত্রাদি পর্যন্ত প্রত্যেকটি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের দাম সপ্তায় সপ্তায়, এমনকি দিনে

www.pathagar.com

দিনেও রীতিমত লাফ দিয়ে বাড়াচ্ছে করা? দুনিয়াময় ইনফ্লেশন, এ তথ্য আমার মত মূর্খ লোকেরও জানা আছে। বিলেতে গরু-গোশতের সের ৪০ টাকা, এ কথাও আমরা ওয়াকিবহাল। কিন্তু এসব যুক্তি বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাবার জন্য শতকরা তিন-চারশ' গুণ মুনাফা করেও তৃপ্ত যেসব ব্যবসায়ী নন তাঁরাই আমাদের উপহার দেন। আমরা চোখ বুজে থাকি না। ব্যবসায়ীরা যে হারে মুনাফা করছেন সেটা নিয়ন্ত্রণ না করলে এদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে বাধ্য। অর্থাৎ খাল কাটা বিপ্লব নয়, রীতিমত রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটতে বাধ্য। ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ না করে সরকার যদি পাবলিক সেকটরকে প্রাইভেট সেক্টরে খয়রাত করার দাবী মেনে নেন, তবে বলতে হবে, তাঁরা সত্যই "বিপ্লবী" হয়ে গেছেন অর্থাৎ রক্তাক্ত বিপ্লবের পথই সুগম করছেন।

পাবলিকের অর্থে গড়া বা পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত শিল্প কোন্ নৈতিক যুক্তিতে ব্যক্তি-মালিকানায় দেয়া হবে? যে-কোন ব্যক্তি শিল্প গড়তে চান তাঁকে সব রকমে সাহায্য করার জন্য তো সরকার সদা-প্রস্তুত। শেখ সাহেবের আমলে প্রথমে শিল্পে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ধার্য করা হয়েছিল ২৫ লাখ। পরে দফায় দফায় বাড়িয়ে সেটা তিন কোটি টাকা পর্যন্ত করা হয়। এর শতকরা সত্তুর এবং নানা কারচুপির মাধ্যমে আশি-নব্বই ভাগ পর্যন্ত শিল্প ব্যাঙ্ক, শিল্প ঋণ সংস্থা, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ ইত্যাদি সংস্থা থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে উপরোক্ত উর্ধ্বসীমা দশ কোটি টাকা পর্যন্ত আপাতদৃষ্টিতে করা হয়েছে। আসলে যে-কোন অঙ্কের শিল্প ব্যক্তি-মালিকানায় গড়ায় সরকার অমত ত করবেনই না বরং সর্বতোভাবে সাহায্য করতে সানন্দে রাজী হবেন। কিন্তু এরূপ উদার নীতির ফলেও শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করতে লোক এগিয়ে আসছে না। অথচ তেজারতি অর্থাৎ চোরাকারবার, মুনাফাখোরি, ইনডেন্টিং-এর মাধ্যমে বাঙালী কোটিপতির সংখ্যা বর্তমানে কম নয়। এ "এন্ট্রাপ্রেনরদের" সকলেই ফুর্তির জন্য টাকা দেদার খরচ করছেন, দশ টাকার জিনিসের জন্য একশ' টাকা ফেলে দিয়ে টাকার গরম দেখাচ্ছেন ও সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্য আরো বাড়াচ্ছেন; কিন্তু শিল্পে টাকা বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসছেন না। তাঁরা প্রকাশ্যেই বলেন, "এদেশে টাকা খাটানোর ভরসা পাই না।" তাঁদের অনেকেই টাকা রাখছেন

www.pathagar.com

বিদেশে। সরকার তাঁদের কালো টাকা বের করার জন্য কয়েকবার সুযোগ দিয়েছেন। ফল কি হয়েছে সকলেই জানেন। এসব মহাত্মা 'এন্ট্রাপ্রেনর' পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং সমাজতন্ত্রের নামেই তাদের গায়ের চামড়া চাকা চাকা হয়ে যায় অর্থাৎ এলার্জি দেখা দেয়। কিন্তু নিজেদের একেবারে অসৎ উপায়ে এবং দেশের মানুষের দুর্গতি, এমনকি জানের বিনিময়ে গড়া পুঁজির ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে তারা নারাজ। তাঁরা চান জনতার ট্যাক্সের টাকায় গড়া শিল্পগুলো বেদখল করতে। চমৎকার প্রস্তাব! এ 'এন্ট্রাপ্রেনর'দের জিজ্ঞাসা করতে হয় যে, আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী, জাপান, এমনকি ভারতে পর্যন্ত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি এমন মামাবাড়ীর আবদারের দ্বারা গড়ে ওঠেছে? ফোর্ড, কার্নেগী, ন্যুফিস্ত, ক্রুপ্‌স্, টয়োমেনকা, হিতাচি, মিৎসুবিসি, টাটা, বিরলাকে কি ওসব দেশের সরকার শিল্প গড়ে তুলে রেকাবিতে করে উপহার দিয়েছেন? তবে কেন তাঁরা এদেশে এরকম অন্যায় দাবী করছেন? যদি এসব দাবীতে কর্ণপাত করা হয় তবে বুঝতে হবে যে, সরকার সত্যি এদেশের "সৎ" ব্যবসায়ীদের মামাই বটেন।

পাবলিক সেক্টরে অব্যবস্থা ও দুর্নীতি দেশের সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশেরই প্রতিফলন। সরকার যদি এগুলো দূর করার ব্যাপারে একটু সত্যিকার মনোযোগী হন তবে পরিস্থিতির অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য উন্নতি অসম্ভব নয়। বীমা, ব্যাঙ্ক, বিমান এবং বহু কর্পোরেশন এ সবের মধ্যেও লাভ করছে। আমাদের পাবলিক সেক্টর সামগ্রিকভাবে লাভজনক এবং দেশের মানুষের জন্য ব্যক্তি-মালিকানার চেয়ে কল্যাণকর না হওয়ার কোন কারণ নেই। অতীতের কথা বাদ দিয়ে 'এন্ট্রাপ্রেনর'রা পাটের বাজারে বর্তমানে চাষীর মাথায় যে বাড়ি মেরেছে তাঁর প্রেক্ষিতে বলা চলে যে, প্রাইভেট সেক্টরকে বেশী লাই দেয়া দেশের পক্ষে সর্বনাশা হবে। মনে পড়ে মরহুম মোহন মিয়া সাহেব পাকিস্তান হওয়ার পর পরই পাট ব্যবসায়কে রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্য উঠেপড়ে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রী ছিলেন একথা কেউ বলবে না, তিনি ছিলেন ভূস্বামী। তবে মোহন মিয়া উপলব্ধি করেছিলেন ফড়িয়া-দালালদের হাত থেকে পাটচাষীদের মুক্তি দেয়া না হলে এদেশের অর্থনৈতিক জীবন কখনই সুস্থ খাতে প্রবাহিত হবে না। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ব্যর্থ হন এবং তাঁর উপলব্ধি

www.pathagar.com

আজ কঠোরতম বাস্তব। এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যদি আমরা ব্যবসায়ী তোষণ বন্ধ না করি তবে পরিস্থিতি কোন্ দিকে যাবে সহজেই অনুমেয়। আসলে এদেশে সত্যিকার ব্যবসায়ীই কম রয়েছে, শিল্পপতি ত দূরের কথা। আছে দালাল ফড়িয়া। সরকার কি জনতার এই চিহ্নিত দুশমনদের কথাতেই ওঠ-বস করবেন ?

৬ জানুয়ারী ১৯৮০।

www.pathagar.com

৩০

এও দেখতে হবে, কোনদিন ভাবিনি। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে, দুনিয়া-বিধ্বংসী ক্ষমতার অধিকারী পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফাটা বাঁশের ফাঁকে পড়ার পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন পরিষ্কার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ চরম বেআব্রু অবস্থা একটা সত্যি অকল্পনীয় ব্যাপারই। এ সপ্তাহের "নিউজউইক" পত্রিকায় একটা কার্টুনে দেখানো হয়েছে, আলখেল্লা পরা খোমিনি ও "চাচাজী স্যাম" সাহেবের মধ্যে বাজি রেখে তাস খেলায় আয়াতুল্লাহ "স্যাম" সাহেবের টুপী, টাই, সার্ট, জুতো, মোজা, অন্তর্বাস, পতাকা সব জিতে নেবার পর বলছেন, "দুঃখিত স্যাম, আমি মতটা বদলেছি। বাজির টাকাটা আরও বাড়িয়ে দিলাম।" অর্থ অতি পরিষ্কার। আয়াতুল্লাহ খোমিনি প্রবল পরাক্রান্ত "আঙ্কেল স্যামের" শেষ সম্বল পরনের ফ্রকটা কেড়ে নেবার উপক্রমই করেছেন। এই কার্টুনটি মার্কিন জিম্মীদের ব্যাপারে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির নাটকীয়তা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। আয়াতুল্লাহ খোমিনির রাজনৈতিক মত ও ইরানী ছাত্রদের মার্কিন কূটনীতিকদের জিম্মী করার নীতি সমর্থন না করেও ডক্টর আলীম আল রাজীর মত বলতে হয় যে, ঐ আলখেল্লা পরা ধর্মীয় নেতা ও প্রায়-নাবালক ইরানী ছাত্ররা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন। বিড়াল যেমন আধ-মরা ইঁদুরকে নিয়ে খেলে, তাঁরাও তেমনি জিম্মীদের ছাড়া-নাছাড়া নিয়ে একই খেলা খেলে কার্টার সাহেবের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছেন বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। শান্তি, আন্তর্জাতিক আইন ও ভব্যতার নির্ভেজাল অনুসারী হিসেবে মার্কিন জিম্মীদের এভাবে আটক রাখা সমর্থন নিশ্চয়ই করা যায় না। এ সত্ত্বেও মনে না পড়ে পারে না উনিশ শ' তিপ্পান্ন সালে মার্কিন দূতাবাসের কূটনৈতিক সুবিধার একান্ত অন্যায় সুযোগ

www.pathagar.com

গ্রহণ করে সি, আই, এ, এজেন্ট কারমিট রুজভেল্ট ইরানের আত্ম-গোপনকারী জল্লাদ জেনারেল ফজলুল্লাহ্ জাহেদীর সহায়তায় দেশ-ত্যাগী অত্যাচারী নরপশু শাহ্ মোহাম্মদ রেজাকে পুনরায় সিংহাসনে বসায় ইরানী জাতীয়তাবাদের অগ্নিপুরুষ জনগণনন্দিত ও নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর সহকারী জ্ঞান-তাপস ডক্টর হোসেন ফাতেমী ও হাজারে হাজার ইরানী দেশপ্রেমিককে বিনাবিচারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, গুলী করে মেরে। পলাতক শাহ্কে ইরানী দেশপ্রেমিকদের রক্তের ওপর দিয়ে হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে এসে ময়ূর সিংহাসনে বসিয়ে দেয় সি, আই, এ'র অতিদক্ষ এজেন্ট কারমিট। আজ আন্তর্জাতিক কমিশনের কাছে আমেরিকার বিরুদ্ধে ইরান সরকারের ১৯৫৩ সালের সেই ক্যু সংগঠন, ডঃ মোসাদ্দেকের অপসারণ ও ইরানী দেশপ্রেমিকদের হত্যার আয়োজন করাই সর্বপ্রথম অভিযোগ। এ ব্যাপারে শাহের প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার উদ্ধৃতির উপযুক্ত, "আল্লাহ্, আমার দেশের মানুষ, আমার সেনাবাহিনী এবং আপনার (কারমিট রুজভেল্ট) জন্যই আমার সিংহাসন আবার ফিরে পেলাম।" কেবল আল্লাহ্ ও কারমিট রুজভেল্টের নিকট কৃতজ্ঞতাকে একই সঙ্গে উল্লেখ করে ইরানের শাহ্ যে অমার্জনীয় ধর্মীয় অপরাধ করেছেন তাই নয়, তিনি যে সি, আই, এ'রই ক্রীড়নক এটা কি তারই নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি নয়? কেবল শাহ্ নয়, একাধিক মার্কিন সরকারী সূত্রই ১৯৫৩ সালে ইরানে সি, আই, এ'র সাফল্যের কথা বড়াই করেই বিভিন্ন পুস্তকে প্রবন্ধে উল্লেখ করে তৃপ্তি পেয়েছেন।

সুতরাং আজ মার্কিন সরকার ১৯৫৩ সালের ক্যু-এর দায়িত্ব অস্বীকার করতে না পেরে যুক্তি প্রদর্শন করছেন যে, এই রক্তাক্ত ক্যুটা সংগঠিত করে মার্কিনীরা মসলিম দেশ ইরানকে কমিউনিস্ট কবলিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। আমেরিকার ইসলামের রক্ষক সাজার চেষ্টাটা একাধারে কৌতুক ও ক্রোধেরই উদ্রেক করবে সকল সৎ মুসলমানের মনে। এ চেষ্টাটা অভিনব কিছু নয়। এ ধাপ্পা প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে একই সঙ্গে বৃটেনের রাজা এবং জার্মানীর কাইজার দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কাইজার ত আনুষ্ঠানিকভাবে "ইসলামের রক্ষক" উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। আর বৃটেনের লরেন্স অব আরা-বিয়া ত আরবী ভাষা কেবল আয়ত্ত করেই ক্ষান্ত হননি, আরবী লেবাস

www.pathagar.com

পরিধান করে খাঁটি আরব সেজে আরব মুসলমানদের জালেম ও "আন-ইসলামিক" তুর্কীদের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের বৃটেন ও ফ্রান্সের শৃঙ্খল পরিয়ে দেবার সু-বন্দোবস্ত করেন। কামাল পাশার আবির্ভাবে তুরস্ক ইংরেজের পদা-নত হওয়া থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের আরবরা লরেন্সের অর্থাৎ "মুসলিম-মিত্র" ইংরেজের সে ধাপ্পার ধকল থেকে এখনও মুক্তি পায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে মিসর, ইরাক, সিরিয়া, জর্ডন, লিবিয়া, তিউনিস, মরক্কো, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশ বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রত্যক্ষ দখল থেকে মুক্তি পেয়েছে। কারণ, উক্ত যুদ্ধের ফলে ঐ দখলদার দেশগুলো তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই বৃটেন ও আমেরিকার উদ্যোগে মধ্যপ্রাচ্যে আরব দুনিয়ার বুকে উদ্যত ছুরি-কার ভূমিকা পালনের জন্য তাদের পোষা হিংস্র জাগুয়ার রাষ্ট্র ইস-রাইলের পত্তন করে। ইসরাইল অমানুষিক নাৎসীসুলভ বর্বরতার সঙ্গে প্যালেস্টাইনী আরবদের নিজ জন্মভূমি থেকে উৎখাত করে শরণার্থী জাতিতে পরিণত করে। ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম নগরী বায়তুল মোকাদ্দেস আজ ইসরাইলের দখলে এবং মসজিদুল আক-সা'তে নামাজ নির্বিঘ্নে পড়া আজ ইসরাইলী প্রশাসনের দৌরাত্ম্যে সম্ভব নয়। এসব সম্ভব হয়েছে ইসরাইলের পশ্চাতে অবিচল এবং ঢালাও মার্কিন সমর্থনে। প্রকৃতপক্ষে ইসরাইলী ঘাতকদের হাতে নিহত প্রত্যেকটি আরবের রক্তের দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে আমেরিকার। মান-বাধিকারের ধ্বজাধারী, বাইবেল হাতে ঘুরে বেড়ান যে কার্টার সাহেব তিনি যে কত বড় ভণ্ড তা বোঝা যায় 'প্যালেস্টাইনীদের জাতীয় আবাস-ভূমি পাওয়ার অধিকার রয়েছে' নির্বাচিত হয়ে একথা বলার পরে, মার্কিন ইহুদী সম্প্রদায়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার পর তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন যে, প্যালেস্টাইনীরাও মানুষ এবং নিজ জন্মভূমির অধিকার ফিরে পাওয়া তাদের একটা মৌলিক মানবিক অধিকার। কার্টার সাহেব প্যালেস্টাইনী মুক্তি সংস্থার সঙ্গে কথা বলতেই নারাজ। জাতিসংঘে মার্কিন প্রতিনিধি ইয়ং প্যালেস্টাইনী মুক্তি সংস্থার প্রতি-নিধির সঙ্গে গোপনে দেখা করার ব্যাপারটা আমেরিকায় কর্মরত ইসরাইলী গোয়েন্দাদের দ্বারা ফাঁস করে দেয়ার পর ইয়ংকেই পদ-ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু আমেরিকায় ইসরাইলের গোয়েন্দাবৃত্তি

www.pathagar.com

সম্বন্ধে সামান্য উচ্চবাচ্যও করা হয় না। ইসরাইল আমেরিকা থেকে ইউরেনিয়াম চুরি করে নিয়ে গিয়ে আণবিক বোমা তৈরীতে যে সাফল্য অর্জন করেছে সেটা জানা ব্যাপার। কিন্তু পাকিস্তানে আণবিক বোমা বানাতে গিয়ে সি, আই, এ'র কেরামতিতে ভুট্টোকে প্রাণ হারাতে হয়। আবার ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বিরুদ্ধতা মার্কিনের নিষেধ সত্ত্বেও করার ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারাতে হয়। এ তথ্যই মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিপসুর "বাংলাদেশ ঃ দ্য আন-ফিনিশ্‌ড্‌ রেভলিউশন" বই পড়লেই পরিষ্কার বোঝা যায়।

সুতরাং আজ বোধহয় বলা যায় যে, ইরানের আলখেল্লা পরা ঐ ধর্মীয় নেতা ও মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারীদের জিম্মী করেছে যে ছাত্ররা তাদের কার্যকলাপ পছন্দ হোক আর না হোক গত ২৭ বছরে ইরানের শাহের নির্দেশে এবং সাভাকের ও সেনাবাহিনীর হাতে যত ইরানী দেশপ্রেমিক মৃত্যুবরণ করেছেন পরলোক থেকে তাঁদের বিদেহী আত্মার আশীর্বাদ এঁদের শিরে ঝর্ণাধারার ন্যায় ঝরে পড়ছে। কেবল ডক্‌টর মোসাদ্দেক, ডক্‌টর হোসেন ফাতেমী ও নাম না জানা অসংখ্য ইরানী দেশপ্রেমিকের আত্মা নয়, সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অসংখ্য জনদরদী জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক যাঁরা সি, আই, এ'র শিকার হয়েছেন তাঁরাই আজ ইরানী ছাত্রদের আশীর্বাদ করছেন। আলেন্দের আর বঙ্গবন্ধুর আত্মা আজ তৃপ্ত। ইতিহাস এভাবেই প্রতিশোধ গ্রহণ করে। হাইড্রোজেন ও আণবিক বোমার অধিকারী হয়েও পরাশক্তি আমেরিকা ঘটনার আবর্তে পড়ে আজ কি বেইজ্জতি পরিস্থিতিতেই না পড়েছে!

মার্কিনীরা সত্যিই জাতি হিসেবে মহান। ইরানে এবং অন্যত্র সি, আই, এ'র কুকীর্তি সম্বন্ধে প্রধানতঃ আমরা জানতে পাই মার্কিন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বইপত্রে সন্নিবেশিত তথ্য থেকে। এ সপ্তাহের 'নিউজউইক'-এর যে কার্টুনটির উল্লেখ এ লেখার শুরুতে করেছি, বাংলাদেশ যদি অনুরূপ কোন নাজুক পরিস্থিতিতে পড়ত এবং এখানকার কোন পত্রিকায় ঐ ধরনের কোন কার্টুন ছাপা হত তবে সে পত্রিকার সম্পাদককে এতক্ষণে বোধহয় শ্রীঘরেই যেতে হত। এই সঙ্কটকে নিয়ে হাসতে পারাটাই প্রমাণ করে যে, স্বদেশে মার্কিনীরা কত বড় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পূজারী। তাদের এই গণতন্ত্র-প্রীতিটা বৈদেশিক নীতিতে যদি কোনদিন প্রতিফলিত হত তবে তা

www.pathagar.com

দুনিয়ার জন্য একটা আশা হয়ে দাঁড়াতে পারত। 'নিউজউইক'-এ শাহের আমলে শাহ্ মোহাম্মদ রেজা ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন, অনুগৃহীতেরা কি নির্মমভাবে ইরানকে আক্ষরিক অর্থে লুণ্ঠন করেছে তার এক ন্যক্কারজনক বিবরণ বেরিয়েছে। এই বিবরণটি ইরানের স্টেট ব্যাঙ্কের বর্তমান গভর্নরের অধীনে একদল অনুসন্ধানকারীর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত রিপোর্ট থেকে নেয়া হয়েছে। এ রিপোর্টে আরও দেখা যায় এ লুণ্ঠনে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরান সরাসরি অভিযোগ করছে যে, ১৯৬৪ সালে দু'টি জাতীয় অবমাননাজনক আইন মজলিশে পাস করা হয়। একটি ইরানে কর্মরত মার্কিন সামরিক ব্যক্তিদের কূটনৈতিক মর্যাদা, অর্থাৎ ইরানের আইনের আওতার বাইরে রাখা এবং আরেকটি হল কড়া সুদে মার্কিন ঋণ গ্রহণ করে সে ঋণের টাকা দিয়েই মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র কেনা। ঐ সময়েই কোম শহর থেকে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমিনি এ আইন দুটিকে "ইরানকে মার্কিন শৃংখলে আবদ্ধ করা দুটি চরম অপমানজনক আইন" আখ্যা দিয়ে এক বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিবৃতি দেয়ার অপরাধে খোমিনিকে গ্রেফতার করে তুরস্কে নির্বাসন দেয়া হয়। বিচিত্র ইতিহাসের যাত্রা-পথ। ষোল বছর পরে আজ আসামীর কাঠগড়ায় শাহ্ মোহাম্মদ রেজা ও তাঁর মুরুব্বীরা আর বিচারকের আসনে খোমিনির ইশারাতে যারা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তারা।

আবার বলছি, খোমিনির রাজনৈতিক-ধর্মীয় মতামতের বিশদ খবর রাখি না এবং আগামীকাল এগুলোর বিরুদ্ধে লেখারও প্রয়োজন মনে করতে পারি। কিন্তু আজ একটি বিষয় পরিষ্কার, খোমিনি ও তাঁর অনুসারীরা এদেশের এবং আরও বহু দেশের এক শ্রেণীর ধর্মীয় নেতাদের মত নন। তাঁরা মার্কিনী সমর্থন বা বাদশাহ্-শেখদের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল নন। তাঁরা গুরুতর ভুল করতে পারেন এবং এ ভুলের ফলে নিজেদের ও দেশের জন্য দুর্দশাও ডেকে আনতে পারেন ; কিন্তু এ পর্যন্ত যেভাবে তাঁরা সকল মার্কিন চাপ ও প্রলোভনের সামনে নির্বিকার রয়েছেন তাতে তাঁদের মনোবলের তারিফ না করে পারা যায় না। আয়াতুল্লাহ খোমিনির বিপ্লবের কৃষ্ণ দিকটা হল সকল প্রকার আধুনিকতার বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব। তাঁর 'ইসলাম' সুন্নী মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য যে নয় তার প্রমাণ

www.pathagar.com

ইরানের শুভ্যন্তরেই পাওয়া যায়। তাছাড়া খোমিনির ইসলামী রক্ষী-দল কুর্দিস্তানে ও তুর্কিস্তানে কুর্দী ও তুর্কীদের ওপর যথেষ্ট জুলুম চালিয়েছে। ইসলামের দোহাই পেড়ে কোন জাতিসত্তাকে যে হামান-দিস্তায় পিষে ফেলা যায় না পাকিস্তানই তার প্রমাণ এবং আমরা বাঙালীরা এ সত্যটি দেহের প্রতি রক্তবিন্দু দিয়ে উপলব্ধি করেছি বলেই এ অঞ্চলে পাকিস্তানের ধ্বংসের ওপর বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে। যদি পাকিস্তানী নেতৃত্ব দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেন তবে এত শিগগির এ অঞ্চলে পাকিস্তানের নাম-নিশানা একেবারে মুছে হয়ত যেত না। খোমিনি ও তাঁর অনুসারীরা যদি কুর্দী, তুর্কী, বেলুচ জাতিগুলোর সত্তাকে পিষে মারার চেষ্টার পরিবর্তে ইরানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতি দেন, তবে তা ইরানের সংহতি দৃঢ় করারই সহায়ক হতে পারে। খোমিনি যে উপরোক্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে অক্ষম সে সম্বন্ধে শেষ কথা এখনই বলা যাবে না। জিম্মীদের ব্যাপার নিয়ে ওয়াল্ডহেইম ও আমেরিকাকে তিনি যেভাবে নাচিয়ে মারছেন তাতে সত্যি অবাক হতে হয়। জাতিসংঘ কমিশন গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশার উদ্রেক হয়েছিল যে, এবার বুঝি জিম্মীদের মুক্তি পাবার পথ পরিষ্কার হল। খোমিনির মতের বিরুদ্ধেই প্রেসিডেন্ট পদে বনিসদর নির্বাচিত হয়েছেন কথাটা ভাল-ভাবেই রটেছিল। খোমিনি নাকি নৌ-বাহিনীর প্রধানকেই সমর্থন করছিলেন। বনিসদরের নির্বাচন সেজন্য মার্কিন জিম্মীদের মুক্তি সম্বন্ধে আশাবাদের সঞ্চার করেছিল। বনিসদরও প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়ে জবরদস্তভাবে ঘোষণা করলেন, "ছাত্রদের তিনি একটি পাল্টা সরকার চালাতে দেবেন না।" খোমিনি যে কতবড় খেলোয়াড় তখনও আজকের মত পরিষ্কার হয়নি। মার্কিনীরা ভাবল, "এত-দিনে এই আলখেল্লা পরা ধর্মোন্মাদ লোকটির কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বনিসদর মার্কিনঘেঁষা বলেই অনু-মিত হলো। খোমিনি বনিসদরকে সশস্ত্র বাহিনীগুলোর প্রধান করে দেয়াতে জিম্মীদের অভ্যর্থনার জন্য তাদের পরিবারগুলোতে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ খোমিনি ঘোষণা করলেন ইরানে নির্বা-চিত পার্লামেন্টই কেবল জিম্মীদের ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। বনিসদরের মাথায় বাজ পড়ল, অর্থাৎ এপ্রিল মাসে পার্লা-মেন্টে নির্বাচনের আগে জিম্মীদের মুক্তির প্রশ্ন আলোচনারই বোধ-

www.pathagar.com

হয় আর অবকাশ রইল না। জাতিসংঘ কমিশন গঠনে কার্টার রাজি হয়েছিলেন এ আশায় যে, তাঁরা তদন্তের নামে হাল্কা কিছু করার পরই জিম্মীদের মুক্তির পথ পরিষ্কার হবে। কিন্তু ছাত্ররা কমিশনকেও মার্কিন-বিরোধী জেহাদের প্লাটফর্মে পরিণত করেছে। মার্কিন-ট্রেইণ্ড সাভাকের নরপশু এজেন্টদের হাতে বীভৎসভাবে বিকলাঙ্গ সব ইরানীদের কমিশনের সামনে হাজির করায় কমিশন সদস্যরা আঁৎকে উঠে বলতে বাধ্য হন "দেখা যায় না। একেবারে অমানবিক।" এসব অমানবিক অত্যাচারের ট্রেনিং সাভাকের গোয়েন্দাদের দিয়েছে, তাদের নির্যাতনের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি বিক্রি করেছে "গণতন্ত্রী দুনিয়ার স্বনিয়োজিত রক্ষক ও নেতা, মানবাধিকারের প্রবক্তা সুসভ্য" মার্কিন সরকার। কমিশনের সদস্যরা তেহরান পৌঁছেছেন বেশ ক'দিন হয়ে গেল। কিন্তু এখনও তাঁরা মার্কিন দূতাবাসে ঢুকে জিম্মীদের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। ছাত্ররা একবার বলে তাদের সঙ্গে দেখা করার আগে যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধ সম্বন্ধে কমিশনকে ঘোষণা দিতে হবে। আবার বলে সকল জিম্মীর সঙ্গে কমিশনের দেখা করার কোন প্রয়োজনই নেই, কেবল যারা গুপ্তচরবৃত্তিতে বা ইরানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় লিপ্ত ছিল বলে প্রমাণ রয়েছে তাদের সঙ্গে দেখা করাই অর্থপূর্ণ হতে পারে। এ ব্যাপারে বৈদেশিক মন্ত্রী কুতুবজাদেহ ওকালতি করতে গেলে তাঁকে সরাসরি মিথ্যাবাদী বলে ছাত্ররা হাঁকিয়ে দেয়। আর একবার তারা জিম্মীদের বিপ্লবী পরিষদের হাতে অর্পণ করতে রাজি। কিন্তু আবার মার্কিন দূতাবাসের সামনে এক বিরাট বিক্ষোভের আয়োজনও তারা করে। আয়াতুল্লাহ খোমিনির নির্দেশ না পেলে ইরানী সরকার বা বিপ্লবী পরিষদ কেউই যে জিম্মীদের দায়িত্ব নিতে পারে না তা এখানে বসেই বোঝা যায়।

আয়াতুল্লাহ খোমিনি তাঁর মত দিয়েছেন। তিনি মোটামুটি ছাত্রদেরই সমর্থন করেছেন। কমিশন কেবলমাত্র ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সঙ্গেই দেখা করতে পারবেন এবং এঁদের অপরাধের বিবরণ কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ থাকতে হবে। হায় হায়! প্রবল প্রতাপান্বিত পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি বেইজ্জতি! সত্যি আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। ইতিহাসের মার এমনই নির্মম। বনিসদর বড় দুঃখেই বলেছেন যে, এ সঙ্কটে কেবল সোভিয়েতই লাভবান হচ্ছে এবং ইরানকে সোভিয়েত গাপ্ করার মতলবে

www.pathagar.com

আছে। খোমিনি উন্মাদ হতে পারেন; কিন্তু তাঁকে রাশিয়াঘেঁষা কোন উন্মাদও বলতে পারবে না। রাশিয়ারও ঘোর বিরোধী তিনি। খোমিনি ঘোষণা করেছেন আমেরিকার সঙ্গে আমরণ সংগ্রাম চলবেই।

সুতরাং পরিস্থিতির কোন আশু পরিবর্তন হবে বলে আশা করা যায় কি?

১২ মার্চ ১৯৮০।

www.pathagar.com

৩১

পাকিস্তান ও ভারতকে অন্য পাঁচটা বিদেশী রাষ্ট্রের সমপর্যায়ে দেখা এখনও আমার পক্ষে সম্ভব নয় অতি স্বাভাবিক কারণেই। ভারতীয় (বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সাবজেক্ট্) বলে পরিচয় যে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিল তা নয়, কলকাতায় আমার গর্ভধারিণী আম্মা, আমাকে বুকে-পিঠে করে পেলেছেন যে স্নেহময়ী নানী ও দুই খালাআম্মা, তাঁরা গোবরার গোরস্থানে সমাহিত। ১৯৭২ সালে পাক্কা ১২ বছর পরে কলকাতা পৌঁছে সর্বপ্রথম গোরস্থানে যেয়ে প্রিয়জনের কবরগুলোতে নতুন করে মাটি ফেলে দু'চারটা ফুলগাছ লাগিয়ে জেয়ারত করে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। আসার আগেও জেয়ারত করে আসি। তবে একটা কথা আর একবার উপলব্ধি করি। ১৯৪৭ সালে যে কলকাতাকে ছেড়ে আসি ১৯৭২-এর কলকাতার সঙ্গে তার মিল খুব কমই। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা ছিল আমার শহর। ১৯৭২ সালে অনুভব করেছি এ কলকাতায় আমার কোন অধিকার নেই। পুরনো পরিচিত বন্ধু-বান্ধব অধিকাংশেরই কোন খোঁজ পাইনি। ১৯৭২ সালের পর আর কলকাতা যাইনি। মনের দিক থেকে বিশেষ তাগিদও অনুভব করিনি। তবুও ভারতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারি না। ভারত ভৌগোলিক দিক থেকে আমাদের তিন দিক ঘিরে রয়েছে। গত জানুয়ারী মাসে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমি ভারত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লিখিনি। তার অর্থ এ নয় যে, ভারতের রাজনৈতিক জীবনে দুষ্টগ্রহ সঞ্জয় গান্ধীর প্রভাবে যে গুণগত কৃষ্ণ রূপান্তর ঘটাবার প্রক্রিয়া বর্তমানে জোরেশোরে চলেছে সেটা থেকে শুরু করে আসামের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি পর্যন্ত আমি গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে যাচ্ছি না। যাচ্ছি। বস্তুতঃ ভারতে গণতন্ত্রের বিপদ যে আবার ঘনিয়ে এসেছে এ সত্যটির প্রতি এক ইন্দিরা কংগ্রেসের লোকজন ছাড়া প্রায় আর সকল দলের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক মহলই উদ্বেগের সঙ্গে সজাগ। তারপর গত আট মাস ধরে আসাম ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে যে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি বিরাজ করছে ও সেটা যে বিপজ্জনক রূপ পরিগ্রহ করেছে তা যদি ইন্দিরা সামলাবার উপায় বের করতে না পারেন তবে ভারতের অখণ্ডতা নিয়েই টান পড়বার সম্ভাবনা অতি প্রকট। আসামে "বিদেশী" বিতাড়নের নামে বাঙালী, বিশেষ করে এককালে বাংলাদেশের অধিবাসী যারা ছিলেন তাঁদের খুন-জখমের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেবার যে চেষ্টা চলছে সেটা সফল হলে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষভাবে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে।

ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অদূরভবিষ্যতে বিশদভাবে লেখার ইচ্ছা রইল। পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতির আবেদন আমার কাছে এখনও বেশী। কারণ, মনের দিক থেকে পাকিস্তান এখনও এই সেদিনের ব্যাপার। করাচী, লাহোর, 'পিণ্ডির রাস্তাঘাট শুধু যে এখনও চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে তা নয়, পাকিস্তানী রাজনীতির প্রথম সারির লোকজনের অনেককে ঘনিষ্ঠভাবে জানার ফলে পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য একটু বেশীমাত্রায়। সকালে কাগজ খুলেই তাহরিক-ই-ইশতেকলাল পার্টির নেতা এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খানকে করাচীতে তাঁর পার্টি অফিসে গ্রেফতার করে বিমানে পেশোয়ার নিয়ে যেয়ে এবোটাবাদে স্বগৃহে অন্তরীণের খবরটি পড়ে অনেক কথা মনে পড়ে গেল। এ কলামে পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আসগর খাঁকে যখন তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর অধিনায়ক, তখন থেকেই জানি। তারপর পি, আই, এ'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদ থেকে অবসর গ্রহণের পরেই রাজনীতিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তিনি 'পিণ্ডি আসার পর সর্বপ্রথম আমার ও মরহুম নজীউল্লার সঙ্গেই ফ্ল্যাশম্যান হোটেলে প্রাতঃরাশের সময় তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আলোচনা করেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনার পর আমি নিশ্চিত হই যে, রাজনীতিতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবেন এবং এ ধারণা আমি তাঁকে জানাতেও দ্বিধা করিনি। আসগর খাঁ হেসে বলেছিলেন, "সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি আপনার কি আমি জানি না, তবে আমি মনে করি পাকিস্তানের রাজনীতিতে সততা ও আন্তরিকতার বড় অভাব যাচ্ছে। এ দুটোর অভাব ঘুচাবার চেষ্টা আমি করব।" জবাব দিয়েছিলাম, "মাফ করবেন মার্শাল,

www.pathagar.com

সাধারণতঃ রাজনীতি বস্তুটাই নোংরামিতে ভরা। আর পাকিস্তানের রাজনীতির আদিতন্ত শঠতা, হিংস্রতা, বেঈমানি—সবরকমের নোংরামিতে ভরা। আপনি এতে খাপ খাবেন না।" আসগর খাঁকে আমি পিউরিটান চরিত্রের লোক বলে জানতাম। মদ কেন, সিগারেটও খেতেন না। নারীঘটিত কোন দুর্বলতা ছিল না। ঘুষের কোন বদনাম থাকলে নিশ্চয়ই জানতাম। আচারে-ব্যবহারে একাধারে সাহেবী এবং রীতিমত নামাজী-কালামী। আদি বাড়ী কাশ্মীরে, এবোটাবাদে বাড়ী করেছেন। আজ চিন্তা করছি—আমার উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি সফল হল, না একেবারেই ফজুল প্রমাণ হল। এক হিসেবে আমি সঠিক হয়েছি। এক যুগ পরেও আসগর খাঁ ক্ষমতা থেকে এখনও দূরে—জেল ও স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাই যেন তাঁর জীবন হয়ে পড়েছে। ব্যক্তিগত সাফল্যের মাপকাঠিতে আসগর খাঁ রাজনৈতিক জীবনে ব্যর্থতার পসরাই কুড়িয়েছেন। কিন্তু আমি সরজমিনে সাক্ষী যে, আইয়ুব খাঁ'র পতনের ব্যাপারে ভুট্টোর চেয়েও আসগর খাঁর অবদানই বেশী। তারপর ইয়াহিয়া খাঁ'র সময়েও আসগর খাঁ পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অতন্দ্রভাবেই চালিয়ে যান। এ সময়েও তাঁর সঙ্গে করাচী-পিণ্ডি-ঢাকায় বেশ ক'বার দেখা ও আলোচনা হয়। ১৯৭০ সালে একবার করাচীতে তিনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যেয়ে কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, একটা কথা আমাকে পরিষ্কার এবং সত্যি করে বলুন, "শেখ মুজিবুর রহমান কি পাকিস্তান ভাঙ্গতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ?" জবাব দিই, "প্রশ্নটা ঠিক হল না। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি জানেন না, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবী একটি চক্র, ব্যুরোক্র্যাসির একটি অংশ, ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের একটা অংশ এবং কিছু সংখ্যক রাজনীতিক সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের প্রহসনেরও কবর রচনা করে একচেটিয়া ক্ষমতা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত কুক্ষিগত রাখার পরিকল্পনা করছে? পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের প্রথম থেকেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উলঙ্গ শঠতার সঙ্গে বঞ্চিত ও শোষিত রাখা হয়েছে। পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনে তার ন্যায্য অধিকার পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে না দিলে শেখ মুজিবুর রহমান যদি চেষ্টাও করেন পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানে রাখতে পারবেন না--এ সত্যটি আপনাকে উপলব্ধি করতে অনুরোধ করছি। তবে

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমান আজ পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার যে মূর্ত প্রতীক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর জন্য প্রধানতঃ কি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরাই দায়ী নয়? পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের দাবী স্থির-অকম্পিতভাবে করে যাওয়ার জন্য শেখ মুজিবকে যেভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে তারই প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে আজ তিনি পূর্ব বাংলার অবিসম্বাদিত নেতা। আপনার প্রশ্নের জবাব পূর্ব বাংলায় নয়, পশ্চিম পাকিস্তানে।" যতদূর মনে পড়ে, আসগর খাঁ বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, "দেখা যাক। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখব না।" আমি বলেছিলাম, "পাকিস্তানের রাজনীতি যে খাতে প্রবাহিত হয়েছে, তাতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানের প্রশ্ন নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডত্বও বজায় রাখা দুরূহ ব্যাপার হবে।"

১৯৭০-এর পরে আসগর খাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কিন্তু তাঁর রাজনীতি আমি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে গেছি। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের এবং বিশেষ করে ভুট্টোকেই দায়ী করেন। আসগর খাঁ তাঁর পার্টি ক্ষমতায় আসলে সনাতন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করবেন বলে ঘোষণা করেছেন দেখে মনে মনে হাসা ছাড়া গত্যন্তর দেখিনি। কিন্তু এই কল্পনাবিলাসী ভদ্রলোক জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিরুদ্ধে জেল-জুলুমের পরোয়া না করে যেভাবে সংগ্রাম করে যান তাতে তাঁর প্রশংসা না করে পারিনি। শেষ পর্যন্ত ভুট্টোর পতনের ব্যাপারে আসগর খাঁ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। সুতরাং তাঁর রাজনীতি একেবারে ব্যর্থ হয়েছে বলাও মুস্কিল। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতির যে কুটিল ও হিংস্র গতিধারার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি ভুট্টোর পতন ও বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে ফাঁসির পর তা আরও কিরূপ ভয়াবহ জল্লাদী রূপ পরিগ্রহ করেছে তা খবরের কাগজ পাঠকমাত্রেরই জানা আছে। প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক ইসলাম ও বিশ্ব মুসলিম সংহতির বুলি আউড়িয়ে পাকিস্তানে তাঁর জল্লাদী শাসন কায়েম রাখার যতই চেষ্টা করছেন, ততই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ আরও ঘোর কৃষ্ণ হয়ে উঠছে। ফাঁসির পর ভুট্টো কিংবদন্তীর নায়কে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং তাঁর কবর কামেল পীর-দরবেশের মাজারের মর্যাদা যে অর্জন করেছে সে সম্বন্ধে বিলাতী খবরের কাগজগুলোতেই

www.pathagar.com

নানা চিত্তাকর্ষক খবর বেরিয়েছে। ভুট্টোর স্ত্রী নুসরাত ভুট্টো ও কন্যা আশুনের ফুলকি বেনজীর ভুট্টোকে জেল-অন্তরীণে রেখে ভুট্টোর সমর্থক-দের জেল, জরিমানা, বেত্রাঘাতের দ্বারাও জেনারেল হক অসন্তোষ ও প্রতিরোধকে স্তব্ধ করতে পারেননি। ভুট্টো পত্নী ও তনয়াকে কিছু-দিন আগে অন্তরীণাবস্থা থেকে ছেড়ে দেয়া হলে তাঁরা যে কেবল সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল হকের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের দাবীতে সোচ্চার হন তা নয়, আফগানিস্তানের ব্যাপারে পাকিস্তান যখন মুসলিম দুনিয়ার সম-র্থন ও সাহায্য লাভের চেষ্টা করছে তখনই বেনজীর ভুট্টো ঘোষণা করেছেন যে, পিপলস পার্টি ক্ষমতায় এলেই বাবরাক কারমালের সরকারকে স্বীকার করে নিয়ে আফগানিস্তান ও রাশিয়ার সঙ্গে সকল গোলমাল মিটিয়ে ফেলবে। ভুট্টো তনয়ার আর যাই হোক সাহসের অভাব নেই। আসগর খাঁকে মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে অন্তরীণাবস্থা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি পেয়েই তিনি জেনারেল হকের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন পাকিস্তানে সবগুলো রাজনৈতিক দল ও রাজ-নীতি সামরিক আইনে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও। আরও তাজ্জব ব্যাপার যে, পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রষ্টা আসগর খাঁও ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আফগানিস্তানের ব্যাপারে জেনারেল হকের নীতির পুরো-পুরি বিরোধী এবং তিনি মনে করেন যে, এ নীতি পাকিস্তানের পক্ষে চরম বিপজ্জনক। জেনারেল জিয়াউল হকের কবল থেকে পাকি-স্তানকে মুক্ত করার সংকল্প সাধনের জন্য ভুট্টোর দুই ছেলে লণ্ডন থেকে কাবুলে এসে আস্তানা গেড়েছেন বলে সংবাদপত্রে খবর বেরি-য়েছে।

পাকিস্তানের বার এসোসিয়েশনগুলো জেনারেল হকের শাসনের তীব্র সমালোচনা করতে থাকায় এবং পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলোও জেনারেল হকের প্রতি 'জী হুজুর' মনোভাবাপন্ন না হওয়ায় মাত্র কিছুদিন পূর্বে জেনারেল হক কোর্টগুলোর ক্ষমতা আরও সীমাবদ্ধ করে সামরিক আইন জারি করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বার এসোসিয়েশনগুলোতে কোনরূপ রাজনীতিও নিষিদ্ধ করে দেন এবং না মানলে জেল, জরিমানা, বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। পাকিস্তানী আইনজীবীদের প্রশংসা না করে পারি কি করে যখন দেখি, এ ঘোষ-ণার অব্যবহিত পরেই হায়দরাবাদের বার এসোসিয়েশন আসগর খাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্য আহবান করে। আসগর খাঁও দ্বিরুক্তি না করে

www.pathagar.com

সে আহবানে সাড়া দিয়ে হায়দরাবাদ বার-এর মেম্বারদের সামনে জেনারেল হকের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য জোরালোভাবে রাখেন। এই বক্তৃতারই প্রত্যক্ষ ফল তাঁর আবার স্বগৃহে অন্তরীণ হওয়া।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হককে কে জিজ্ঞাসা করবে যে, উকিল-ব্যারিস্টাররা রাজনীতি করবে নাত রাজনীতি করবে কি সেনাবাহিনীর লোকেরা? যদি তাই হত তবে পাকিস্তানের জন্মই হত না। জিন্নাহ্ সাহেব কি সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন? দুনিয়ার সর্বত্র, বিশেষ করে এ উপমহাদেশের রাজনীতিতে আইনজীবীরা বরাবরই প্রথম সারিতে ছিলেন। অবশ্য পাকিস্তানী রাজনীতির এ দুর্দশার জন্য রাজনীতিকরা নিজেরাই প্রধানতঃ দায়ী অর্থাৎ তাদের লোচ্চামিই ক্ষমতালিপ্সু ইস্কান্দার-আইয়ুবকে সুযোগ দিয়েছে ক্ষমতা দখলের। তবে গত বাইশ বছরের মধ্যে ভুট্টোর পাঁচ বছর বাদ দিলে বাকী সতের বছরই পাকিস্তান শাসন করেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেনাবাহিনী। ফল কি হয়েছে? পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বজ্রকঠিন ডিসিপ্লিনও যে শিথিল হয়ে এসেছে তার প্রমাণ কিছুদিন পূর্বে ষড়যন্ত্রের অপরাধে একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ও বেশ কিছু মাঝারি ও দু'চারজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে গ্রেফতার করা। তাছাড়া কয়েকজন জেনারেল, যাঁরা একই সঙ্গে বেসামরিক ও সামরিক দায়িত্ব পালন করছিলেন, তাঁদের সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বার এসোসিয়েশনে রাজনীতি আলোচনা নিষিদ্ধ করে দেয়ার পর কেবল হায়দরাবাদ বার নয়, করাচী, লাহোর বারও প্রতিবাদমুখর হয়েছে। পাকিস্তানের সাংবাদিক ও আইনজীবীরা যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন ও দিচ্ছেন তা চিন্তা করলে কি মনে হয়? এটা মনে হয় না কি যে, পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলামের নামে জেনারেল হক পাকিস্তানের জনমতকে আর ধোঁকা দিতে পারছেন না?

১ জুন ১৯৮৩।

www.pathagar.com

৩২

পিকিং-এর তিয়েন আন মিন স্কোয়ার থেকে শুরু করে মহাচীনের সর্বত্র 'মহান কাণ্ডারী' (The great helmsman) মাও সে তুং-এর ছবি নামিয়ে ফেলা হচ্ছে বলে খবর এসেছে। কাজটা যে পরিশ্রমেরই হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৫৬ সালে আমি চীনের সাংবাদিক সমিতির আমন্ত্রণক্রমে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩ জন সম্পাদক ও পূর্ব পাকিস্তানের আর তিনজন সাংবাদিকের সঙ্গে দেড় মাসের জন্য চীন সফরে যাই। কমিউনিস্টরা তখন চীনে ক্ষমতায় এসেছে সাত বছরও পার হয়নি। কিন্তু সুদূর সিংকিয়াং থেকে মাঞ্চুরিয়াব্যাপী বিশাল অঞ্চলে গড়ে দিনে ১৪ ঘন্টা সচল থেকে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়। বয়স তখন একেবারে কাঁচা না হলেও নয়া পরিবেশকে চোখে রঙ্গিন চশমা লাগিয়ে দেখার স্তর পার হয়নি। সুতরাং চীনে যা-ই দেখেছি অদ্ভুত ভাল ও সুন্দর লেগেছে। ভাষার অসুবিধা সত্ত্বেও এটুকু বোঝা অসম্ভব হয়নি যে, সাত বছরে নয়া চীনের নেতারা প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন। সফরের শেষের দিকে পিকিংপ্রবাসী প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক ইসরায়েল এপস্টাইনের (Israel Epstein) সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, "একটি বাক্যে মাও সে তুং-এর এ সরকারের সাফল্যের খতিয়ান দয়া করে দিন।" জবাব পেলাম, "অনাহার-দুর্ভিক্ষ খতম, সামন্ততন্ত্র খতম, বন্যা খতম।" এটা ত অসাধারণ বৈপ্লবিক সাফল্য। চীনের অতীত এবং নিকট-অতীতের ইতিহাস আমার জানা। পার্ল বাকের বই পড়লেই মনে হবে যে, অনাহার-দুর্ভিক্ষ চীনের জনতার জীবনের নিত্যসঙ্গী। পীত নদী ত আন্তর্জাতিকভাবে 'চীনের দুঃখ' বলে স্বীকৃত। আর এটাও জানি যে, চীনা সামন্ততন্ত্র আমাদের দেশের এই অভিশাপের চেয়েও বরাবরই বেশী হিংস্র ও হৃদয়হীন ছিল। সেই সামন্ততন্ত্র, বন্যা ও অনাহার

www.pathagar.com

সাত বছরে শেষ করে দেয়া ত অকল্পনীয় সাফল্য। নয়া চীনের এই চমকপ্রদ কৃতিত্ব নির্দ্বিধায় স্বীকার করলেও দু'টি বিষয়ে আমার মনে নিদারুণ খটকা লাগে। পিকিং শহরে এত আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্যের মধ্যেও আমার কেন যেন অসোয়াস্তি লাগে। প্রথম কারণটা বুঝতে একটু দেরী হয়। সারা শহরে দিনের পর দিন কোন ধরনের একটা পাখীর আওয়াজ শুনিনি। দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, কাক, চড়ুই আরও নানা পাখীর কলকাকলিতে যার কান অভ্যস্ত তার এটাতে দারুণ অসোয়াস্তি না লেগে পারেনি। কথাটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমি চীনা বন্ধুদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। জবাব পাই যে, "জনগণের তিন দুশমন"--মশা, মাছি এবং ইঁদুর—মাও সে তুং চীনের সত্তুর কোটি মানুষকে নির্দেশ দেন নির্মূল করতে। সঙ্গে সঙ্গে তারা পিটিয়ে আর চাপড়িয়ে এদের নির্বংশ করে দেয়। তেমনি পাখীরা ফসল খায় বলে তিনি তাদের শেষ করে দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। পাখীরা বিপুল পরিমাণ শস্য খেয়ে ফেলে মানুষকে বিপদে ফেলে জেনেও পাখীর আওয়াজ শুনতে না পারাটা কেমন জানি ঠেকল। অসোয়াস্তি লাগার অন্য কারণটি বুঝতে দেরী হয়নি। পিকিং এবং চীনের অন্যান্য শহর, বন্দর, গ্রামে—যেখানেই গেছি ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে-পাশে যেদিকেই তাকিয়েছি মাও সে তুং-এর মাঝারি এবং বিরাট ফটো, প্রতিকৃতি ও বাণীসম্বলিত পোস্টার দেখতে হয়েছে। মনে পড়ে গেছে জর্জ অরওয়েলের বিতর্কমূলক বই "১৯৮৪"। বিশ বছর আগে বইটি যখন পড়ি তখন মনে হয়েছিল 'বুর্জোয়া দালালের' সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে নোংরা অপপ্রচার ও ভিত্তিহীন কুৎসাতে ভরা বইটি। তবুও বইটি 'বড় ভাইয়ের' সর্বত্র, সর্বক্ষণ অদৃশ্য খবরদারির কল্পনাটা মনে অসোয়াস্তিই সৃষ্টি করেছিল। কোন ব্যক্তিকেই, তা তিনি যত গুণেরই আধার হন না কেন, আমি প্রায় খোদার আসনে বসাতে, তাঁর স্তব করতে নারাজ। রাশিয়ার স্টালিনকে আমৃত্যু অতিমানব বলে দুনিয়ার কমিউনিস্টরা সে যুগে প্রমাণ করার চেষ্টা কুৎসিতভাবেই করেছে। স্টালিনকে তাঁর গগনচুম্বী আসন থেকে নামানো হলেও মাও সে তুং-এর 'বীর পূজা' যে কেবল তখনও চলেছেই তা নয়, তাঁকে স্টালিনের শূন্যস্থানে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় এক নম্বর নেতার আসনে বসাবার চেষ্টা অপ্রচ্ছন্নভাবে চীনারা শুরু করেছে বলে আমি

www.pathagar.com

চীন থেকে ফিরে দেশী কমিউনিস্ট বান্ধবদের বললে তারা আমাকে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী' বলে গাল দেয়। ঐবার চীন সফরের সময় সর্বত্র চীন-রাশিয়া ফ্রেণ্ডশীপ হলের অস্তিত্ব দেখে দেখে হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। আর সর্বত্র দেখেছি 'আমেরিকাকে ঘৃণা কর অভিযান' (Hate America campaign) অনুযায়ী পার্কে পার্কে মিটিং করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে মানুষের দুশমন একথা বুঝানো হচ্ছে।

১৯৬৪ সালে পিআইএ'র উদ্বোধনী ফ্লাইটে দ্বিতীয়বার চীন যাই। এবার ছিলাম মাত্র সাত দিন। কিন্তু এর মধ্যেই পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হয়। মাও সে তুং-এর ব্যক্তিপূজা অশ্লীলতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে দেখলাম। হোটেলের লাউঞ্জে, এয়ারপোর্টে, রাস্তাঘাটে এবার দেখলাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বদলে ক্রুশ্চেভ ও রাশিয়ান নেতৃবর্গের শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে চলেছে। এক আঠার বছরের যুবক যখন আমাকে একা পেয়ে মাও সে তুং-এর মাহাত্ম্য বোঝাতে গেল তখন আমি অসহিষ্ণু হয়ে বলে ফেললাম, "বাছা কেটে পড়। আমি নাবালক নই। কোন মানুষকেই আমি অতিমানুষ বলে স্বীকার করি না। মাও সে তুং নিশ্চয়ই একজন মহান নেতা। কিন্তু তাঁর কি তিনটি ঠ্যাং আছে যে, কেবলই 'মাও, মাও, মাও' বলে জিন্দাবাদ দিতে হবে?" মনে হলো শ্রীমান অজ্ঞান হয়ে যাবে। এসব সত্ত্বেও চীনের নেতৃত্ব সম্বন্ধে একেবারে বিপরীত মত-ধারণা পোষণ করার মত নির্বুদ্ধিতা আমার হয়নি।

১৯৫৬ সালে চীন থেকে ফেরার পর ঢাকায় আমরা পাক-চীন মৈত্রী সমিতি গঠন করি এবং সে বছরই শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই যখন পূর্ববঙ্গ সফরে আসেন তখন আমরা তাঁকে ঢাকা বিমানবন্দরে যে সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম তা তাঁর সেবারকার ভারত, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান যৌথ সফরে সবচেয়ে স্মরণীয় বলে চৌ পিপল্‌স্ কংগ্রেসে রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন। সে সময়ে চীন আর ভারতের সম্পর্ক একেবারে মধু আর মিছরির মত মিষ্টি। কিন্তু ১৯৬৪ সালের আগে থাকতেই ভারত-চীন সম্পর্ক হয়ে পড়ে অহি-নকুলের। রাশিয়ার কথা উল্লেখ করেছি। আমেরিকার সঙ্গেও সম্পর্কের রূপান্তর ঘটে সত্তরের দশকে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, সম্পর্কটা রাশিয়ার 'আগ্রাসী সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের' বিরুদ্ধে পারস্পরিক নিবিড় সহযোগিতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। 'দুনিয়া

www.pathagar.com

সদা পরিবর্তনশীল, পরিবর্তনই একমাত্র সত্য'--মার্কসের এ তত্ত্ব এমন-ভাবে ফলবে এটা কল্পনা করা ১৯৫৬ সালে কঠিনই ছিল। 'মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' কেবল পাঁয়তারাটা ১৯৬৪ সালে চীনে দেখে এসেছিলাম। সেটা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, স্তম্ভিত না হয়ে উপায় ছিল না। অণুবিজ্ঞানীদের কাঁধে লাঙল তুলে দিয়ে, হাতে ঝাড়ু দিয়ে শ্রমের মর্যাদা শেখাতে মাঠে চাষ করতে, রাস্তা ঝাঁট দিতে পাঠানো হতে লাগল। চীনের বয়স্ক অধিকাংশ নেতাই বালক-কিশোর অর্বা-চীনদের দ্বারা কেবল ক্ষমতাচ্যুত নয়, বেইজ্জত হতে, জেলে যেতে, মার খেতে, ভবলীলা সাঙ্গ করতে বাধ্য হলেন। যে লিউ শাও চী'র সঙ্গে ১৯৫৬ সালে সাক্ষাৎকার চেয়ে আমরা 'অমন মহান স্তরের নেতা'র সঙ্গে দেখা করার উপযোগী ডেলিগেশন নই বলে দেখা পাইনি, সেই লিউ শাও চী'কে পিকিং-এর রাস্তায় ক্যাঙারু নাচ নাচায় ঐ 'লাল বাহিনী'র ছোকরারা। এক ট্রেনের কামরায় নিঃসঙ্গ, বিনা-চিকিৎসায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে বলা হচ্ছে। লিউ শাও চী'র স্ত্রীকেও কম বেইজ্জত করা হয়নি। মাও সে তুং-এর স্ত্রী চিয়াং চিং লিউ শাও চী'র স্ত্রীকে প্রকাশ্যে 'বেশ্যা' বলে গাল দেন। কোরিয়া যুদ্ধের বীর সেনাপতি লিন পিয়াও-এর মাওয়ের ঠিক আধহাত পিছনে 'লাল বই' হাতে পরম অনুগতের মত দাঁড়িয়ে থাকা ফটো দেখতে দেখতে গা'টা কেমন করে উঠত। সেই লিন পিয়াওকে রাশিয়া পালাবার সময় প্লেন ধ্বংস হয়ে মারা যেতে হয়। তিনি নাকি বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। চৌ এন লাই-এর অবস্থা কাহিল হলেও কোন রকমে পড়ু পড়ু অবস্থায় তিনি টিকে ছিলেন। লিন পিয়াওই ছিলেন মাও-এর মনোনীত উত্তরাধিকারী। মাও সে তুং-এর 'বিরাট এক লাফে এগিয়ে যাবার' নামে আসলে আধুনিকীকরণের বিরোধী পশ্চাদমুখী অর্থ-নৈতিক নীতি এবং 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' নামে নিজের চীনের সর্ব-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে আসনটি চিরস্থায়ী করে যাবার মোহে ব্যক্তিপূজাকে এমন অসম্ভব পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় যে, চীনের পত্র-পত্রিকায় মাও-এর নামের আগে একবার নয় কয়েকবার 'মহান' বিশেষণটি প্রয়োগ করা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চীনের সাহিত্য হয়ে পড়ে ফরমায়েসী ইশতাহার। ১৯৫৬ সালে যে 'মাংকি কিং' অপেরা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, সে 'মাংকি কিং'-কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে শুনে কি বলব ভেবে পাইনি। শেক্সপীয়র, বিটোফেন, কনফুসিয়াসও

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ হয়ে গেল। দুনিয়াতে বর্তমানে, অতীতে, ভবিষ্যতে মাও সে তুং-এর চিন্তাধারাই সকল সত্যের, জ্ঞানের, অভিজ্ঞানের নির্যাস ছিল, আছে এবং থাকবে—এ তত্ত্ব সিরিয়াসলি প্রচার হতে দেখে বিস্মিত হলেও মনে পড়েছে স্টালিনের আমলে রাশিয়ায় অনুরূপ অবস্থা গেছে এবং 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেন্ট', 'ইডিয়ট'-এর মত বইয়ের স্রষ্টা দস্তয়ভস্কীকে 'জনগণের দুশমন' (Enemy of the people) আখ্যা দেয়া হয়েছিল।

এসব ব্যাপার সত্ত্বেও মাও সে তুং-এর মৃত্যুর পর 'মহাপ্রয়াণে মাও সে তুং' শিরোনামায় যে সম্পাদকীয়টি লিখেছিলাম তাতে চীনের ৭০ কোটি মানুষের দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাওয়ার অবিস্মরণীয় সংগ্রামের প্রধানতম নেতা হিসেবে মাও সে তুং-এর অমর অবদানের দ্বিধাহীন স্বীকৃতি দিতে বিন্দুমাত্র কসুর করিনি বলেই আমার ধারণা। জীবনের শেষের দিকে যে মারাত্মক ভুলগুলো মাও করেছিলেন সেগুলো অকুণ্ঠভাবে মেনে নিয়েও 'লং মার্চে' মাও সে তুং-এর ভূমিকাটা মনে রাখা সত্যিকারের ইতিহাসবোধের পরিচয় হবে। কিন্তু তা বর্তমানে চীনে হচ্ছে কি? স্টালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় যেমন ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করে, মাও-এর মৃত্যুর পরও একই প্রক্রিয়া শুরু হয়। মাও-এর মৃত্যুর কিছুদিন পরই চৌ পরলোকগমন করেন। মাও-এর পর তাঁর তৃতীয় পত্নী চিয়াং চিং তাঁর তিন স্যাঙ্গাতকে নিয়ে চৌ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এদের বাড়াবাড়ি চরমে পৌঁছেছিল। চৌ-এর মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিতে ভক্তবৃন্দ অর্পিত মালাগুলো রাতের অন্ধকারে মাও পত্নী মাদাম চিয়াং চিং-এর নির্দেশে অপসারণ করা হলে গণমনে যে বিক্ষোভের সূচনা হয় তার সুযোগ নিয়ে চৌ-এর অনুসারী ফেং ও পিকিং-এর মিলিটারী কমাণ্ডোরা চার কুচক্রীকে গ্রেফতার করে ইতিহাসের চাকা আবার ঘুরাতে শুরু করেন। আজ চীনে 'সর্বজয়ী' 'সর্বজর গজসিংহ' মাও-এর চিন্তাধারা জপ করা বন্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য আমেরিকার সঙ্গে লদ্‌কালদ্‌কিটা আরও বেড়েছে। 'চার কুচক্রী' কোথায় কি হালে আছেন কেউ জানে না। মাও সে তুং-এর সব ফটো এখন নামিয়ে ফেলা হচ্ছে। ১৯৬৪ সালে এই ফটোর যে ধুম দেখে এসেছি তারই প্রেক্ষিতে বর্তমান ফটো অপসারণ অভিযানটি শ্রমসাধ্য ব্যাপার হচ্ছে বলে আগে মন্তব্য করেছি। মাও-পূজার অভিনন্দনযোগ্য অবসান

www.pathagar.com

করতে যেয়ে বাড়াবাড়ি করে যেন ঘটনাপঞ্জীর, ইতিহাসের আবার বিকৃতি ঘটানো না হয় মহাচীনের মহান জনতার অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী সকলেই কামনা করবে।

ব্যক্তিপূজার ফল কখনই শুভ হয় না। 'ইলদ্যুচে' মুসোলিনী ও 'ফুয়েরার' হিটলার নিজের ও তাঁদের দেশের জন্যে কি পরিণাম ডেকে এনেছিলেন দেখেছি। 'দেবদারু, পাইন (মন্ত্রীবর আকবর হোসেন সাহেবের 'পাইন' নয়) গাছ' 'মহামতি' স্টালিন রাশিয়ার অগণিত মানুষের উপর নিরঙ্কুশ ডিক্‌টেটরী চালাতে যেয়ে কি ভাগ্য নাজেল করেছেন ক্রুশ্চেভের সে কাহিনী বর্ণনার পর কি প্রতিক্রিয়া হয় তাও দেখা গেছে। এখন মাও-এর পালা চলছে। পাকিস্তানের আগে ও পরে মুসলিম লীগ ও 'কায়েদে আজম' জিন্নাহ সাহেবের নামে এক আল্লাহ্, এক জামাত, এক কায়েদে আজম (মহান নেতা) এই বেশরা শ্লোগান শুনতে হয়েছে। আইয়ুব আমলে মাও-এর 'লাল বই'-এর অনুকরণে 'সবুজ বই' বিলি করা হতে দেখেছি। এসবের পরিণাম-ফলও প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করেছি। উত্তর কোরিয়ার কিম ইল সুং দুনিয়ার 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ' বলে বিজ্ঞাপন যখন পড়ি তখন হাসি না পেয়ে উপায় কি ?

আমাদের বাংলাদেশেও 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ' বলে চেঁচিয়ে জজবা সৃষ্টির চেষ্টা যাঁরা করেছেন তাঁরা বঙ্গবন্ধু ও দেশের মঙ্গল করেননি। জিয়া সাহেবের ছবি ও ভাষণের যন্ত্রণায় টিভি'র সামনেই যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। খবরের কাগজ পড়াও বোধ হয় ছেড়ে দিতে হবে। সাদায় কালোয় মিলেই ইতিহাস। জীবন একরঙা নয়। ব্যক্তিমানুষকে পুতুলে পরিণত করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কোন মানষ দেবতা নয়।

৬ আগস্ট ১৯৮০।

www.pathagar.com

৩৩

গত কয়েক দিন ধরে পার্লামেন্টে বক্তৃতার মাধ্যমে শাজাহান সিরাজ সাহেবের দেয়া তথ্যটি মাথার মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল--"বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে কোটিপতির সংখ্যা ছিল দু'জন আর এখন সে সংখ্যা ষাট থেকে সত্তুর জন"। ভাবতে ভাবতে মাথার ঘিলু গরম হয়ে বাষ্প হয়ে যাবার উপক্রম হল। ১৯৭৪ সাল মানে আওয়ামী লীগের লুটপাটের আমলের একেবারে উত্তুঙ্গ বছর। এর আট মাস পরেই, অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন এবং আওয়ামী লীগাররা গদিচ্যুত হয়। আওয়ামী লীগ আমলে যদি কুল্লে দু'জন কোটিপতি সৃষ্টি হয়ে থাকে আর এখন এই পরম ধর্মরাজ্যের সময়ে ষাট-সত্তুরজন কোটিপতি রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়, তবে কি ঐ আওয়ামী দুষ্কৃতকারীরা তাদের আমলে আসলে বসে বসে কম্বলের পশমের উঁকুন বাছছিল? না, শাজাহান সিরাজ বক্তৃতার তোড়ে একটা জবর ভুল করেও আমার কাছে ভুলটা স্বীকার করার সৎসাহস দেখাতে পারেননি? সেদিন কথায় কথায় ব্যাপারটা জনৈক বন্ধুকে বলি। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তুমি কি আজকাল গাঁজাটাজা এস্তেমাল করছ, না খবরের কাগজ পড়াই ছেড়ে দিয়েছ?" একাধারে তিরিক্ষি মেজাজে এবং কাঁচুমাচু করে জবাব দিলাম, "জ্বালিও না বলছি, শালার ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্রণায় চল্লিশ বছরের প্রেমিকা সিগারেটকেই পরিত্যাগ করেছি আজ চার মাস এবং মনে হচ্ছে এবারকার বিচ্ছেদটা পাকাপাকিই হল। আল্লাহ্ আমাদের একাউন্ট্যান্ট অর্থমন্ত্রী টয়লেট পেপার ব্যবহারকারী কালো সাহেব সইফুর রহমান সাহেবের হায়াত দরাজ করুন। তিনি বিদেশী সিগারেটের আমদানী বন্ধ করে তার দামটা আরও বাড়িয়ে আমাকে নির্মল আনন্দ দিচ্ছেন। সিগারেটই খান করি না, তুমি দেখাচ্ছ গাঁজা। গাঁজাতো কবিরা খায়।" তারপর কাঁচুমাচু করে

www.pathagar.com

বললাম, "মাঝখানে শরীরটা খারাপ থাকায় কাগজগুলোর ওপর কেবল চোখ বুলিয়ে গেছি। আর কাগজগুলোতে থাকে কি যে পড়ব! সরকারী কাগজগুলোতে শতকরা ৬০ ভাগ জায়গা জুড়ে থাকে বিজ্ঞাপন আর বাকী ৪০ ভাগের ত্রিশভাগ রাষ্ট্রপতি জিয়া সাহেব ও বাজাদল সম্বন্ধে আহা আর বাহা মন্তব্যে ভরা। 'সংবাদ' কর্তৃপক্ষ অবশ্য বিজ্ঞাপন না পেয়ে খবর, সমীক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পাতা ভরেন। তবে ভাই জান ত গোয়ালা নিজের দই খায় না। আমিও 'সংবাদ'-এর আমার এই 'দরবার' ছাড়া কিছুই পড়ি না। এটাও পড়ি কটা ভুল হল দেখার জন্য।" বন্ধুবর বললেন, "তাই বল! তোমার 'সংবাদ'-এ গত ১১ই জুন তারিখে বেরিয়েছে যে, ঢাকা সিটি পিপল্‌স্ লীগ সম্মেলনে ডক্টর আলীম আল রাজী তাঁর ভাষণে বলেছেন, 'শেখ সাহেবের আমলে '৭৪ সালে কোটিপতির সংখ্যা ছিল মাত্র দু'জন; জিয়ার আমলে হয়েছে ৬৪ জন।" গাড়ল বনে গেলাম। কিন্তু তবু মনের ধাঙ্কাটা গেল না। এই সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মনটাকে নিয়ে সত্যি বড়ই বিপদে পড়েছি। সরকারের ত নয়ই, বিরোধী দলীয় কারও কথা, কোন সংখ্যা যাচাই না করে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। ডক্টর রাজীকে ফোন করলাম, "ভাই সাহেব, কোটিপতির ফিগারটা কোথায় পেয়েছেন?" "এক মিনিট দাঁড়ান" বলে সত্যি মিনিটখানেক পরে ডক্টর রাজী বললেন, "বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক বুলেটিনের ১৯৭৯ সালের অক্টোবর সংখ্যার ৪৮০ নং পৃষ্ঠায় পাবেন।" আমি নিজের অজ্ঞতা গোপন করার চেষ্টা করি না। আমি অর্থনীতিবিদ নই। বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের বুলেটিন পড়ার অভ্যাস আমার নেই। কাল সন্ধ্যায় ডক্টর রাজীর বাড়ীতে এই প্রথম যেয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে, বছরের প্রথম ল্যাংড়া আম খেয়ে, কোকাকোলা পান করে ডক্টর রাজীব বিদুষী ভার্যার লেখা 'গীতি-মিতালী' গানের বইটা তাঁর কাছ থেকে উপহার নিয়ে বাড়ীতে এসে বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্যে সালাম জানিয়ে 'মারহাবা, মারহাবা' বলে চেঁচিয়ে উঠব কিনা চিন্তা করতে লাগলাম। সত্যি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাঁর উন্নয়নের প্রাথমিক যুগে বছরে বারজন কোটিপতি সৃষ্টি করতে পারেনি। আজ দু'শ' বছর পরে অবশ্য ঐ দেশে কোটিপতির ছড়াছড়ি রয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুকুরেরাও আমাদের জনগণের চেয়ে অনেক বেশী ভাল খায়-পরে। তাদের কচু খাওয়ার উপদেশ কেউ দিলে

www.pathagar.com

তারা কামড়েই সে বিজ্ঞ ব্যক্তির দফারফা করবে। দুনিয়ায় এমন কোন দেশ নেই যেখানে দুর্নীতি নেই। কম আর বেশী। সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনেও দুর্নীতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেসব দেশের কাগজগুলো এখন লিখছে। ধনবাদী বা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাই দুর্নীতির, অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রমে উৎপাদিত সম্পদের বাড়তি মূল্য অপহরণের ওপর যে দাঁড়িয়ে রয়েছে--এ তত্ত্ব এখন পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরাও আর সরাসরি অস্বীকার করেন না। তবু সেখানে পুঁজি গড়ে ওঠে ধীরে এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। আমেরিকার ফোর্ড, কার্নেগী, রকফেলার, জার্মানীর ক্রুপ্‌স্‌, টাইসেন, জাপানের মিৎসুবিসি, মিৎসুই থেকে শুরু করে ভারতের টাটা, বিরলা, কিরলস্কর, গোয়েঙ্কা—কেউই পারমিটবাজি বা নিছক সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দু'দশ বছরের মধ্যে নিঃসম্বল অবস্থা থেকে কোটিপতিতে পরিণত হয়নি। পাকিস্তানে বাইশ পরিবারের নাম-ধাম ঠিকুজি জানতাম। তাদেরও অধিকাংশ ভোজবাজির কায়দায়ই কোটিপতি হয়েছে। পাকিস্তানের সৃষ্টিই হয়েছিল হিন্দুদের প্রতিযোগিতা থেকে মুক্তি পেয়ে মুসলমান জনতাকে একচেটিয়া হৃদয়হীনভাবে শোষণ করে কিছুসংখ্যক হারামজাদাকে আধুনিক শরিফজাদায় অর্থাৎ কোটিপতিতে রূপান্তরিত করতে। পাকিস্তানের আগে আদমজীরা ত্রিশ-চল্লিশ লাখ টাকার মালিক ছিল। গুল মোহাম্মদ, হানিফ এদের পিতা দানবীর স্যার আদমজী হাজী দাউদ বার্মার জঙ্গলে ব্যবসা করে প্রথম নিম্ন-মধ্যবিত্ত থেকে লাখ-পতিতে রূপান্তরিত হন। তারপর কি করে বাংলার চাষীদের টাকায় আদমজী জুট মিল করে বিশ বছরে পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্কের ভুয়া হিসেবেই আদমজীরা ৬৫ কোটি টাকার মালিক হয় তা আমরা দেখেছি। ১৯৪৫ সালে দাউদ, মিঠু শেঠ পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণ শোধ দিতে না পেরে দেউলিয়া হয়। ১৯৬০ সালে তারও সম্পদ ৫০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। সেহগলরাও কলকাতায় চামড়ার ব্যবসা করত এবং দু'দশ লাখ টাকার মালিক ছিল। তারপর ষাটের দশকেই তারাও পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্কের হিসেবে ৫০/৫৫ কোটি টাকার মালিক হয়। পাকিস্তানের প্রথম জন্মলগ্ন হতে প্রেস কনসালটেটিভ কমিটির মিটিং থেকে শুরু করে যেখানে পেরেছি বলেছি যে, আমাদের দারিদ্র্য এক হিসেবে আমাদের শক্তি। শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থের অভাবে একটা জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র অর্থাৎ একটা ক্ষুদ্র বিত্তবান শ্রেণী গঠনের

www.pathagar.com

পরিবর্তে সমগ্র জনতার মোটা ভাত-কাপড়, মাথার ওপর আচ্ছাদন, শিক্ষা ও রোগে চিকিৎসার বন্দোবস্ত রয়েছে এমন একটা সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা যেসব দেশে শক্তিশালী ধনিক শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে সে-গুলোর চেয়ে সহজ হবে। কিন্তু হল উল্টো। পাকিস্তানের অর্থ-নৈতিক প্রগতি হল চমকপ্রদ। কিন্তু তার চরিত্র হল শরীরের সব রক্ত যেয়ে মুখে-মাথায় জমা হওয়া। ফল যা হবার তাই হল। বাঙালীরা বিদ্রোহ করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দ্বারা পাকিস্তানের ধ্বংসের প্রক্রিয়াটা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।

বাংলাদেশ হওয়ার পর স্বভাবতঃই আশা করা গিয়েছিল যে, আমরা পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর ভুল ও জনতার জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধগুলো এড়িয়ে চলতে সক্ষম হব। সমাজতন্ত্রকে যখন রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির একটি বলে ঘোষণা করা হলো তখন আমি মনে মনে বেদনার হাসি হেসেছিলাম। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল পুরোপুরি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে। নিজের শ্রেণীচরিত্র বজায় রেখে সে মধ্যবিত্ত আনবে সমাজতন্ত্র! তাঁরা যদি চাইতেন একটি মোটামুটি জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র, যা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না ফেলেও গড়া যায় (যেমন বৃটেন, নেদারল্যাণ্ড, সুই-ডেন) তাহলেই বর্তে যেতাম। সমাজতন্ত্রের নামে কি করা হয় তা আমরা দেখেছি। তবু আজকের অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আওয়ামী-বাকশালীদের লুটপাটের কথা এখন যাঁরা বলেন, তাঁদের যদি লজ্জা থাকত তবে তাঁরা এ অভিযোগের পুনরা-বৃত্তি বহু পূর্বেই বন্ধ করতেন। আওয়ামী লীগ তার অসংখ্য কর্মীকে --যারা পঁচিশ বছর ধরে জেল খেটেছে, পুলিশের লাঠির বাড়ি খেয়েছে তাদের লাইসেন্স-পারমিট দিয়েছে। নিশ্চয়ই অন্যায় করেছে। দেশপ্রেমের পুরস্কার হিসেবে লাইসেন্স-পারমিট গ্রহণ দেশপ্রেমের আত্মা-রই অপমান। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেবে ১৯৭৪ সালে যে দু'জন কোটিপতির উল্লেখ করা হয়েছে তারা হয়ত পাকিস্তান আমলেরই কোটিপতি। আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের রাজত্বে দু'তিনজন কোটিপতি হওয়া বিচিত্র নাও হতে পারে। কিন্তু গত পৌনে পাঁচ বছরে ৬২ জন কোটিপতি তৈরী হওয়া মাশাল্লাহ্ কি কম কৃতিত্বের কথা! এ কারণেই ত সারা দুনিয়ায় আমাদের বর্তমান সরকারের ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছে। অবশ্য এ ধন্য ধন্য যোগাড় করতে লাখ লাখ পাউণ্ড

www.pathagar.com

খরচ হচ্ছে। তা হোক। বিনা পয়সায় সৎকাজের দাম কি?

এই কলামেই আমি বেশ কিছুদিন আগে লিখেছিলাম যে, সন্তান উৎপাদনের যেমন একটামাত্র প্রক্রিয়াই রয়েছে, তেমনি কোটিপতি হওয়া যায় একটামাত্র পন্থাতেই—চৌর্যবৃত্তি ও দুর্নীতির মারফতে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কোটিপতি হয় সাধারণতঃ আইনের আওতার মধ্যে এদিক-সেদিক অনেক ঝকমারি করে। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। কিন্তু সেগুলো ব্যতিক্রমই। আর আমাদের এখানে নিয়ম হল আজ ফাটা স্যাণ্ডেল, ফাটা প্যান্ট বা পাজামা আর দু'দিন পরেই আনকোরা নতুন টয়োটা ও হাতে ৫৫৫-এর প্যাকেট। এটা সম্ভব হয় সরকারের কল্যাণে। গতরাতেই কল্যাণীয় আনওয়ার হোসেন মঞ্জু (ইত্তেফাক সম্পাদক) বলছিল, "কাকা, সরকার যদি ইচ্ছে করে কালই আপনাকে কোটিপতি বানিয়ে দিতে পারে।" শুনেই বুকের ভিরতটা কেমন করে উঠল। এদেশে বিত্তবানের সংখ্যা যে অসম্ভব বেড়েছে তার কিছু খবর রাখি। ১০০ টাকা ঝুড়ি কই, ১২০ টাকা ডজন ল্যাংড়া, ৬০ টাকা হালি ফজলী অবলীলাক্রমে বাজার থেকে উধাও হয়। কে বলবে যে, বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেবে এ দেশের শতকরা আশি জনেরও বেশী লোক ক্ষুধার্ত এবং মানবেতর জীবন যাপন করছে? যে ৬৪ জন কোটিপতির কথা বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের ১৯৭৯-র অক্টোবরের (এরপর আর বের হয়নি) বুলেটিনে উল্লেখ করা হয়েছে, তা করা হয়েছে দেশের সিডিউল ব্যাঙ্কগুলোর একাউন্টের ভিত্তিতে। কিন্তু যাদের সমস্ত টাকাই বিদেশে রয়েছে তাদের বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের বুলেটিনের হিসেবে ধরা সম্ভব হয়নি। বিদেশে টাকা রয়েছে এমন কোটিপতির সংখ্যা বেশী হতে বাধ্য। এদেশে পুঁজি বিনিয়োগের আবহাওয়া কতটা রয়েছে, কতগুলো উল্লেখযোগ্য শিল্প গত আট বছরে গড়ে উঠেছে তার হিসেব নিলেই বোঝা যাবে পাকিস্তানী কোটিপতিরা অন্ততঃ পাকিস্তানকে যথেষ্ট শিল্পায়িত করেছে বিদেশে টাকা রেখেও। আমাদের কোটিপতিরা অধিকাংশই নীতি হিসেবে দেশে কোন পুঁজি আটকানোর বিরোধী। তবে হ্যাঁ, যদি সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যায় তবে তাঁরা সেগুলো নিয়ে বেচে খেতে একশ' বার রাজি। আর সরকারী কর্পোরেশনগুলোতে লুটের মাধ্যমে কোটিপতি তৈরীর পথ সুগম করা হচ্ছে। আমার চোখে ভাসছে রাস্তায় অহরহ নজরে পড়া পেট ও পিঠ এক হয়ে যাওয়া প্রায়-উলঙ্গ গ্রাম

www.pathagar.com

হতে ক্রমাগত শহরে আগত অগণিত মানব-মানবীর চেহারা। এদের রক্ত চুষেই ত হারাম আয়ের কোটিপতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই কোটিপতিদের নাম-ধাম বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক কেন প্রকাশ করেন না? করলে বুঝতাম এদের পিতা-মাতা শানকিতে করে, না এনামেলের বাসনে ভাত খেতেন। আর শ্রীমানরা ত সপরিবারে এবং বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে লাঞ্চ-ডিনার এস্তেমাল করেন বোন চায়না ডিনার সেটে। পার্লামেন্টের এবারকার বাজেট অধিবেশনে পরিকল্পনা মন্ত্রী ফসিহ-উদ্দিন মাহতাব বলেছেন যে, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে দেশের জনগণের অবস্থার যদি উন্নতি না হয় তবে ব্যাপক রক্ত-পাত অনিবার্য। আমি তাঁর সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে একমত। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারের যদি সত্যিই এ উপলব্ধি থাকে তবে কেন দুর্নী-তির মাধ্যমে রাতারাতি কোটিপতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবেই চলেছে? কেন আদম পাচারের ব্যাপারে দুর্নীতির সরকার-নির্ধারিত হিস্যা না পেয়ে এমপি'রা জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের স্টেটমন্ত্রীকে মারতে যান এবং বেচারা আতা মোহাম্মদ খান কিসের দোহাই পেড়ে কোন-রকমে ইজ্জতটা বাঁচান? কেনইবা রাষ্ট্রপতি হোমরা-চোমরাদের কোরান মজিদ ছুঁইয়ে 'আর ঘুষ খাব না' প্রতিজ্ঞা করান? চোরা যে কদাপি ধর্মের কথা শোনে না—এ পরীক্ষিত প্রবাদটি কি রাষ্ট্রপতি শোনেননি! যখন শিল্পমন্ত্রী জামালউদ্দিন ঘোষণা করেন যে, আদমজী-দাউদ সৃষ্টি হতে সরকার দেবেন না বা এক পয়সা ঘুষ না দিতে আবেদন জানান, তখন ঢাকার স্বল্প কটা গাড়ীর ঘোড়ারও কি হাসতে হাসতে পিলে ফেটে যাবার উপক্রম হয় না?

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। গতকাল স্নেহাস্পদ আনওয়ার হোসেন মঞ্জু ইত্তেফাকে "এই দুর্গ নির্মাণ করিতেছেন কাহারা" শিরো-নামে দীর্ঘ এক পর্যালোচনা ছেপেছেন। এই পর্যালোচনার একটি অংশে তিনি ভর্তুকি বন্ধ করার অজুহাতে সরকার কর্তৃক নিউজ-প্রিন্টের হঠাৎ টনপ্রতি আরও দু'হাজার টাকা মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়ার কঠোর সমালোচনা করেছেন অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে। সরকার সম্পূর্ণরূপে চলছে বিদেশী ভর্তুকির ওপর এবং প্রায় প্রত্যেকটি কর্পো-রেশনে কোটি কোটি টাকা গচ্চা দিয়ে সে পরিমাণ টাকাই ভর্তুকি দিয়ে ঐ কর্পোরেশনগুলোকে চালু রেখেছেন আমলাদের ও একশ্রেণীর পারমিট শিকারী, ইণ্ডেন্টরদের কোটিপতি হওয়ার সুযোগদানের মহৎ

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে। অথচ যদি মোটামুটি দুর্নীতিমুক্তভাবেও পাবলিক সেক্টরকে চালানো যেত তবে জনসাধারণের দুর্ভোগ কমত। গত কিছুদিনের মধ্যে সরকার নিউজপ্রিন্টের দাম বাড়িয়েছেন শতকরা ন'শ' ভাগ। এর ফলে বেসরকারী যে দু'একটি সংবাদপত্র রয়েছে তার অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হয়ে পড়বে। সরকার নিয়ন্ত্রিত দৈনিকগুলোর ত এ ব্যাপারে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এমনিতেই তাঁদের কাগজে শতকরা ৬০ ভাগ থাকে বিজ্ঞাপন। তথ্যমন্ত্রী সাহেব আনওয়ার হোসেন মঞ্জুকে পরিষ্কার বলেছেন যে, সরকারী কাগজগুলোর প্রয়োজন মিটিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই পেয়ে বেসরকারী কাগজগুলোকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এটা বলা যে সকল প্রকার নীতি-বিগর্হিত এ কথাটিও উপলব্ধি করার ক্ষমতা সরকারের নেই। অবশ্য সরকার বোধহয় মনে করেন যে, বেসরকারী কাগজ বের করতে দেয়াই একটা মেহেরবানি। সরকার যেভাবে কর্পোরেশনগুলোকে নগদ টাকা ভর্তুকি দেন সেভাবে সরকারী কাগজগুলোকেও দিলেই পারেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন দেয়ার ব্যাপারে তাঁরা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিয়ম মেনে চললেই ভাল করবেন। নিউজপ্রিন্টের দাম এভাবে বাড়িয়ে চলার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। সরকার দেশীয় শিল্পকে "প্রটেকশন" দেন যাতে শেষ পর্যন্ত দেশের সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়, অর্থাৎ শিল্পজাত দ্রব্যাদি সস্তায় পাওয়া যায়। কিন্তু গত তেত্রিশ বছর ধরে দেখছি, দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়ার ফলে আজ মধ্যবিত্তেরই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, জনগণ ত পরের কথা। মরহুম জনাব রফি আহমদ কিদওয়াই যখন ভারতের নেহরু মন্ত্রিসভার মন্ত্রী তখন চিনির মূল্য একবার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায় মিল মালিকদের কারসাজির ফলে। রফিজী সঙ্গে সঙ্গে জাপান থেকে চিনি আমদানীর ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই চিনির দাম পড়ে গেল। মিল মালিকরা রফিজীর দরজায় দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষার নামে ধরনা দিল। রফিজী সাফ জওয়াব দিলেন, "যে শিল্প জনসাধারণের মঙ্গল না করে দুর্গতি ঘটায় সে শিল্প জাহান্নামে যেতে পারে। এবার চিনি বাইরে থেকে আনায় তোমরা কিছু লোকসান খাবে; কিন্তু জনতা সস্তায় চিনি পাবে। অনেক মুনাফা অতীতে লুটেছ, এবার কিছু লোকসান দাও। সিধা রাস্তায় চললে ভবিষ্যতে আর চিনি আমদানী করব না।" নিউজপ্রিন্টের মূল্য-বৃদ্ধির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করলে সরকার সুবিবেচনার পরিচয় দিবেন।

৬ জুলাই ১৯৮০।

www.pathagar.com

৩৪

সরকার-বিরোধী দলগুলোর সমবেতভাবে জনশক্তি উপমন্ত্রী জনাব আতাউদ্দিন খান ও বি,এন,পি দলীয় এম, পি'দের রীতিমত গণসংবর্ধনা দেয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা উচিত বলে এ অধমের বিনীত নিবেদন। যদি তা না করা হয় তবে সেটা যে চরম অকৃতজ্ঞতাই হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রয়েছে কি? কোন একটি সরকার বিরোধী দল যাঁরা আগে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দিতে দিতে গলা ভেঙ্গে ফেলেছেন, গুলী খেয়েছেন, ফাঁসিতে গেছেন, অনেক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন, আবার প্রতিপক্ষের লোকজন মেরেছেনও প্রচুর, তাঁরা এখন পোষা মার্জারের মত মিউ মিউ করে সরকারের কানে মধ বর্ষণ করছেন। আর একটি একদা প্রবল প্রতাপান্বিত বিরোধী দলের একমাত্র কাজ হল 'হায় বঙ্গবন্ধু' বলে একবার লোকদেখানো বিলাপ করে উঠে পরক্ষণেই এর নেতারা রামছাগলের মত পরস্পর গুঁতোগুঁতি করে প্রেসিডেন্ট জিয়া ও তাঁর সমর্থকদের নির্মল আনন্দদান করা। জাতীয় পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় এম,পি'দের যত হাঁকডাক সবই এ সত্যটিই প্রমাণ করছে --"যত গর্জে তত বর্ষে না।" দেশে বিরোধীদলগুলোর কোন অস্তিত্ব রয়েছে কিনা তাই দেশের লোক বুঝতে না পেরে এ সরকারের মধ্যে সাধু ও সজ্জন ব্যক্তিদের যেরূপ সমাবেশ ঘটেছে তেমনটি আর কখনও ঘটেনি এবং আর কখনও ঘটবে না বলে চিন্তা করছে। অর্থাৎ শাহ নজরের সময় যখন বেচারা দুলহাকে একজন খোঁদী-পেঁচীকেও যেমন চাঁদবদনী বলে সার্টিফিকেট দিতে হয় ঠিক তেমনি আর কি! তাই এই মাহেন্দ্রক্ষণে জনশক্তি উপমন্ত্রী আতাউদ্দিন খান সাহেব আমাদের এই তিলোত্তম সরকারের একেবারে সভামাঝে পরোপুরি বস্ত্রহরণপর্ব সুসমাধা করলেন। সরকার বিবস্ত্র হয়ে নারী না পুরুষ কোন্ রূপে প্রকাশিত হলেন সেটা সর্বসমক্ষে বলা এই খণ্ডিতজিহবা অধমের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। সত্যি আতা খান সাহেবকে

www.pathagar.com

নিদ্বিধায় কলির শ্রীকৃষ্ণ বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপিনীদের বস্ত্র-হরণ করে নাম কিনেছেন, আতা খান সাহেবও তেমনি সরকারের বস্ত্রহরণ করে পরম বিপ্লবী হিসেবে স্মরণীয় হবে থাকবেন। আতা খান সাহেবকে সকলেই করিৎকর্মা লোক বলে জানে। অন্য একা-উন্ট্যান্টের ব্যালান্সশীট করতে যা সময় লাগে তাঁর লাগে তার অর্ধেক। অধিকাংশ এম,পি ও মন্ত্রী এম,পি, মন্ত্রী হওয়ার আগে যেমন ফতো-বাবু ছিলেন খান সাহেব তা ছিলেন না। পার্লামেন্টে তাঁর ভাষ্য অনু-যায়ী উপমন্ত্রী হওয়ার আগেই তাঁর তিনখানা মোটরগাড়ী ছিল। থাকবে না? আতা খান সাহেব কি হেজি-পেঁজি লোক? তিনি কি জহর হোসেন চৌধুরী?

এবার জনাব আতা খান সাহেব সরকারকে উলঙ্গ করে ফেললেন কি করে তা একটু বর্ণনা করা যাক। ৩০শে জুন তারিখে পার্লামেন্টে সরকার ও বিরোধীদলীয় সদস্যগণ একযোগে জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের একটি সার্কুলার উপলক্ষে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। আওয়ামী লীগ সদস্য জনাব ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক এই সার্কুলারটা পাঠ করে শুনিয়ে বলেন যে, এতে বিভিন্ন সদস্যকে তাঁদের দেয়া লোকজনের নাম তালিকায় উঠেছে কিনা জনশক্তি ব্যুরোতে খোঁজ নিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। জনাব প্রামাণিক বলেন যে, এটা এ সরকারের স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কারণ, কোন বিরোধীদলীয় সদস্য এ ধরনের কোন নাম দেননি। এর পরই লঙ্কা-কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। এই পার্লামেন্ট গঠিত হবার পর এই প্রথম সরকার সমর্থক ও বিরোধী এম, পি'রা মোটামুটি সমস্বরে একজন মন্ত্রীর মুণ্ডপাত করতে সোৎসাহে লেগে যান। বি, এন, পি'র এম, পি নূরুর রহমান বলেন, কোন কোন সদস্য অভিযোগ করেছেন যে, জনাব আতা খান প্রতিটি লোক পাঠাতে ২৫ হাজার করে টাকা নিচ্ছেন। অন্য একজন বি, এন, পি সদস্য শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের পুত্র এ, কে, ফয়জুল হক সাহেব বলেন, আমরা জানতে চাই উল্লিখিত তালিকায় কাদের নাম উঠেছে, তারা কাদের লোক।" আর একজন এম, পি জনাব আসাদুজ্জামান (যশোর) সরাসরি বলে ফেলেন, "মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নিজের ছেলের নামে এজেন্সী নিয়েছেন এবং বিদেশে লোক পাঠাবার জন্য এ এজেন্সীর তরফ থেকে প্রতিটি লোকের কাছ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা নেয়া হচ্ছে।" সত্যি এ

www.pathagar.com

দেশের কিস্যু হবে না। উপরোক্ত অভিযোগ সত্যি কিনা তা আমি জানি না। তবে আমি এটুকু জানি যে, মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে প্রায়-ক্রীতদাসের জীবন কয়েক বছর যাপন করে অকল্পনীয়ভাবে নিজের কপাল ফেরাবার জন্য এদেশের লোক পাগল হয়ে গেছে এবং ভিটেমাটি বিক্রি করে বিশ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে কখনও সত্যি বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে, আবার কখনও ঠগের পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে। গত বছর মে মাসে ইরাক ঘুরে এসে এ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমি এ কলামে একাধিকবার লিখি একটি কোম্পানীর নাম উল্লেখ করে। সে কোম্পানীর তরফ থেকে আমাকে হুমকি দিয়ে চিঠি দেয়া হয়। আমি পুলিশের কাছে তাদের বিরুদ্ধে জনশক্তি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে যে অভিযোগ করা হয় সেই সম্বন্ধে কি করা হচ্ছে জানার জন্য জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসারের কাছে যেতে চাইলে তিনি অনুনয় করে তাঁকে বিপদে না ফেলতে অনুরোধ করেন। আমি জানতে পারি, খুবই উঁচু সব মহল এসব কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক। আতা খান সাহেব নিজেই ছেলের নামে এজেন্সী খুলে বসে বেশ ভাল টু পাইস যদি সত্যি কামাই করছেন তবে আমি তাঁকে অন্তর থেকে মোবারকবাদ দেব। অন্যকে কামাইয়ের সুযোগ করে দেয়ত বেকুবে। আতা খান সাহেব বেকুব, এ বদনাম তাঁর অতি বড় দুশমনও তাকে দিতে পারবেন না। তাছাড়া ছেলের নামে এজেন্সী যদি সত্যি তিনি খুলে থাকেন তবে অন্যায়টা হয়েছে কি? আমাদের প্রাক্তন কওমী জবানে কথা ত রয়েছে "পয়লা খেশ, বাদ দরবেশ।"

তবে এম, পি'দের আক্রমণ নীরবে সহ্য করে যাবার পাত্র আতা খান সাহেব নন। তিনি একটা ছোটখাট বাঘের মত 'হালুম' করে লাফ দিয়ে পড়ে ঘোষণা করেছেন যে, বিদেশে আদম রফতানীর ব্যাপারে তিনি যা করছেন দেশের হিতার্থেই করছেন এবং প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত আছেন। আরও এগিয়ে যেয়ে খান সাহেব বলেন যে, কেবল তাঁরই পশ্চাতে এম,পি'রা লেগেছেন কেন? অন্যসব মন্ত্রীরা কি মোহান্ত ঠাকুর? বিশেষ করে তিনি বাণিজ্যমন্ত্রীর নাম করেন। এ ধরনের কাণ্ডকারখানা সত্যি এত বছর ধরে পার্লামেন্টারী রাজনীতি পর্যবেক্ষণকালে কস্মিনকালেও দেখিনি। প্রথমতঃ, সরকারী-বেসরকারী সদস্যরা মিলে জনৈক উপমন্ত্রীকে প্রায় কিমা বানানো। দ্বিতীয়তঃ, সেই উপমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি

www.pathagar.com

থেকে শুরু করে অন্য মন্ত্রীদের এর ব্যাপারে টানা। দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই পার্টি ফাণ্ডের জন্য টাকা ওঠানো হয়। কিন্তু চাকরি দিয়ে টাকা আদায় একটু অভিনব ব্যাপার বৈকি! জনাব আতা খান রাষ্ট্রপতির পরম সম্মানিত নামকে এ ব্যাপারে টেনেছেন বেশ কয়েক-দিন হয়ে গেল। এম,পি'রা জনাব খানকে এখনও ছাড়ছেন না। গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে তদন্তের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রায় সব তদন্তেরই শেষ ফল হয় লবডঙ্কা। কিন্তু এ ব্যাপারটিও যদি ধামাচাপা পড়ে যায় তবে তার ফল সরকারের জন্য মারাত্মক হবে। খবরের কাগজগুলোতে সরকারী দলের মধ্যেই কাদা ছোড়াছুড়ির বিবরণ অরাজনৈতিক ব্যক্তিরাও আগ্রহের সঙ্গে পড়েছেন। এ কার-ণেই বলেছি যে, বিরোধীদলগুলো সরকারের যে ক্ষতি পঞ্চাশটা জন-সভা করে করতে পারতেন না এক আতাউদ্দিন খান সাহেব তার চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতি করেছেন। সরকারী এম,পি'দের এ ব্যাপারে এভাবে ক্ষেপে যাবার সঙ্গত কারণ রয়েছে। বিদেশে পাঠা-বেন বলে হয়ত লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তারা সে টাকা ফুর্তি করে খরচও করে ফেলেছেন। এখন একজন লোকও পাঠাতে না পারায় তাঁরা এলাকাতেই যেতে পারছেন না। সুতরাং আতা খান সাহেবের ওপরে হামলা না করে তাঁদের উপায় কি? অন্যদিকে বেচারা আতা খান সাহেবের মর্মযাতনারও অতি সঙ্গত কারণ রয়েছে। কাঁঠাল ত অনেকেই খেয়েছে ও খাচ্ছে, রসগোল্লা-চমচম বিক্রি করে আঠার লাখ টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স তাঁর এক সহকর্মী দেখালে যদি টুঁ শব্দটি না হয় তবে তাঁর বিরুদ্ধে অপ্রমাণিত অভিযোগ নিয়ে এত হৈ চৈ কেন? সত্যি দুনিয়ায় ইনসাফ বলে আর কিছুই রইল না।

আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের আমলে দেশে দুর্নীতির স্রোত যে বহমান ছিল সেকথা কেউ অস্বীকার করবে না। তবে সে স্রোতটা বর্তমানের তুলনায় অতি ক্ষীণই ছিল মনে হয়। এখন ত মনে হয় দুর্নীতির স্রোত বর্ষায় পদ্মা বা পসরের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারবে। আওয়ামী লীগের সময় পুকুরচুরি করা হয়েছে বলা হয়, এখন ত শুনি বঙ্গোপসাগরেই থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে ঐ কাজ করা হয়েছে। এসব আমার কথা নয়, সরকারী এম,পি'দের আঁতে ঘা লাগলে আরও কত কেচ্ছা বেরুবে।

www.pathagar.com

পার্লামেন্ট নামক বস্তুটিই আদতে মন্দ ব্যাপার। বিষ না থাকলেও এর কুলোপানা চক্কর যে আছে বেচারা খান আতাউদ্দিনের মত তুখোড় একাউন্ট্যান্ট সাহেবের নাজেহাল অবস্থা তাই প্রমাণ করে। বর্তমান মন্ত্রিসভায় তিনজন একাউন্ট্যান্ট রয়েছেন। দুষ্ট লোকে বলে গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, শোয়েব প্রমুখ অডিট এ্যাণ্ড একাউন্টস সার্ভিসের লোকই পাকিস্তানের বারটা বাজিয়েছে। আমি কিন্তু একাউন্ট্যান্টদের ভীষণ ভক্তি করি। কারণ, আমার দুয়ে দুয়ে কখনও চার হল না। হয় তিন হয়, নতুবা পাঁচ।

১৩ জুলাই ১৯৮০।

www.pathagar.com

জহুর ঃ বন্ধুর চোখে

জহুর ছিল একটা বিশালকায় প্রাচীন মহীরুহের মতো, যার ছত্র-ছায়ায় বহু প্রাণীর আশ্রয় হত। সে ছিল ভগবান তথাগতের বোধি-বৃক্ষ, জ্ঞান-বুদ্ধি-সিদ্ধির নিশ্চিত আধার যেন। চল্লিশের দশকে যখন তাকে জানবার সৌভাগ্য হয়, তখন থেকেই অসুস্থ হলেও, সে যে মৃত্যুকবলিত হতে পারে এ চিন্তা কোনদিন মনে জাগেনি। আমাদের অবচেতন তাগিদের স্বার্থে তাকে মনে হত অজয়-অমর। সে ভুল যখন হঠাৎ ভাঙল তখন বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, বেদনা বারিধি মথি জীবনের বন্ধ্যা উপকূলে যা পেলাম তা কয়েকটি খণ্ড বিক্ষিপ্ত চিত্র মাত্র, তার বিশাল ব্যক্তিত্বের সম্যক পরিচয় নয় মোটেই সেগুলি।

বোধহয় চৌচল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ সনে আন্দোলনমুখর কলকাতা মহানগরীতে তার বাসায় আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বোধহয় তৎকালীন মফস্বল কলেজের ইংরেজী শিক্ষক মঈদুল ইসলাম, বর্তমানে যিনি রাষ্ট্রীয় নিয়োগ কমিশনের সভাপতি। তখনও জহুর বোধকরি আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংস্থা হতে বহিষ্কৃত নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে মানসিক গাঁটছড়া সম্পূর্ণ ছিন্ন করেনি, যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মাসোহারাভুক হিসাবে তাঁর ইণ্ডিয়ান কনফেডারেশন অব লেবার (আমাদের বিদ্যাপীঠ প্রেসিডেন্সি কলেজের ঠিক উল্টো দিকে, কলেজ স্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান কফি হাউসের উপর তলায় যার কেন্দ্রীয় আপিস ছিল) এবং র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (নিন্দুকেরা নাম দিয়েছিল 'রাধিকা রমন পার্টি') বেশ কানাঘুষা বদনাম রাষ্ট্র হয়েছিল ইতিমধ্যেই। স্মরণ পড়ছে ক্ষীণভাবে যে, তাকে উপস্থিত বেশ কিছু বন্ধু শ্লেষাত্মক কটূক্তি করেছিলেন। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ইতিহাসবেত্তা, তত্ত্ব ও তথ্য বিশারদ, প্রজ্ঞায় প্রবীণ কিন্তু বয়সে নবীন, জহুর অত্যন্ত শালীন ভাষায় শান্তকণ্ঠে এম এন রায়ের "ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা" শীর্ষক পুস্তিকার সারমর্ম,

www.pathagar.com

তাঁর বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা ও যুগান্তকারী দূরদর্শিতা সম্পর্কে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল।

তাকে দেখে তখন আফসোস হয়েছিল যে, বঙ্গদেশে ভাস্কর্য শিল্পের ঐতিহ্য নেই। নইলে তার মত রাশভারী চেহারা, ব্যক্তিত্বে প্রোজ্জ্বল মুখমণ্ডল ভাস্করের স্বপ্নে দেখা আদর্শ হত। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো সে মুখাবয়ব বোধহয় আশু মুখুজ্যের পর এ অঞ্চলে দেখা যায়নি। সাম্প্রতিককালে তার সমকক্ষ মস্তক, ললাট ও আনন ছিল একমাত্র কৃষ্ণ মেননের; যার তীক্ষ্ণ শাণিত দৃষ্টি ও বচনভঙ্গী আমাকে যুবক জহুরের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। জহুরকে সে সাদৃশ্যের কথা বহুযুগ পরে বলাতে খুব প্রীত হয়েছিল। পেলিকান সিরিজের গ্রন্থাবলীর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মেনন। মাহবুবুর রশিদ জহুরকে লণ্ডনের হাইড পার্কে কৃষ্ণ মেননের যুদ্ধকালীন এক বক্তৃতার বিবরণ দিয়েছিলেন যাতে কৃষ্ণ মেনন সম্পর্কে তার শ্রদ্ধা আরো প্রগাঢ় হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে জাপানী সমরতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে ভারতীয় জনতাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে, জাপানী নৃশংসতা থেকে ইংরেজের শাসন শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ মেনন নাকি তাঁর স্পীকার্স কর্নারের বক্তৃতায় বলেছিলেন, "এটা হল মাছকে জিজ্ঞেস করা যে সে ঘিয়ে না ডালডায় ভাজা হতে চায়। মাছের উত্তর হল যে, সে অন্যের রসনা চরিতার্থ করতে ভাজা হতেই নারাজ।"

যাই হোক, জহুরের মতোই বেপথু হয়ে গেছি। সেই প্রথম সাক্ষাতে লক্ষ্য করলাম যে, মানবেন্দ্র রায়ের বিপ্লবী ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি, কমিনটার্ন সম্মেলনে ঔপনিবেশিকতার অবশ্যম্ভাবী অবসান কিংবা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কে লেনিন ও সৌমেন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ, চীন বিপ্লব সম্পর্কে বোরোডিনের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য, ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ এমনকি ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকে বরণীয় অপব্যবস্থা সম্পর্কে তার নির্ভীক ও সুস্পষ্ট রায়, যা তখন কলকাতার ছাত্রসমাজে বহুবিতর্কিত তার কোন উল্লেখ জহুর সেদিন করেনি। খানিকটা অবাক হয়েছিলাম, তবে তার সৌজন্যে আমারও কুণ্ঠা হল প্রথম সাক্ষাতে এসব বিতর্কিত প্রসঙ্গ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে।

বিভাগোত্তর ঢাকায় আমার স্বল্পকালীন অবস্থানকালে জহুরের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ও প্রীতির সম্পর্ক আরো প্রগাঢ় হল সতীর্থ শহীদুল্লা

www.pathagar.com

(জহুর ও সে পরস্পরকে 'মামা' বলে ডাকত) ও কৈশোরের বন্ধু মুনীর, নূরুদ্দীন, সানাউল হক, ওয়াদুদুল হক, আহসান, মনু কবিরের সযত্ন মধ্যস্থতা ও পরিচর্যায়। দেশ-ভাগের পর ইসলাম-প্রীতির নামে যে প্রবল সাম্প্রদায়িক বন্যা দেশময় প্রবাহিত করা হচ্ছিল সরকারী আওতায় ও সমর্থনে, জহুর আরো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সঙ্গে তার সরাসরি মোকাবেলা করতে এগিয়ে গেল। তার সে ভাটির তরী উজানে নিয়ে যাওয়ার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, মনে আছে।

তারপর পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে আমার চাকরি উপলক্ষে অবস্থানকালে জহুরের আবির্ভাব, তার সঙ্গে হৃদ্যতার রাখীবন্ধন। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পাদক মহারথীত্রয়, মানিক মিয়া-সালাম-জহুরের প্রাণশক্তি, কেন্দ্রবিন্দু সবই ছিল জহুর। করাচী ও পরে রাওয়ালপিণ্ডিতে ক্রমবর্ধমান সুপরিকল্পিত আন্তঃ আঞ্চলিক বৈষম্য ও শোষণের রূপরেখা যতোই স্পষ্ট হতে থাকল এই তিনজন কুইক্সোট সংঘবদ্ধভাবে পাঞ্জাবী কায়েমী স্বার্থের দুর্গ প্রাকারে নিরন্তর ও আপোষহীন হামলা চালালেন কাষ্ঠ তরবারিকে হাতিয়ার করে। দুনিয়া অবাক হল, সকলে বিস্মিত হলেন, কায়েমী স্বার্থ বিচলিত হল, প্রভুভক্ত পাকিস্তান-পছন্দ বেশ কিছু বংগবাসী ও বংগভাষীও এই তিন পত্রিকা-সম্পাদকের চরিত্র-হননে তৎপরতা ও পারদর্শিতার পরিচয় দিলেন। সেকালে রবীন্দ্র সংগীত বর্জন ও নজরুলগীতির ইসলামীকরণের যে সরকারী প্রয়াস চলেছিল তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন মানিক-সালাম-জহুর ঐক্যজোট। একবার রবীন্দ্র-প্রীতির অমার্জনীয় অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ দূতাবাস থেকে কিঞ্চিৎ কাঞ্চন-প্রাপ্তির অভিযোগ আনা হয়। জহুর তৎকালীন পাকিস্তানের "লৌহ-মানব" আইয়ুব খানকে প্রকাশ্য সভায় অতি নাটুকে ভংগীতে বলেছিল, "স্যার, আমি সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানী সফর করে ফিরেছি। যুবরাণী মার্গারেটের থেকে প্রাণপ্রিয় আমার স্ত্রীর জন্য তোরঙ্গ বোঝাই ৪৭১১ নং কলোনের সুগন্ধি পানি চোরাচালান করে এনেছিলাম, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। কিন্তু হায় কপাল, যেদিন থেকে আপনার বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য পূর্ব পাকিস্তানী আমলার দল আমার বিরুদ্ধে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ নেবার অভিযোগ এনেছেন, সেদিন থেকে কলোনের আতরে সুবাহ-শাম গোসল করছি তাতেও গায়ের দুর্গন্ধ, হৃদয়ের গ্লানি

www.pathagar.com

মুছতে পারছি না। এত সস্তাদরে বিকোন আর যে জাতের পক্ষে সম্ভব হোক, বাঙালীর পক্ষে নয়।" শুনেছি সেদিন সে সুচিন্তিত ভাঁড়ামিতে রাষ্ট্রপ্রধান বীরবিক্রম রাষ্ট্রপতি নাকি মুচকি হেসেছিলেন। সে যাত্রায় ফাঁড়া কেটে গেল।

জহরের এ-ভাঁড়ামি, তার বলগাহীন প্রগলভতা নিয়ে অনেকেই গঞ্জনা দিতেন, আর গালমন্দ করতেন তার তদ্বির করার প্রবণতা দেখে। আমরা যারা তাকে দীর্ঘদিন কাছে থেকে জেনেছি, চিনেছি, আমাদের কিন্তু মনে কোন দিন তার সম্পর্কে সংশয় জাগেনি। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে যে স্বৈরতন্ত্র ক্রমশঃ নির্গমশীল ছিল তাতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি শাণিতবাক জহুর অনেক ভেবেচিন্তেই নিজের জন্য ভাঁড়ের ভূমিকা বেছে নিয়েছিল। তবে সেটা ছিল গোপালভাঁড়ের নয়, শেক্সপীয়রের রাজদরবারের Fool-এর, যে প্রবল পরাক্রমশালী চরিত্রের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে কৌতুকপ্রদ মন্তব্যের মাধ্যমে সুস্পষ্ট সত্যভাষণ করত। তৎকালীন পাকিস্তান, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের বর্গাদারি আমলে জহুরের সে ভূমিকা শুধু দুঃসাহসিকতারই পরিচায়ক ছিল না, বরং অত্যন্ত সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ সমর কৌশল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে পৌনঃপুনিক সংকটকালে। প্রগলভতার কারণও ছিল একই। অনেক কথার তোড়ে কোন কথা না বলার প্রবণতা তার ছিল না। বরং কঠিন ও অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করার এটা একটা সুচিন্তিত কৌশল ছিল। প্রতিপক্ষীয় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্ধশিক্ষিত বীরসেনানীদের সে সনাক্ত করেছিল বলেই এ অস্ত্রের অমোঘ অব্যর্থতা সম্বন্ধে সে পূর্ণ আস্থাশীল ছিল। তেমনি তার তদ্বির করার যে দুর্নাম রটেছিল, নিন্দুকেরাও বিপদে পড়লে জহুরের শরণাপন্ন হতেন এবং বিপদ-ত্রাণ হওয়ামাত্র বাঙালী মধ্যবিত্তের সহজাত বৃত্তির আশ্রয় নিয়ে জহুরের বিরুদ্ধে বদনামের ঝড় তুলতেন। রাওয়ালপিণ্ডিতে একটি বিশেষ সন্ধ্যা আমার এখনও মনে আছে যেদিন মানিক ভাইয়ের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়ামাত্র জহুর ভীষণ বিচলিত হয়ে আমাদের সঙ্গে সমরমন্ত্রণার জরুরী আসর ডাকলেন। আর সে সমরকৌশলের নিরিখ ছিল কোন্ কোন্ মহলে তদ্বির করা সুসমীচীন ও ফলপ্রসূ হবে তা স্থির করা। মানিক মিয়ার মুক্তিলাভ সম্পর্কে অনেকেই অনেক বিশেষ গুপ্ত ও গূঢ় তথ্য পরিবেশন করে থাকেন শুনতে পাই, তবে মানিক ভাই তাঁর অশ্রাব্য ভাষায় জহুরের অবদান স্বীকার করেছেন

www.pathagar.com

আমার উপস্থিতিতে সেই পুরানো ইত্তেফাক আপিসের আরাম কেদারায় বসে। তাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় হীরু ও মঞ্জু নিঃসন্দেহে তাদের "জহুর কাকা"র ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল।

জহুরের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের সুবাদে অনেকেই নাকি একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, শেষ জীবনে মানহানির মামলার আসামী হওয়ার দরুন তার মন ভেঙ্গে যায় এবং বেঁচে থাকার স্পৃহা উধাও হয়ে যায়। জহুর জোর গলায় সব সময় বলত যে তার মতো কাপুরুষ ভূ-ভারতে নেই। বলত যে, দুঃসাহসিক সরকার বিরোধী রাজনীতি সেজন্যই সে কোনদিন করেনি, করবেও না। সহস্র কথার মাঝে বলত প্রায়ই যে, আত্মগোপনকারী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের প্রতি সে নমস্কার জানায়, তবে তাদের প্রদর্শিত পথ তার মতো অভাজনের জন্য নয়। কারণ খুবই প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য—যদি কোনদিন পুলিশ তার দোরগোড়ায় হাজির হয় তবে তার হাত-পা পেটের ভেতর নির্ঘাত সেঁধিয়ে যাবে এবং সে নির্দ্বিধায় তক্তপোষের নীচে আত্মগোপন করবে আর তার স্ত্রীর দায়িত্ব হবে বাড়ীতে তার গরহাজিরার কথা অতি বিনীতভাবে আইন-শৃঙ্খলার প্রতিভূদের জানিয়ে দেওয়া। এসব আত্ম-ধিক্কারের কপটকৌশলের দরুন জহুর নিজেই নিজের প্রধান শত্রু প্রমাণিত হয়েছে!

একাত্তরের সে দুর্যোগঘন প্রহরে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। রাওয়ালপিণ্ডিতে ঢাকা ফেরত সামরিক বাহিনীর আন্তঃসার্ভিস গণ-সংযোগের পদস্থ অবাঙালী এক অধিকর্তা সে কাহিনী আমায় শুনিয়েছিলেন। ঢাকা নগরী তখন দখলদার বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ। দিনে-দুপুরে লোকজনকে তুলে নিয়ে গুম খুন করছে। শামসুর রাহমানের ভাষায় তখন 'সন্ত্রাসবন্দী বুলেটবিদ্ধ দিন-রাত্রি'। এমনি একদিন জহুর তার ছোটভাই হীরুর মোটর গাড়ীতে কোথাও যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তাকে ধরে এক ময়দানে আরো কয়েক ডজন লোকের সংগে বসিয়ে রাখা হয়েছে, কর্তৃপক্ষ তাদের 'নিধন-যোগ্য' লোকের কৃষ্ণ-তালিকার সংগে নাম মিলিয়ে দেখছেন। আমাদের পরিচিত সেই সামরিক অফিসার জহুরের নামোল্লেখ হতেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একি করেছ, এ ত আমাদের আমোদের খোরাক যোগান নামজাদা ভাঁড় জহুর, একটা পিঁপড়ে মারার দুঃসাহসও যার কোনদিন হয়নি। ছেড়ে দাও এই মুহূর্তে, নইলে যে মজলিশ কানা হয়ে যাবে।' সে যাত্রায় বদনামের

www.pathagar.com

ভাগী হয়ে জহুর বেঁচে গেল, কিন্তু সেই সামরিক অফিসারই আমাকে বলেছিলেন 'বাঘের বাচ্চা জহুরকে যখন ছাড়িয়ে আনতে গেলাম, ভয়-ডরের চিহ্নমাত্র ছিল না তার চোখে-মুখে।'

পঞ্চনদের ক্ষমতাসীন যথেচ্ছাতন্ত্রের প্রতিভূ আমার জানামতে শুধু অন্য একটি বিশিষ্ট বংগবাসীকে অনুরূপ ভাষায় 'শেরকে বাচ্চা' বলে সম্মান দেখিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন প্রাক্তন তথ্য সচিব জহুরুল হক; যিনি সম্প্রতি জহুরের মামলায় তার অন্যতম কৌসুলি ছিলেন। একাত্তর সনে জহুরুল হক ছিলেন ঢাকায় চাকরিরত একমাত্র কেন্দ্রীয় যুগ্ম সচিব। যখন মার্চ মাসের সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল তখন তিনি তাঁর কর্তৃত্বাধীনে কেন্দ্রীয় সকল প্রচারযন্ত্রকে সেই স্বাধিকার আন্দোলনের জোর ও অকুণ্ঠ সমর্থনে নিয়োজিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। তাঁর লেখা 'মুজিব বাংলাদেশে সার্বভৌম' নামক একটি প্রতিবেদন প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হল। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা, রাতারাতি ঢাকা বেতারে রূপান্তরিত হয়ে 'আমার সোনার বাংলা' প্রচার করে সংগ্রামী জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে সামরিক প্রকাশ্য আগ্রাসনের পর জহুরুল হককে নিয়ে যাওয়া হল লায়ালপুরে। সেখানে শত নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিম্নতন সকল কর্মচারীকে জানের ঝুঁকি নিয়েও বাঁচালেন নামতার মতো একটি কথার পুনরাবৃত্তি করে—"ওরা সব নির্দোষ, উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে আমার নির্দেশ পালন করেছে মাত্র"।)

এখন অন্য জহুরের প্রসংগে ফেরা যাক। সাম্প্রতিককালে মানহানির দায়ে তার গ্রেফতার ও পরে জামিনে মুক্তি সম্পর্কে দৈবক্রমে আমারও কিছু বক্তব্য রয়েছে। যেদিন রাতে এই ঘটনা ঘটে তাঁর পরদিন সকালে আমি তার বসতবাটির কোণের কামরাটিতে উপস্থিত, তার সংগে বিদায় সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। তখন দেখি প্রাণোচ্ছল জহুর টেলিফোনে বোধহয় ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদের সংগে কথা বলছে। রসিয়ে রসিয়ে পরম তৃপ্তির সংগে তার অভিজ্ঞতার কথা বয়ান করছে সে। কোন ক্ষোভ বা ভয়-ভীতি, উৎকণ্ঠা, অপমানবোধ বা আত্মগ্লানির চিহ্ন সেদিন তার মধ্যে নজরে পড়েনি আমার। টেলিফোন ছেড়ে দিয়েই চায়ের জন্য চালাও হুকুম, চোখে কয়েক ফোঁটা ওষুধ দেবার পর টপাটপ আধডজন বড়ি গিলে, সে কাহিনী আমাকে সবিস্তারে শোনাল। বলল, মধ্যরাতের পর পুলিশের আগমনে তার কিরকম

www.pathagar.com

'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা। তাকে নিয়ে পুলিশের গাড়ী গেল রাজনৈতিক নেতা অলি আহাদের বাড়ী। অলি আহাদ ঝানু রাজনীতিক, কারাগারের অভিজ্ঞতাও তাঁর পক্ষে নতুন নয়। তাই বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞজনের মতো তিনি পুলিশকে বসিয়ে রেখে ধীরে সুস্থে প্রাতঃকৃত্য ও নাস্তাপানি সেরে যখন দীর্ঘকাল পরে বেরুলেন তখন জহরকে অপেক্ষমাণ দেখে লজ্জিত হলেন। থানায় পৌঁছবার পর জহরের স্ত্রী অটোরিক্সায় চেপে সেখানে উপস্থিত। থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারী জহরকে চিনতেন না, এখন স্ত্রীর সূত্রে পরিচিত হলেন, কারণ পুলিশকর্তার দুই তনয়ারই তিনি প্রধান শিক্ষিকা। যাই হোক, জহর-জায়া একলক্ষ টাকার জামিন হয়ে স্বামীকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করার কিছুক্ষণ পরেই আমার আবির্ভাব। সেদিনের অভিজ্ঞতায় সে মুষড়ে তো পড়েইনি, বরং আড্ডায় বিঘ্নকারী টেলিফোনের ঘন্টা যখনই বাজছিল সে তার বন্ধু শুভাকাঙ্ক্ষীদের বেশ উৎসাহের সংগে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিল। সৎমানসিকতার অধিকারী জহর পুলিশ ও পুলিশের কর্তাব্যক্তিটির সৌজন্যের কথাও সকলকে বলছিল। যত রাগ তার গ্রেফতারী পরোয়ানা জারিকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও তার মামলার বাদীর বিরুদ্ধে। যখন একটানা দু'ঘন্টা টেলিফোনে এ ঘটনার চর্চা হয়েছে তখন মরিয়া হয়ে আমি বললাম, যথেষ্ট হয়েছে। আল্লার কাছে শোকর যে বিদেশে যাচ্ছি, নইলে এ মুখরোচক বিবরণী শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হত, তাছাড়া রসনা সংযত করা প্রয়োজন, কারণ, বিচারসাপেক্ষ বিষয়ে উদ্দেশ্যমূলক মন্তব্যের অপরাধে স্বনামধন্য কলামনিস্ট আবার আদালতের অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারে। বাস যেই বলা অমনি মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো জহরের হাঁসফাঁস আস্ফালন সহসা স্তব্ধ। আমি প্রসংগ পরিবর্তনের জন্য তাকে বন-প্রবাসী কাজী আহমদ রফিকের প্রসংগ তুললাম। জহর আবার চাংগা হয়ে সে ব্যক্তির গুষ্ঠি উদ্ধারে প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছে, আমি ধমক দিয়ে বললাম, "রফিক কোন স্বনামখ্যাত ব্যক্তির অপমৃত্যু উপলক্ষে জোলটান জেলকের কবিতার তর্জমা করে পাঠিয়েছে। এখন যখন ঘটনাক্রমে নেতৃত্বের আলখেল্লা জহরের ওপরও বর্তাচ্ছে, কবিতাটির শেষ স্তবক প্রাসঙ্গিক মনে হয় ঃ

"মানুষ আমি, বেঁচে থাকি মানুষের মতো।
সাহসী কেমন করে হবো ?

www.pathagar.com

শুধু মরণকে তত ভয় নয়,
যত ভয় ঘৃণার্হ বাঁচার ॥"

শুনেই জহুর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে স্পেনিস গৃহযুদ্ধে নিহত গার্সিয়া লোরকার দু'ছত্র কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল। তার পরেই 'ওরে বাপরে' বলে হুঙ্কার দিয়ে রফিকের উদ্দেশে আশীর্বাদবাণী পাঠাল। বুঝলাম তাকে তুলনা করার মতো কোন নাম সে খুঁজছে, তাই থামিয়ে দিলাম মাঝপথে, কারণ এরকম সদয় অতিশয়োক্তির লক্ষ্যস্থল আমি এবং অন্যসব বন্ধুরা সকলেই হয়েছি একাধিকবার। কারো কোন কথা পছন্দ হলেই তার প্রশস্তি শুরু হত "ওরে বাপরে" বলে, এবং মহান প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের সংগে বন্ধুদের তুলনা করে সে পরম তৃপ্তি লাভ করত। নিজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ইতিহাসবোধ, কাব্য ও সাহিত্যপ্রীতি, সুস্মিত ও নিটোল রুচিবোধকে সর্বক্ষণ অবমূল্যায়ন করে, অন্যদের সামান্যতম গুণকে বাড়িয়ে ফাঁপিয়ে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা, নিরীহ সাধারণ ব্যক্তিদের নিয়ে বীর গাথা রচনার প্রবৃত্তি বা বাতিক তার বহুদিনের। ইতিহাস তার নখদর্পণে, তাই নজিরের অভাব হত না, সে যতই কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত হোকনা কেন। আর অনুরূপ ইতিবৃত্ত জ্ঞান আমাদের ছিল না বলে তার অযৌক্তিক ও অতিশয়োক্তি খণ্ডন করতে যেয়ে আমরা হিমশিম খেতাম। শুধু বুঝতাম জহুরের মতো দরাজদিল, বন্ধুবৎসল, আচার-ব্যবহারে ভিক্টোরীয় যুগের ভদ্রলোক ভূ-ভারতে নেই, বোধ হয় অপমৃত সাঈদুল হাসান ছাড়া। সেদিন, আশি সনের জুলাই কিংবা আগস্ট মাসের সেই সকালে জহুর হোসেন চৌধুরীর সংগে শেষ সাক্ষাৎ চিরস্মরণীয় হয়ে রইল, তার বিব্রত পরিস্থিতিতেও তার সহজাত চির চেনা অথচ অনন্য মানসিকতার পরিচায়ক কথোপকথনের জন্য। এমনটি আর হবে না। সত্যই মানুষের মতো মানুষ ছিল দরবার-ই-জহুর। আর আমরা তার দরবারে শরিক ছিলাম সেজন্য নিজেকে ধন্য বলে মানি।

---সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম

[জহুর হোসেন চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রেঙ্গুন থেকে লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠির অংশবিশেষ। সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম তখন বার্মায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত।]

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ২

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জহুর হোসেন চৌধুরী ১৯২২ সালের ২৭শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্তমান ফেনী জেলার দাগনভূঞার রামনগর গ্রামে। তাঁর পিতা তৎকালীন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সাদাত হোসেন চৌধুরী, মা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ খানবাহাদুর আবদুল আজিজের কনিষ্ঠা কন্যা মোহসেনা খাতুন।

দুই বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। শৈশবে তিনি নানী ও খালার অভিভাবকত্বে নানাবাড়ীতে লালিত হন।

১৯৩৮ সালে তিনি সিরাজগঞ্জ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তাঁর পিতা তখন সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এরপর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই, এ এবং ১৯৪২ সালে ইতিহাসে অনার্সসহ বি, এ পাশ করেন। এম,এ পড়ার সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাধ্য হয়ে শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করেন।

১৯৪৭ সালে তিনি তাঁর সহপাঠিনী লুৎফুন্নেসা চৌধুরীকে বিয়ে করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর স্ত্রী ঢাকায় বিশিষ্ট শিক্ষয়িত্রী হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। তিনি দীর্ঘদিন কামরুন্নেসা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

জহুর হোসেন চৌধুরীর সাংবাদিকতা জীবনের সূচনা তাঁর খালাতো ভাই মরহুম হাবীবুল্লাহ বাহার সম্পাদিত "বুলবুল"-এ। ১৯৪৪ সালে তিনি কলকাতার বিখ্যাত "স্টেট্‌সম্যান" পত্রিকায় শিক্ষানবিস হিসেবে যোগ দেন। পরের বছর তিনি ইংরেজী সাপ্তাহিক "কমরেড"-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিছুদিন তিনি "স্টার অব ইণ্ডিয়া"তেও কাজ করেন।

দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে তিনি তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদে কর্ম-

www.pathagar.com

রত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর স্থায়ীভাবে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং সরকারের জনসংযোগ দফতরে কাজ করেন।

কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবার সাংবাদিকতার জগতে ফিরে আসেন। প্রথম তিনি "উপাত্ত" এবং পরে তৎকালীন "পাকিস্তান অবজারভার"-এর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। ১৯৫১ সালে সহকারী সম্পাদক হিসেবে দৈনিক "সংবাদ"-এ যোগ দেন এবং ১৯৫৪ সালে "সংবাদ"-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ সাময়িকভাবে "সংবাদ" বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি "কাউন্টারপয়েন্ট" নামে একটি ইংরেজী সাময়িকী সম্পাদনা করেন। আমৃত্যু তিনি দৈনিক "সংবাদ"-এর একজন পরিচালক ছিলেন।

ছাত্রজীবন থেকেই জহুর হোসেন চৌধুরী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি মুসলিম ছাত্রলীগের এবং পরবর্তী সময়ে এম,এন, রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি'র সদস্য ছিলেন। পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র প্রাদেশিক কমিটির সদস্য ছিলেন। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও তিনি ছিলেন বিশেষ সক্রিয়। পাক-চীন মৈত্রী সমিতির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। পাক-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাবের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তিনি আওয়ামী লীগ এবং বামপন্থীদের কর্মসূচীর সমন্বয় সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

১৯৮০ সালের ১৫ই অক্টোবর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ঢাকার পি,জি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১১ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার তিনি সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ বনানী গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

১৯৮১ সালে তিনি সাংবাদিকতার জন্য মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেন। দৈনিক "সংবাদ" তাঁর স্মরণে "জহুর হোসেন চৌধুরী স্মৃতি স্বর্ণপদক" প্রবর্তন করেছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দরবার

'দরবার-ই-জহুর'—স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সংবাদপত্র পাঠক সমাজে জনপ্রিয়তার যার জুড়ি ছিলনা। তেমনি তার লেখক জহুর হোসেন চৌধুরী ছিলেন সাংবাদিক জগতে কিংবদন্তী পুরুষ। পঞ্চাশের মন্বন্তর, ভারত বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, সামরিক দুঃশাসন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বার জোয়ার, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় —কয়েক যুগব্যাপী এসব ওলট-পালট করা ঘটনা প্রবাহ রচনা করেছিল তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতার পটভূমি। তাঁর বিজয় কেতন প্রথম উড়িয়েছিল ষাটের দশকে 'দেশ কোন পথে ?' শীর্ষক অমূল্য নিবন্ধমালা—রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি-সচেতন সাংবাদিকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও ক্ষুরধার রচনাশৈলীর উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

'দরবার-ই-জহুর' তাঁর শেষ জীবনের লেখা। ১৯৭৫ সাল থেকে দৈনিক 'সংবাদ'-এ তিনি যে উপসম্পাদকীয় স্তম্ভ রচনায় নিজেকে নিয়োগ করেন তারই সোনালী ফসল। মাত্র পাঁচটি বছরের পরিসরে মজলিশী ঢং-এ অপূর্ব কথকতায় উঠে এসেছে এদেশের বিগত পঞ্চাশ বছরের সামাজিক, রাজনৈতিক বিবর্তনের বিশ্বস্ত ইতিহাস।

'দরবার-ই-জহুর' কয়েকশ' রচনা থেকে বাছাই করা ৩৫টি প্রতিনীধিত্বশীল লেখার সংকলন। এ শুধু অকাল-প্রয়াত মনস্বী সাংবাদিকের স্মৃতিতর্পণ নয়। তাঁর প্রিয় পাঠকবর্গের ভালবাসার স্বীকৃতিও।